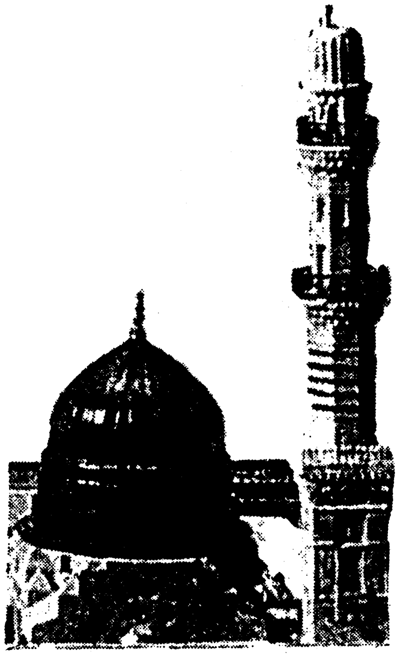
মাদারেজুন্ নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত

৭ম খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ ।

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৭ ইং
রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিঃ
মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে
—— সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০১০ ইং

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রকঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা–১০০০ ।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
২০০.০০ (দুইশত টাকা)

MADAREZUN NABUWAT (Vol. 7) : By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated by Maolana Mominul Haque/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk. 200.00 US $ 5.00

ISBN 984-70240-0019-4

نَحمَدہ ونَصَلّی علٰی رَسُولِہِ الکریمٌ

দিবস রজনীর প্রতিটি প্রহরে, প্রহরান্তরে সেই সৌভাগ্যের সুরভি এখনো অভিঘাত এঁকে যাচ্ছে— মানুষের হৃদয়ে, অনুভবে, ভাবনাবেদনায়। সেই জ্যোতির যাত্রাপথে এরই মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে শত শত বৎসর— প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর। মরুমক্কার পথ বেয়ে পৃথিবীর পথে পথে সেই সৌরভ-জ্যোতি বলে যাচ্ছে মহানিসর্গের মহাসত্যবাণী— আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। আর মোহাম্মদ তাঁরই বার্তাবহনকারী। মোহাম্মদ— সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর প্রেমিক-প্রেমাষ্পদগণের প্রতি। আমিন।

মহানিসর্গের মহামমতার মহাপারাবার তিনি। তিনিই রহমাতুল্লিল আ'লামীন। আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও ক্ষমা পেতে গেলে তাঁর কদমের কাছে পৌঁছতেই হবে আমাদেরকে। গ্রহণ করতে হবে তাঁর পথপ্রদর্শন। শরণ। সরে আসতে হবে ডান থেকে, বাম থেকে। দাঁড়াতে হবে ওই অবিভাজ্য পথে— যার নাম সিরাত্বল মুস্তাক্বীম।

বৃথা সময়ক্ষেপণ করে যাচ্ছি আমরা। দেশ-মহাদেশের- সারা পৃথিবীর মানুষেরা! আমরা তো একই পরিবারের অন্তর্ভূত। পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়। অনাত্মীয়তার মনোভাব থেকে মুক্ত হতেই হবে আমাদেরকে। বিশ্বাস করতে হবে— মহাপৃথিবীর মহাভালোবাসার সততসুন্দর আশ্রয়স্থল কেবল তিনিই। যাঁর নাম মোহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আহমদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাদের আপন, আপনতম, প্রিয়তম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সামনে রয়েছে মৃত্যু। মহাপ্রলয়। মহাপুনরুত্থান। হাশর প্রান্তরে মহামানবতার মহাসমাবেশ। ওই মহাবিপদের দিনে আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বজন-বান্ধব কেউ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন না। দাঁড়াবেন কেবল আমাদের প্রকৃত

আপনজন, প্রিয়তম নবী। আমাদের বুদ্ধি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, হৃদয় যদি না হয় শয়তানপ্রভাবিত, তাহলে নিশ্চয় আমরা আপনতমজনকে ত্যাগ করে পতন ও স্খলনের পথে ধাবিত হবো না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে নিমজ্জিত ও নিমগ্ন হবো নবীপ্রেমে— যা মূলতঃ ইমান। আর আমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে পরিণত করবো নবী-আনুগত্যে— যা মূলতঃ ইবাদত। এভাবে আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞান, বোধ-মূল্যবোধকে করতে পারবো পরিশুদ্ধ। পবিত্র। মুক্ত। এ পথেই রয়েছে আমাদের মুক্তির মঞ্জিল। মহাপ্রভুপালকের সন্তোষ-পরিতোষ।

'মাদারেজুন নবুওয়াত' নবীপ্রেমের ও নবীজীবনের একটি অনন্যসাধারণ আলেখ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এমন এক নবীপ্রেমিক, যিনি প্রতিদিন লাভ করতেন নবীজীর দীদার। তাঁর সমকক্ষ আলেম সম্ভবত সে যুগে আর কেউই ছিলেন না। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র.ও ছিলেন তাঁর সুহৃদ। তাঁরা দু'জনই ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ও বিস্ময়কর আউলিয়া হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর আত্মিক আত্মজ। অনুজ।

চারশ' বছর পর 'মাদারেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থের বঙ্গরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা যে এই মহান জ্যোতির্ময় গ্রন্থের অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা, বহুবিধ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়ক-সহায়িকা হতে পারলাম— সেজন্য প্রকাশ করছি আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি। আলহামদু লিল্লাহি আ'লা জালিক। পাঠ করছি দরূদ ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবার প্রতি, তাঁর নবী-ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি, নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দের প্রতি, নবী-সহধর্মিণীগণের প্রতি। নবী-পরিবারের সকল সম্মানিত ও সম্মানিতা সদস্য-সদস্যাগণের প্রতি। তিনি যাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন— তাঁদের প্রতি। তাঁদের সকলের প্রতি অনন্তকালধরে অবিশ্রান্তধারায় সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হয়ে চলুক। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

এবার প্রকাশ ঘটলো 'মাদারেজুন নবুওয়াতে'র সপ্তম খণ্ডের। গ্রন্থখানির সমাপ্তি ঘটবে অষ্টম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া, ক্ষমা ও সামর্থ্য কামনা করে ওই খণ্ডটির প্রতীক্ষায় রইলাম। প্রারম্ভে ও পরিশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

কবে থেকে ব'সে আছি আশায় আশায়
সাথীহীন পাখি য্যানো আকাশ-বাসায়
কবে থেকে পুড়ে ম'রে হৃদয়ের দীপ
সব মরু বিষাদের ক'রেছে জরিপ
তবু ব'সে আছি ক্যানো কোন্ ভরসায়

অতীতের অমাচ্ছন্ন স্মৃতিপায়ী মনে
বইছে অনলস্রোত ঘুমে জাগরণে
সান্ত্বনার হাত নেড়ে যে যাই বলুক
হয় কি আরোগ্য কভু বুকের অসুখ
তবু আশা বারে বারে ডোবায় ভাসায়

নিরুদ্দেশ নদী বয় সত্তার ভিতর
ভেঙে ফ্যালে তটরেখা বসত কবর
আবাসের চিহ্ন নেই জীবন জ্বলে না
রোদনের যতি কই কেউতো বলে না
শুধু কাঁদি কবিতার মতোন ভাষায়

জ্বলে আর নিভে যায় কতো কোহেতুর
আরেনি-অনলে সারা বুক তৃষাতুর
কপোলে নহর নামে অগ্নির আদলে
মনাকাশ ভ'রে যায় পাথর বাদলে
তবু ব'সে আছি ক্যানো কোন্ দুরাশায়

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী ১ম ও ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের কবিতা সংকলন
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

মক্কা বিজয়ের পর হত্যা এবং ক্ষমা প্রদর্শন

রসুলেপাক সঃ সাধারণভাবে মক্কাবাসীদেরকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেন, এদেরকে হত্যা করতে হবে। তাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা তওবা করেছিলেন। ইমান আনার বদৌলতে পেয়েছিলেন জীবনের নিরাপত্তা। হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো এগারজন পুরুষ এবং ছয়জন রমণীকে। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিলো। অবশিষ্ট সাতজন পেয়েছিলেন নিরাপত্তা। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহিলাদের মধ্য থেকেও চারজনকে হত্যা করা হয়েছিলো। একজনের বিষয়ে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। দু'জন নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। এখন তাদের বিষয়েই আলোকপাত করা হবে।

ইবনে খওল

মূর্খতার যুগে তার নাম ছিলো আব্দুল উয্যা। রসুলেপাক স. তার নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিলো বেলাল ইবনে খওল। তার ঘটনাটি এরকম— সে মক্কাবিজয়ের পূর্বে মদীনায় এসে মুসলমান হয়েছিলো। রসুলেপাক স. তাকে জাকাত আদায় করার দায়িত্ব দিয়ে কোনো কোনো জনপদে প্রেরণ করতেন। তার সাথে থাকতেন একজন আনসার সাহাবী। একবার সফরে খাযামা গোত্রের একজন মুসলমান তার খাদেম হিসেবে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে তারা যাত্রাবিরতি করলেন। সে সেই খাযায়ী ব্যক্তিকে হুকুম দিলো, বকরী যবেহ করে আহার প্রস্তুত করো। হুকুম দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। খাযায়ী ব্যক্তিটিও ছিলো ক্লান্ত। তাই কিছুক্ষণ পরে সেও ঘুমিয়ে পড়লো। সে ঘুম থেকে উঠে যখন দেখলো খানা প্রস্তুত করা হয়নি, তখন রাগের বশবর্তী হয়ে উক্ত খাযায়ী খেদমতগারকে হত্যা করে ফেললো। তারপর ভাবলো, মদীনায় ফিরে গেলেইতো তার উপরে নেমে আসবে মহাবিপদ। আল্লাহ্র রসুল তো কেসাস গ্রহণ করবেনই। সে ভয় পেয়ে গেলো। জাকাত হিসেবে প্রাপ্ত পশুগুলো নিয়ে চলে গেলো মক্কায়। মক্কাবাসীদেরকে বললো, মোহাম্মদের ধর্ম থেকে তোমাদের ধর্মই উত্তম। রসুলেপাক স. এর জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তার দু'টি ক্রীতদাসী ছিলো। তারা প্রায়শঃই রসুলেপাক স. এর নিন্দাসূচক গান গাইতো। রসুল স. যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সে খানায়ে কাবায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। কাবার গিলাফ দিয়ে নিজেকে

আচ্ছাদিত করলো। রসুল স. তখন তওয়াফ করছিলেন। কোনো এক সাহাবী তাকে দেখে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইবনে খওল কাবাঘরের গিলাফের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিনি স. বললেন, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেনো তাকে হত্যা করো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখানেই হত্যা করা হলো। কে কে তাকে হত্যা করেছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে হুরায়ছ এবং হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার তার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তবে তাকে হত্যা করেন হজরত সাঈদ। কারণ হজরত সাঈদ ছিলেন যুবক। আল হাদিস। ইবনে আবী শায়বা আবু ওছমান নাহদীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তাকে হজরত আবু বুরদা হত্যা করেছিলেন, এমন অবস্থায় যখন সে নিজেকে কাবাঘরের গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছিলো। হত্যাকারী কে নির্ধারণ করার বিষয়ে শেষোক্ত হাদিসটি অধিকতর বিশুদ্ধ। অন্যান্য বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, অন্যান্যরা তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাকে হত্যা করেন হজরত আবু বুরদাই। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ও আবু বুরদা উভয়েই কতলে শরীক ছিলেন। ‘মাওয়াহেব’ গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবীস্ সারাহ

যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো তাদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবীস্ সারাহ। তাকে হত্যা করার নির্দেশ যখন জারী করা হলো তখন সে আশ্রয় নিলো হজরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফানের কাছে। সে ছিলো হজরত ওছমানের রেযায়ী ভাই। রসুলেপাক স. যখন বায়াতের জন্য লোকদেরকে আহ্বান করলেন, হজরত ওছমান তাকে নিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে উপস্থিত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আব্দুল্লাহ্ ইবনে সারাহ বায়াত হওয়ার জন্য হাজির হয়েছে। রসুলেপাক স. তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। হজরত ওছমান পুনরায় নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আব্দুল্লাহ্ বায়াতের জন্য উপস্থিত। রসুলুল্লাহ্ স. এবারও কিছু বললেন না। হজরত ওছমান তৃতীয়বার একই নিবেদন জানালেন। কিন্তু রসুলেপাক স. তাকে বায়াত করতে অস্বীকার করলেন। উপস্থিত সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যে এখনই তার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। যেহেতু আমি তো তাকে বায়াত করাতে চাই না। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দয়া করে আপনার ইঙ্গিতটি আর একটু স্পষ্ট করুন। আমরা তাকে হত্যা করি। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌র কোনো নবীর জন্যই এটা শোভনীয় নয় যে,

কোনো বিষয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে এতোটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবীস্ সারাহ ওই চার ব্যক্তির অন্যতম, যাদের ব্যাপারে রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিবো না, চাই তারা হেরেমে থাকুক অথবা থাকুক হেরেমের বাহিরে। ঘটনাটির বাকী অংশ সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। 'রওযাতুল আহবাব' ও 'মাআরেজুন নবুওয়াত' কিতাবদ্বয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— সে প্রথমে ইমান এনেছিলো। সে যেহেতু লিখতে জানতো, তাই রসুলেপাক স. তাকে কাতেবে ওহী (ওহীলেখক) নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সে একাজে প্রতারণা করতে শুরু করলো। সে তার ইচ্ছামতো শব্দ পরিবর্তন করতো। যেখানে আযীযুন হাকীম লিখতে বলা হতো, সে সেখানে লিখতো আলীমুন হাকীম। এমন কথাও বলতে শুরু করলো, আমি যা লিখি মোহাম্মদ তার কিছুই জানেন না। আমি যা মনে করি তাই লিখে দেই। তাঁর উপর যেমন ওহী আসে, আমার উপরও তেমনি ওহী আসে। রসুলেপাক স. তার প্রতারণা ও অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত হলেন। সে তখন আর মদীনায় টিকতে পারলো না। মক্কায় পালিয়ে গেলো। মক্কাবিজয়ের দিন সে হজরত ওছমানকে সুপারিশকারী বানিয়ে তাঁর কাছে বললো, আমি আপনার কাছে আশ্রয় নিলাম। আমার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিন। সুপারিশ করে রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে আমার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করিয়ে দিন। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ অনেক বেশী। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। আমি তওবা করছি। হজরত ওছমান কয়েক দিন পর তাকে নবী করীম স. এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তার মায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে অনেক সুপারিশ করলেন। কিন্তু রসুলেপাক স. কিছুতেই তুষ্ট হলেন না। হজরত ওছমানের কথার কোনো উত্তরও দিলেন না। তিনি খুবই কাকুতি মিনতি করে রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকটে অগ্রসর হয়ে মস্তক মোবারকে চুম্বন করলেন এবং কোলের কাছে মাথা নত করে আহাজারী করে নিবেদন করলেন, দয়া করে আব্দুল্লাহ্কে ক্ষমা করে দিন। অবশেষে রসুলেপাক স. তাঁকে নিরাপত্তা দান করলেন।

জীবনীবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ্ যদিও ইমান এনেছিলো এবং নিরাপত্তাও পেয়েছিলো, কিন্তু যখনই সে রসুলেপাক স.কে দেখতো, তখন লজ্জায় মুখ ঢেকে চলে যেতো। হজরত ওছমান নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার দুধভাই যখনই আপনাকে দেখে, তখনই সে পালিয়ে যায়। তিনি স. মৃদু হেসে বললেন, আমি তো তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। হজরত ওছমান বললেন, নিশ্চয়ই আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, কিন্তু যখনই কৃত অপরাধের কথা তার মনে পড়ে, তখনই সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণজ্যোতি সহ্য

করতে পারে না। তিনি স. বললেন, 'আল ইসলামু ইয়ামহু মা কানা কাবলাহু' (ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়)। হজরত ওছমান আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবীস্ সারাহকে রসুলেপাক স. এর এরশাদ শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে যখনই লোকজন রসুলেপাক স. এর কাছে সাক্ষাৎ করতে যেতো, তখন সেও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে স. সালাম দিতো।

ইকরামা ইবনে আবু জাহেল

ইকরামা ইবনে আবু জাহেল রসুলেপাক স.কে অনেক দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলো। সে ছিলো মালউন আবু জাহেলের পুত্র। মন্দ কাজে মালউন পিতার যোগ্য উত্তরসুরী ও প্রতিনিধিত্বই সে করেছিলো। সমস্ত যুদ্ধে পালন করেছিলো বদবখতদের সরদারের ভূমিকা। তৎসত্ত্বেও অবশেষে তিনি পেয়েছিলেন সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ।

আল্লামা সুয়ূ্যতী র. তাঁর 'জমউল জাওয়াম' কিতাবে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলেপাক স. স্বপ্নে বেহেশতে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর হাতে আঙ্গুরের অথবা খেজুরের খোসা দেওয়া হলো এবং বলা হলো এ খোসাটি আবু জাহেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি স. বললেন, আবু জাহেলের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক কী? এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা রসুলেপাক স. এর কাছে কার্যতঃ প্রকাশ করা হয়নি। যখন মক্কাবিজয় ঘটলো এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহেল ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি স. ওই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারলেন। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিনেও ইকরামা একজন সাহাবীকে শহীদ করেছিলেন। এই সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি মৃদু হাসলেন। সাহাবা কেরাম তাঁর ওই মৃদু হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি স. বললেন, আমি আলমে গায়বে এমন দেখতে পেলাম যে, নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারী ইকরামার হাত ধরে বেহেশতের মধ্যে পায়চারী করছে।

ইকরামার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সুদীর্ঘ। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের পর ইকরামা এই ঘোষণা শুনে ভীষণ ভীত হলেন যে, রসুলেপাক স. তাঁর রক্ত হালাল করে দিয়েছেন। তিনি পলায়ন করে সাগর তীরের দিকে চলে গেলেন। সেখান থেকে নৌকাযোগে ইয়ামনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। হঠাৎ সাগরতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হলো। নৌকার আরোহীরা আল্লাহ্তায়ালার কাছে আহাজারী করতে লাগলো। তারা ইকরামাকে লক্ষ্য করে বললো, তুমিও আল্লাহ্কে স্মরণ করো। তিনি বললেন, আমি কি ওই আল্লাহ্কে ডাকবো, যার দিকে মোহাম্মদ আমাকে আহ্বান করেছেন? যার আওতা থেকে আমি পালিয়ে যাচ্ছি? তাঁর নজর পড়লো নৌকার একটি তক্তার দিকে। তিনি দেখতে পেলেন, সে তক্তার উপর লেখা আছে 'কাযাবা বিহি কাওমুকা ওয়া হুওয়াল হাক্কু' (তোমার কাওমের

লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অথচ তিনিই সত্যবাদী)। সে লেখাগুলো মুছে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেছ মুসলমান হয়ে রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে তাঁর জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা যখন গৃহীত হলো, তখন তিনি স্বামীর অন্বেষণে বের হয়ে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে ইকরামার নিকট পৌঁছতেও পারলেন। বললেন, হে আমার চাচার পুত্র! আমি সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মহানুভব ও দয়ালু ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি। ইকরামা একথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, আমি মোহম্মদকে কতো কষ্ট দিয়েছি। তিনি কি আমাকে সত্যিই নিরাপত্তা দিয়েছেন? উম্মে হাকীম বললেন, তাঁর প্রশংসা যতই করা হোক না কেনো তিনি তার চেয়েও অধিক মহানুভব। ইকরামা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মক্কায় ফিরে এলেন। রসুলেপাক স. এই মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, ইকরামা মুমিন ও মুহাজির হয়ে ফিরে এসেছে। সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, খবরদার! তোমরা তাঁর পিতার দোষ বর্ণনা কোরো না। তাহলে সে মনে কষ্ট পাবে। হজরত ইকরামা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রসুলেপাক স. এর তাঁবুর দরজায় উপস্থিত হলেন। তাঁর স্ত্রী চেহারার উপর থেকে নেকাব উঠিয়ে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন এবং বললেন, আমি ইকরামাকে নিয়ে এসেছি, তার জন্য কী হুকুম? এ কথা শুনে রসুলেপাক স. এতো দ্রুত গাত্রোত্থান করলেন যে, তাঁর পবিত্র শরীর থেকে চাদর পড়ে গেলো। অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন, এসো! হজরত ইকরামা ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, রসুলেপাক স. তাঁর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। বললেন, 'মারহাবান বিররাকিবিল মুহাজির' (ছওয়ার হয়ে হিজরত করে আগমনকারীর জন্য খোশ আমদেদ)। ইকরামা দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর সামনে। নিবেদন করলেন, হে মোহাম্মদ! আমার স্ত্রী বলেছে, আপনি আমাকে আমান দিয়েছেন। তিনি স. বললেন, ঠিকই বলেছে। হজরত ইকরামা বললেন— হে আল্লাহ্‌র রসুল! নিঃসন্দেহে আপনি সবচেয়ে বেশী মহানুভব। সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সর্বাধিক ওফাদার। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, ইকরামা! তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমার সামর্থ্য অনুসারে আমি তোমাকে দান করবো। হজরত ইকরামা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যত ধরনের দুশমনী আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিলো তা আমি আপনার সাথে করেছি। শিরিকের শক্তিবর্ধনে যত ধরনের তৎপরতা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো, তার সবই আমি চালিয়েছি। বেআদবী ও গোস্তাকীও করেছি সীমাহীন। আপনার নামে করেছি অগণনীয় দুর্নাম ও গীবত। এখন আমি চাই, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো আমাকে ক্ষমা করেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর পবিত্র দুই হাত উত্তোলন করলেন। হজরত ইকরামার জন্য

ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। হজরত ইকরামা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যত স্বর্ণ-রৌপ্য, অর্থ-সম্পদ জাহেলী যুগে আল্লাহর বান্দাদেরকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে আমি ব্যয় করেছি, ওই পরিমাণ অর্থ বিত্ত ইসলামের পথেও ব্যয় করতে চাই। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে যতোগুলি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি করতে চাই এবার মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে। এরপর হজরত ইকরামা কাফেরদের সঙ্গে সকল বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্তে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। পরে তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খেলাফতকালে আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হন। সুবহানাল্লাহ! অভিশপ্ত আবু জাহেলের পুত্র এরকম ইমান ও একীনের অধিকারী হলেন। আল্লাহ্‌র কালামে সে কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে— 'তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিত' (তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও) (৩ঃ২৭)। আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া তওফীক ও সাহায্যেই তো এরকম হয়ে থাকে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ছিলো কাফেরদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রসুলেপাক স. এর প্রতি সে শত্রুতা করতো অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে। মক্কাবিজয়ের দিন যখন সে শুনলো মোহাম্মদ স. তার রক্তপাত বৈধ করে দিয়েছেন, তখন সে পলায়নের পথ ধরলো এবং মনে মনে এরাদা করলো নদী পথে কোথাও পালিয়ে যাবে। উমায়র ইবনে ওহাব জামহী ছিলেন তার সুহৃদ। তিনি রসুলেপাক স. এর নিকট তার জন্য আমান প্রার্থনা করলেন। তিনি স. তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। সফওয়ানকে নিরাপত্তা দিলেন দু'মাসের জন্য। হজরত উমায়র সফওয়ানের কাছে গিয়ে একথা জানালেন। সফওয়ান তার নিজের অপকর্মের দিকে লক্ষ্য করলো। বিস্মিত হলো। এমতো উদারতাকে অবিশ্বাস্য মনে করে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওই পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবো না, যতক্ষণ না মোহাম্মদের পক্ষ থেকে আমার আমানপ্রাপ্তির কোনো আলামত দেখতে পাবো। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর পাগড়ী মোবারক, কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, চাদর মোবারক হজরত ওমরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সে ফিরে এলো। রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, উমায়র বলেছেন, আপনি নাকি আমাকে দু'মাসের জন্য আমান দিয়েছেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে চার মাসের জন্য আমান দিলাম। কিন্তু সফওয়ান তার পরও ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করছিলো। শিরিকের মধ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হুনায়নের যুদ্ধে মুসলমানদের সহযোগিতায় ছিলো। সে সময় রসুলেপাক স. এর খাস এনায়েত ও তাওয়াজ্জুহ্

তার উপর পতিত হয়। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে মুওয়াল্লাফাতুল কুলুবদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুওয়াল্লাফাতুল কুলুবদের বিষয়ে হুনায়নের গনীমতের মালবণ্টন অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

হুওয়ায়রেছ ইবনে নুকায়দ

হুওয়ায়রেছ ইবনে নুকায়দ ছিলো কবি। সে সর্বদাই তার কবিতায় রসুলুল্লাহ্ স. এর দুর্নাম রটনা করতো। মক্কাবিজয়ের দিন সে তার রক্ত হালাল হওয়ার ঘোষণা শুনতে পেয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। হজরত আলী মুর্তজা তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। লোকেরা বললো, সে মরুভূমির দিকে চলে গেছে। ঘরের ভিতর থেকেই হুওয়ায়রেছ হজরত আলীর আগমন টের পেলো। তবু ঘরের ভিতরেই ঘাপটি মেরে বসে রইলো। তিনি যখন তার বাড়ি থেকে দূরে চলে গেলেন, তখন সে চুপিসারে তার ঘর থেকে বের হয়ে অন্য কারো ঘরে লুকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অকস্মাৎ সে পড়ে গেলো হজরত আলীর দৃষ্টিসীমানায়। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

কেউ যদি এমন প্রশ্ন তোলেন যে, হুকুম তো ছিলো এরকম— যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, তারা নিরাপত্তা পাবে। তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, এমনও তো হতে পারে যে, এ হুকুম কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য ছিলো। আর হুওয়ায়রেছ তাদের মধ্যে ছিলো না। অথবা কথা ছিলো ঘরের মধ্যে বসে থাকলে নিরাপত্তা পাবে, কিন্তু সে তো ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে নিরাপত্তাপ্রাপ্তির আওতায় পড়েনি। তাছাড়া এ ধরনের লোকদের রক্ত প্রবাহিত করার হুকুম মক্কাবিজয়ের পূর্ব থেকেই জারী ছিলো। আর এর কারণটিও ছিলো প্রকাশ্য। রসুলুল্লাহ্ স. যখন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন, তখন থেকেই সে অমার্জনীয় অপরাধসমূহের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। তাই পূর্বাহ্নেই তার রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ করে দেওয়া হয়েছিলো।

মিকইয়াস ইবনে সাবাবা

মিকইয়াস ইবনে সাবাবার অপরাধ ছিলো এরকম— তার ভাই হিশাম ইবনে সাবাবা মদীনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। মুরায়সীর যুদ্ধে রসুলেপাক স. এর একজন আনসারী খেদমতগার ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো বনী আমর ইবনে আউফ। তিনি মনে করেছিলেন হিশাম ইবনে সাবাবা মুশরিক। তাই তিনি তাঁকে ভুলবশতঃ কতল করে ফেললেন। তাঁর ভাই মিকাইয়াস মদীনায় এসে তার ভাইয়ের হত্যাকারীর খুন তলব করলো। যেহেতু ভুলবশতঃ তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো তাই রসুলেপাক স. আনসারীকে দিয়ত আদায় করার জন্য এবং

দিয়তের মাল মিকইয়াসকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। মিকাইয়াস দিয়তের মাল গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। কিন্তু দিয়তের মাল গ্রহণ করা সত্ত্বেও সে একদিন ওই আনসারীর উপর হামলা করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। অতঃপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কায় ফিরে গেলো। মক্কাবিজয়ের দিন সে মুশরিকদের একজন লোকের সঙ্গে কোনো এক স্থানে বসে মদ্যপান করছিলো। রসুলেপাক স. তাকে কতল করার হুকুম দিলেন। তামিলা ইবনে আব্দুল্লাহ্ লাইছী নামক জনৈক সাহাবী এ খবর পেয়ে তাকে কতল করে দিলেন।

হাববার ইবনে আসওয়াদ

হাববার ইবনে আসওয়াদ নবী করীম স.কে অনেক দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলো। তার একটি অপকর্ম ছিলো এরকম— রসুলুল্লাহ্ স. এর জামাতা হজরত যয়নবের স্বামী আবুল আস ইবনুর রবী বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর উপর দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে এই ওয়াদার উপর মক্কায় পাঠালেন যে, মক্কায় পৌঁছে তিনি হজরত যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবেন। রসুলেপাক স. তাঁর গোলাম আবু রাফে এবং সালামা ইবনে আসলামকেও তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, তাঁরা হজরত যয়নবকে মদীনায় নিয়ে আসবেন। মক্কায় পৌঁছে আবুল আস হাওদা তৈয়ার করে হজরত যয়নবকে তার মধ্যে আরোহণ করিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। হাববার ইবনে আসওয়াদ যখন বিষয়টি জানতে পারলো, তখন সে কুরাইশদের আরও কতকগুলো দুষ্ট লোক সঙ্গে নিয়ে হজরত যয়নবের গতিরোধ করলো। হজরত যয়নবকে লক্ষ্য করে একটি তীরও নিক্ষেপ করলো সে। ওই তীরের আঘাতে তিনি উটের উপর থেকে একটি পাথরের উপরে পতিত হলেন। গর্ভবর্তী ছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গর্ভপাতও ঘটে গেলো। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অসুস্থ অবস্থাতেই কোনোক্রমে পৌঁছলেন মদীনায়। কিন্তু আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। অল্প কিছুদিন পরেই ইন্তেকাল করলেন। রসুলুল্লাহ্ স. অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তার রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করলেন। একটি বাহিনী মক্কার দিকে প্রেরণ করলেন। তাদেরকে হুকুম দিলেন, হাববারকে যেখানেই পাবে, সেখানেই তাকে জ্বালিয়ে দিবে। পরক্ষণেই আবার বললেন, 'ইন্নামা ইউয়াযযিবু বিন্নারি রব্বুন্নার' (আগুন দ্বারা পুড়িয়ে শাস্তি কেবল তিনিই দিতে পারেন আগুনের মালিক যিনি)। তারপর বললেন, তাকে যদি পাও তাহলে হাত পা কেটে তাকে হত্যা করে ফেলো। কিন্তু তাকে তাঁরা ধরতে পারলেন না। সে তখন ছিলো মক্কার এক সুরক্ষিত স্থানে। মক্কা বিজয়ের পর অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও তাকে ধরা গেলো না। তারপর রসুলেপাক স. মদীনায় ফিরে এলেন। একদিন তিনি সাহাবা

কেরামের সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় হাববার হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করলো, হে মোহাম্মদ! আমি ইসলামকে স্বীকার করে আপনার কাছে হাজির হয়েছি। ইতোপূর্বে আমি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ ছিলাম। এখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ এক আর মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। আমি আপনার দৃষ্টিতে অপরাধী এবং গোনাহগার। রসুলেপাক স. মস্তক অবনত করলেন। লজ্জিত হলেন। তাঁকে আর তিরস্কার করতে পারলেন না। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ মঞ্জুর করলেন এবং তাকে বললেন, হে হাববার! আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। ইসলাম সকল গোনাহ খাতা শেষ করে দেয়। অতীতের সমস্ত অন্যায় অপরাধের ভিত্তিকে করে দেয় নিশ্চিহ্ন।

হারেছ ইবনে তালাতেলা

হারেছ ইবনে তালাতেলাও রসুলেপাক স.কে নানাভাবে কষ্ট দিতো। মক্কাবিজয়ের দিন হজরত আলী তাকে হত্যা করেন।

কাআব ইবনে যুহায়র

কাআব ইবনে যুহায়র নবী করীম স. এর নিন্দা-দুর্নাম প্রচার করতেন অত্যধিক। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি পালিয়ে যান। পরে তিনি তার ভাই নহর ইবনে যুহায়রকে সঙ্গে নিয়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হন। তার আগে তিনি তার ভাইকে পাঠিয়ে দিয়ে জেনে নেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে নবী করীম স. তাঁর ইসলাম গ্রহণকে মঞ্জুর করবেন কি না এবং তাঁকে ক্ষমা করবেন কিনা? উত্তরে ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষণা যখন এলো, তখন তাঁর ভাই কাআব নবী করীম স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি স. তাঁর অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিলেন। তিনি বললেন, 'বানাত সুয়াদু ফাকালবীল ইয়াওমা মাতবূলু' অর্থাৎ আমার মাওলা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আজ আমার অন্তর বিপদগ্রস্ত। তারপর তিনি কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করলেন—

'ইন্নার রসূলা লাসাইফুইঁ ইউস্‌তাদ্বাউ বিহি মুহান্নাদু মিন সুয়ূফিল্লাহি মাসলূলুন নাব্যি'তু আন্না রাসূলাল্লাহি উদঊ'নী ওয়াল আফউ' ই'নদা রাসূলিল্লাহি মামূলা' (নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ্ এমন এক তরবারী, যার মাধ্যমে আলোকিত হওয়া যায়। তিনি কোষমুক্ত আল্লাহ্‌র এক তরবারী যা অতি ধারালো। আমাকে সংবাদ জানানো হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ আমাকে ধমক দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে ক্ষমা আশা করা যায়)। রসুলুল্লাহ্ স. সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, শোনো, সে কি বলেছে।

জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তখন খুব খুশি হয়েছিলেন এবং পুরস্কার হিসেবে তাঁকে নিজের পবিত্র চাদর দান করেছিলেন। একথাও খ্যাত যে, কাআব ইবনে যুহায়রের ইসলাম গ্রহণ হয়েছিলো নবম হিজরীতে। তবে অষ্টম হিজরীতে মক্কাবিজয়ের সময় যাদের রক্তপাত হালাল করে দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে কাআব ইবনে যুহায়র ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে তার আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'রওযাতুল আহবাব' কিতাবে কাআব ইবনে যুহায়রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এতোটুকুই আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অষ্টম হিজরীতে। তবে নবম হিজরীর ঘটনাবলীতে তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

ওয়াহশী

ওয়াহশী উহুদ যুদ্ধে শহীদ করেছিলেন সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে। সমস্ত মুসলমান তাকে হত্যা করার জন্য উন্মুখ হয়েছিলো। রসুলেপাক স.ও তাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াহশী তায়েফে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে লাগলো। এক পর্যায়ে তায়েফের প্রতিনিধি দল রসুলেপাক স. এর খেদমতে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁকে বলা হলো, তুমি আমাদের সঙ্গে নবী করীম স. এর দরবারে চলো। কেননা তিনি কোনো কাসেদকে হত্যা করেন না। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো এবং ইসলামে ইমান আনো। তখন তিনি তাদের সঙ্গী হয়ে রসুলুল্লাহ স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্। তিনি স. বললেন, তুমি কি ওয়াহশী নও? তিনি বললেন, হাঁ, আমি ওয়াহশী। তিনি বললেন, বসে যাও এবং বলো দেখি তুমি আমার চাচাকে কীভাবে শহীদ করেছিলে। তিনি হজরত হামযার শাহাদতবরণের পূর্ণ বিবৃতি দিলেন। তিনি স. বললেন, তুমি আমার সামনে বোসো না এবং আমাকে তোমার চেহারা দেখিয়ো না। ওয়াহশী বলেছেন, আমি নবী করিম স. এর দরবারে বসতাম। কিন্তু তাঁর সামনে যেতাম না। বসতাম পালিয়ে তাঁর পশ্চাতে। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে মুসায়লামা কায্যাবের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয়েছিলো, তখন আমিও সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যে খঞ্জরের আঘাতে আমি হজরত হামযাকে শহীদ করেছিলাম, সেই খঞ্জর দিয়েই আমি মুসায়লামা কায্যাবকে আঘাত করেছিলাম। সেই খঞ্জর তার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গিয়েছিলো। এরপর এক আনাসারী ব্যক্তি এসে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছিলো। এ সম্পর্কে অবশ্য আমি নিশ্চিত নই যে, সে আমার খঞ্জরের আঘাতে মারা পড়েছিলো, না আনসারী ব্যক্তির তলোয়ারের আঘাতে। তবে একজন মেয়ে লোককে বলতে শুনেছি, সে ছাদের উপর থেকে ডেকে বলেছিলো, একজন কৃষ্ণবর্ণের গোলাম

মুসায়লামাকে হত্যা করেছে। কথিত আছে, ওয়াহশী এরকম বলতেন 'কাতালতু খাইরান্নাসি ফিল জাহেলিয়্যাতে ওয়া কাতালতু সার্‌রান্নাসি ফিল ইসলাম' (জাহেলী যুগে আমি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ লোককে হত্যা করেছিলাম, আর ইসলামের যুগে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এক লোককে হত্যা করেছি)। উহুদের যুদ্ধের বর্ণনায় এসেছে, এক দল লোক ওয়াহশীর কাছে গেলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, তারা তাঁর কাছ থেকে হজরত হামযার শহীদ হওয়ার বিবরণ শুনবে। তারা দেখলো, তিনি ঘরের কোণে পানিভর্তি মশকের মতো পড়ে আছেন। ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তারপর তিনি ওই অবস্থার বর্ণনা দিলেন, যা বিভিন্ন জীবনালেখ্যে বর্ণিত হয়েছে। এরকম একটি বর্ণনা দিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর খেদমতে ওয়াহশী এসে বললেন, আমি হাজির হয়েছি। আমাকে আমান দিন, আমি যেনো আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারি। কেননা তার মধ্যে আমার মাগফেরাত ও নাজাত রয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, তুমি আমার কাছে আমান চাইবে এমতাবস্থায় তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি যেনো না পড়ে। অর্থাৎ আমি তোমাকে কতল করার হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তুমি যেহেতু আমার কাছে আমান চেয়েছো, কাজেই আমি তোমাকে আমান দিচ্ছি, তুমি যেনো আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পাও। তখন এই আয়াত নাযিল হয় 'ওয়াল্লাজীনা লা ইয়াদ'ঊনা মাআ'ল্লাহি ইলাহান আখারা ওয়ালা ইয়াকতুলূনান্ নাফ্‌সাল লাতি হাররামাল্লাহু ইল্লা বিলহাক্বি ওয়ালা ইয়ায্‌নূনা ওয়ামাইঁ ইয়াফআ'লু যালিকা ইয়াল্‌কা উয়ামাই ইউদা'আফ লাহুল আযাবু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়া ইয়াখলুদ ফীহি মুহানাহ্' (এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলি করে, সে শাস্তি ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;)(২৫ঃ৬৮,৬৯)। ওয়াহশী বললো, আমি শিরিকের মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আমি নাহকভাবে নরহত্যা করেছি। ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছি। এহেন অবস্থায়ও কি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ক্ষমা করবেন? রসুলেপাক স. নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কোনো উত্তর করলেন না। তখন নাযিল হলো 'ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা সলিহান ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সয়্যিআতিহিম হাসানাতিন ওয়া কানাল্লাহু গফুরার রহীমা' (তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ উহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)(২৫ঃ৭০)। ওয়াহশী বললো, আয়াতে তো শর্ত করা হয়েছে মাগফেরাত ওই সময় হবে, যখন তওবা করা হবে এবং তার সাথে সাথে 'আমলে সালেহ' করা হবে। আমার তো আমলে সালেহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা আমি তো আপনার দৃষ্টির ছায়ায় বেঁচে আছি। তখন রসুলেপাক স.

পাঠ করলেন, 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আইঁইউশরিকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা যালিকা লিমাইঁ ইয়াশাউ' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন)(৪ঃ১১৬)। ওয়াহশী বললো, এ আয়াতে উল্লেখিত মাগফেরাত তো আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনও তো হতে পারে যে, আমি ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি, যাদেরকে ক্ষমা করার ইচ্ছা আল্লাহ্র হবে না। তখন অবতীর্ণ হলো— 'কুল ইয়া ইবাদী ইয়াল্লাযীনা আসরাফূ আলা আনফুসিহিম লাতাকনাতূ মির্‌রহমাতিল্লাহি ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা জামীয়া ইন্নাহু হুওয়াল গফূরুর রহীম' (হে রসুল! আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা যারা আপন সত্তার উপর জুলুম করেছো তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনিই চরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)। ওয়াহশী বললেন, এখন আমি কোনো বাধা ও শর্ত দেখছি না। একথা বলে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাবআরী

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাবআরীও ছিলেন কবি। তিনি রসুলে পাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণের নিন্দাবাদ প্রচার করতেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতেন। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি শুনতে পেলেন, তাঁকে হত্যা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণা শুনেই পালিয়ে তিনি ইয়ামন অঞ্চলের দিকে নাজরান ইবনে যায়েদ ইবনে সাবার এলাকায় চলে গেলেন। কিছুকাল তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এক সময় জাহেলী কাজকর্মের উপর অনুতপ্ত হলেন। ইসলামের নূর তাঁর অন্তরকে আলোকিত করে দিলো। মনস্থির করলেন, সাইয়্যেদুল মুরসালীনের দরবারে হাজির হবেন। ফিরে গেলেন মক্কায়। রসুলেপাক স. দূর থেকে তাকে দেখে বললেন, ইবনে যাবআরী আসছে। তার চেহারার মধ্যে ইসলামের নূর দেখা যাচ্ছে। ইবনে যাবআরী নিকটে এসে বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং আপনি তাঁর রসুল। ওই এক আল্লাহ্ যার কোনো শরীক নেই, তাঁর প্রশংসা করছি। যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন। হে আল্লাহ্র রসুল! আমি অনেক অন্যায় করেছি। আপনার ও আপনার সাহাবীগণের সাথে অনেক বেআদবী করেছি। এ সবের কারণে আমি এখন অনুতপ্ত। এখন ফয়সালা আপনার হাতে। রসুলে পাক স. বললেন— 'আলহামদু লিল্লাহিল লাযী হাদাকা ইলাল ইসলাম' (সমস্ত প্রশংসা ওই মহান আল্লাহ্র, যিনি তোমাকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন)। ইসলাম তো অতীতের সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে দেয়।

মক্কাবিজয়ের দিন ছয়জন মহিলার ব্যাপারে হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়েছিলো। তন্মধ্যে কেউ কেউ পেয়েছিলো নিরাপত্তা। কাউকে কাউকে করা হয়েছিলো হত্যা।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা

আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবার শত্রুতা ও রসুলেপাক স.কে কষ্ট দেয়ার ঘটনাবলী সুবিদিত। বিশেষ করে সে উহুদের যুদ্ধের দিন সাইয়্যেদুশ শুহাদা হজরত হামযাকে মুছলা করেছিলো। জীবনালেখ্য রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন যখন মহিলাগণ বায়াত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে রসুলেপাক স. এর নিকট এলেন, তখন হিন্দাও তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। মুখমণ্ডল নেকাবে আবৃত করে রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে অন্যান্যদের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি। তারপর মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বললেন, আমি উতবার কন্যা হিন্দা। রসুলেপাক স. বললেন, মুসলমান হয়ে যখন এসেছো, তখন ভালোই হয়েছে। সহীহ্ বোখারীতে আছে, রসুলেপাক স. বায়াতের আয়াত পাঠ করছিলেন। যখন বললেন, ‘ওয়ালা ইয়াসরিকনা’ (চুরি করবে না) তখন হিন্দা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু সুফিয়ান খরচপাতি করার ব্যাপারে বড়ই কঞ্জুস। আমি যদি আমার বাচ্চাদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় মাল তাকে না জানিয়ে গ্রহণ করি তাহলে কি তা জায়েয হবে? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। ওই পরিমাণ মাল তুমি গ্রহণ করতে পারো, যা সন্তনাদীর জন্য জরুরী। রসুলে পাক স. যখন বললেন, ‘ওয়ালা ইযাযনীনা’ (এবং তারা ব্যভিচার করবে না) তখন হিন্দা বললো ‘হাল তাযনিল হুযরাতু’ (আযাদ মহিলারা কি ব্যভিচার করতে পারে) সে একথার দ্বারা নিজের পবিত্রতার দিকেই ইশারা করেছিলো। সহীহ বোখারীতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হিন্দা বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আগে পৃথিবীতে এমন কোনো গৃহ নেই যার বাসিন্দাকে আপনার চেয়ে অধিক অপ্রিয় মনে হতো। আর এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কোনো গৃহবাসী নেই, যার সম্মান আপনার চেয়ে অধিক। রসুলেপাক স. বললেন ‘আইযান’ (এমনই হয়)। হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ ‘আইযান’ এর দু’টি অর্থ করেছেন। একটি হচ্ছে তোমার অন্তরে ইমান যতো বেশী মজবুত হবে অন্তরে মহব্বত ততো বেশী হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার বিষয়ে আমারও অবস্থা তাই ছিলো। তবে প্রথমোক্ত অর্থটি অধিকতর উত্তম ও প্রকাশ্য। তারপর রসুলেপাক স. কোরআনে করীমের আয়াত পাঠ করলেন যার মর্মার্থ বায়াত হওয়া। হিন্দা বললো, আমার মন চায় আপনার হাতে হাত দিয়ে বায়াত গ্রহণ করি। রসুলেপাক স. বললেন, আমি মেয়েলোকদের সাথে মুসাফেহার

মাধ্যমে বায়াত করি না। এভাবে একজন নারীকে বায়াত করানো যে কথা, একাধিক নারীকে বায়াত করানো একই কথা। রসুলেপাক স. নারীদেরকে মৌখিকভাবে বায়াত করাতেন।

জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হিন্দা যখন নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, তখন ঘরের সকল মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিলেন এবং বললেন, আমি এতদিন ঘরে তোমাদের প্রতারণার ফাঁদে বন্দী হয়েছিলাম। তারপর হিন্দা হাদিয়া স্বরূপ দু'টি বকরী রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন এবং ওজরখাহী করে বললেন, আমার বকরীর সংখ্যা কম। রসুলেপাক স. তার বকরীর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ায় হিন্দার বকরীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। হিন্দা বলেছিলেন, রসুলেপাক স. এর দোয়ার বরকতেই এরকম হয়েছে।

কুরায়বা এবং কারাতানা

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহিলা ছিলো কুরায়বা এবং কারাতানা। এরা দু'জন ছিলো বাঁদী। ইবনে খাতালের গায়িকা ছিলো তারা। এরা রসুলেপাক স. এর নিন্দা করে গান গাইতো। কুরায়বাকে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু কারাতানা পালিয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা তার জন্য রসুলেপাক স. এর কাছে আমান চেয়েছিলো। সাইয়্যেদে আলম স. তাকে আমান দিয়েছিলেন। পরে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

আরনাব

চতুর্থজন ছিলো আরনাব নামক এক মহিলা। সে ইবনে খাতালের ক্রীতদাসী ছিলো। মক্কাবিজয়ের দিনেই সে নিহত হয়।

বনী মুত্তালেবের বাঁদী সারা

পঞ্চম মহিলা ছিলো বনী মুত্তালেবের বাঁদী। নাম সারা। কেউ কেউ বলেন, সে আমর ইবনে হেশামের বাঁদী ছিলো। হজরত হাতেব ইবনে আবু বালতা তার হাত দিয়েই কুরাইশদের কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। তার বিষয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে, সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিলো এবং মক্কাবিজয়ের দিন হজরত আলীর হাতে সে নিহত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, লোকেরা তার জন্য আমানপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেছিলো এবং তাকে আমান দেওয়া হয়েছিলো। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে আবতাহ নামক স্থানে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। 'শারহে ইবনে হাজার' নামক কিতাবে বলা হয়েছে, তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আবার হুমায়দী বলেছেন, তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। 'রওযাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকম বলা হয়েছে।

উম্মে সাআদ

ষষ্ঠজন ছিলো উম্মে সাআদ। তাকে হত্যা করা হয়েছিলো— এতোটুকুই বর্ণনা পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক আর কিছু জানা যায়নি। তার পরিচিতি, অপরাধের বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন জানা যায় না, তেমনি কে ছিলো তার হত্যাকারী, তাও এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম মালেক বলেছেন, বোখারীও এরকম রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুলেপাক স. মক্কাবিজয়ের দিন এহরামের সাথে মক্কায় প্রবেশ করেননি— সাধারণতঃ যেমনটি ধারণা করা হয়। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ইমাম মালেক থেকে দৃঢ়তার সাথে এরকমই বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফেও এরকম বর্ণনা এসেছে, হজরত জাবের রা. থেকে। তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. মক্কাবিজয়ের দিন ছাড়া আর কখনও এহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেননি।

উলামা কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, মক্কায় প্রবেশের জন্য এহরাম বাঁধা ওয়াজিব কি না। ইমাম শাফেয়ীর সুবিদিত অভিমত হচ্ছে, সাধারণতঃ ওয়াজিব নয়। আবার অন্য এক বর্ণনা মতে— সাধারণতঃ ওয়াজিব। তবে যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ করবে, তার প্রবেশের বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকতর প্রকাশ্য মত হচ্ছে, তার জন্য এহরাম বাঁধা ওয়াজিব নয়। তিন ইমামের সর্বজনবিদিত অভিমত হচ্ছে, তার জন্যও এহরাম বাঁধা ওয়াজিব। অপর এক বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেকের জন্যই দ্বিতীয়বার প্রবেশের জন্য এহরাম ওয়াজিব নয়। উলামা কেরাম এমতটিকেই অধিকতর দৃঢ় বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা বলেন, বারংবার যাকে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়, তাকে এহরাম পরিধান করতে হবে না। অবশ্য হানাফী মতাবলম্বীগণ বলে থাকেন, মীকাতের ভিতরে যারা বসবাস করেন, তাদের জন্য এহরাম পরিধান করা ওয়াজিব নয়। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. মক্কায় প্রবেশকালে শিরোস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি স. তখন ছিলেন পাগড়ী পরিহিত অবস্থায়। উলামা কেরাম এই দুই তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে— মক্কায় প্রবেশকালে প্রথমে তিনি স. শিরোস্ত্রাণশোভিত ছিলেন। পরে শিরোস্ত্রাণ খুলে পরিধান করেছিলেন পাগড়ী। যিনি তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছেন তিনি সে রকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত আমর ইবনে হুরায়ছ এর হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. সেখানে যখন খোতবা দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছিল কালো পাগড়ি। তিনি স. তখন খোতবা দিয়েছিলেন কাবাগৃহের

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তারপর প্রবেশ করেছিলেন কাবাগৃহে। শেষে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। এরকম বলেছেন, কাজী আয়ায। কেউ কেউ বলেছেন, পাগড়ি বাঁধা ছিলো শিরোস্ত্রাণের উপরে অথবা শিরোস্ত্রাণের নিচে। যাতে লৌহনির্মিত রৌদ্রতপ্ত শিরোস্ত্রাণের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝতে হবে, যিনি শুধু শিরোস্ত্রাণ পরিধানের কথা বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এরকম বলা যে, তিনি স. সেদিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। আর যিনি পাগড়ি পরিধানের বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিলো একথা বুঝানো যে, তিনি স. সেদিন এহরাম অবস্থায় ছিলেন না। কেননা এহরাম অবস্থায় মাথা খোলা রাখতে হয়।

মক্কায় অবস্থান

প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ স. মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ৮ই রমজান বুধবার আসরের নামাযের পর। আর বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন রমজান মাসের বিশ তারিখে। এরপর তিনি স. রমজান মাসের অবশিষ্ট দিনসমূহ এবং শাওয়াল মাসের ছয়দিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেছিলেন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বলা হয়েছে, তিনি স. মক্কায় অবস্থান করেছিলেন ১৫ দিন। এক বর্ণনায় আছে, ১৯ দিন। আর এক বর্ণনামতে ১৭ দিন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ১৮দিন। তবে বিশুদ্ধতর বর্ণনা এই যে, রসুলুল্লাহ্ স. তখন ১০দিনের কিছু বেশী সময় মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ওই সময় তিনি স. নামাজ আদায় করতেন কসরের সাথে।

মক্কায় অবস্থানকালে কয়েকটি মোকাদ্দমার ফয়সালা

মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে রসুলেপাক স. কয়েকটি মোকাদ্দমার ফয়সালা করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছিলো ফাতেমা নাম্নী এক মহিলার ঘটনা। সে ছিলো আসওয়াদ ইবনে আসওয়াদের কন্যা এবং আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযুমীর ভাতিজী। বনী মাখযুম নামক এক সম্মানিত কবিলার গোত্রের শাখা গোত্রভূতা ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিলো চুরির অভিযোগ। অভিযোগ যখন প্রমাণিত হলো, তখন রসুলেপাক স. তাঁর হস্তকর্তনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা এ ধরনের নির্দেশ শুনে অসন্তুষ্ট হলো। তারা তাঁর পক্ষে কোনো সুপারিশ করবে ভেবেছিলো। একথাও মনে করেছিলো যে, তাদের সুপারিশে হয়তো কাজ হবে। রহিত করা হবে হস্তকর্তনের নির্দেশ। রসুলেপাক স. এর প্রিয়জন হজরত উসামা বিন যায়েদকে তারা সুপারিশকারী নিযুক্ত করলো। তিনি

সেই গোত্রের এহসান ও দয়াদারীতে প্রভাবান্বিত হয়ে রসুল স. এর নিকট সুপারিশ পেশ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, উসামা! তুমি আল্লাহ্‌র হুদুদ অকার্যকর করতে চাও? তিনি রসুলেপাক স. এর জালালী হাল দেখে ভীত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমি গোনাহগার। সে কারণে ক্ষমা যাচনা করছি। তারপর রসুলেপাক স. ভাষণদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। বললেন, হে জনমণ্ডলী! হুঁশিয়ার হয়ে যাও। পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এ কারণে যে, তারা যখন দেখতো তাদের মধ্য থেকে কোনো বড় লোক চুরি করেছে তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। তারা তাকে শাস্তি দিতো না। তারা শাস্তি কার্যকর করতো কেবল দুর্বল ব্যক্তিদের উপর। শপথ ওই রব্বুল ইজ্জতের, যার কবজায়ে কুদরাতে মোহাম্মদের জীবন, মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তার উপর হস্ত কর্তনের বিধান প্রয়োগ করবো। এরপর মাখযুমী মহিলার হস্ত কর্তন করা হলো। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকীকে আল্লাহ্‌তায়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন সম্মানিত ইমাম। তিনি রসুলেপাক স. এর ওই ভাষণের বিবরণ দানকালে হজরত ফাতেমার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ওই ভাষণে তাঁর নামের স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো। তিনি আদব-সম্মানের প্রতি খেয়াল করে হজরত ফাতেমার নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, ওমুক ব্যক্তিও যদি চুরি করে (এখানে রসুলেপাক স. আহলে বায়তের একজনের নাম উল্লেখ করেছেন) তাহলে তারও হাত কর্তন করা হবে। হাদিস থেকে বুঝা যায়, হাকিমের কাছে মুকাদ্দমা পৌঁছে যাওয়ার পর হুদুদে এলাহীয়ার বিষয়ে কোনোরূপ সুপারিশ করা হারাম। আর হাকিমের কাছে মুকদ্দমা দায়ের হওয়ার পূর্বে যদি কারও জন্য সুপারিশ করা হয় এবং সে যদি দুষ্ট ও কাউকে কষ্টদানকারী না হয়, তাহলে তা জায়েয হবে। তবে তাযীরের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাতেই সুপারিশ করা জায়েয।

মক্কায় অবস্থান কালে দ্বিতীয় মুকাদ্দমাটি ছিলো এরকম— এক ব্যক্তি নবী করীম স. এর দরবারে এসে নিবেদন করলো, আমি মান্নত করেছিলাম আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাঁর রসুল কর্তৃক মক্কাবিজয় করাবেন, তখন আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামাজ পড়বো। রসুলেপাক স. বললেন, মসজিদে হারামেই নামাজ পড়ে নাও। লোকটি তিনবার একই কথা বললো। তৃতীয় বার রসুলেপাক স. বললেন, বায়তুল হারামে (কাবা শরীফে) এক রাকাত নামাজ পড়া অন্য যে কোনো স্থানে এক হাজার রাকাত নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম! হাদিস শরীফে এরকমই বর্ণনা এসেছে। অপর এক হাদিসে এসেছে, মসজিদে হারামের এক রাকাত নামাজ অন্য মসজিদের এক লক্ষ রাকাত নামাজের চেয়ে উত্তম। তাছাড়া এমন বর্ণনাও এসেছে যে, মসজিদে আকসায় পঠিত নামাজ এক হাজার নামাজের সমান। মসজিদে নববীতে দশ হাজার আর মসজিদে হারামে এক লক্ষ। সুতরাং মসজিদে হারামে

নামাজ পড়াই সর্বোত্তম। ইমাম মালেকের নিকট যেহেতু মক্কার চেয়ে মদীনার মর্যাদা বেশী কাজেই তিনি বলেন, মসজিদে নববীতে নামাজ অন্য যে কোনো স্থানের নামাজের চেয়ে উত্তম। সংখ্যার দিক দিয়ে যদিও মসজিদে হারাম বেশী, কিন্তু আস্থা, পবিত্রতা এবং রসুলেপাক স. এর অবস্থানের বরকতের কারণে মসজিদে নববীই উত্তমতম। যেমন মুতির একটি দানা এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার সমান। বিষয়টি মদীনার ইতিহাস গ্রন্থ 'যযবুলকুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' কিতাবে ভালোভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফেকাহ্ গ্রন্থে আছে, কেউ যদি মান্নত করে, বিশেষ ফযীলতপ্রাপ্ত কোনো মসজিদে সে নামাজ পড়বে, তাহলে অধিক ফযীলতপ্রাপ্ত যে কোনো মসজিদে নামাজ পড়লেই মান্নত আদায় হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি মান্নত করে, সে মসজিদে আকসা অথবা মদীনার মসজিদে নামাজ পড়বে। পরে সে যদি মসজিদে হারামে নামাজ পড়ে অথবা মান্নত করে মসজিদে আকসায় নামাজ পড়বে, তারপর নামাজ পাঠ করে মদীনার মসজিদে, তবুও তার মান্নত পুরা হয়ে যাবে। রসুলেপাক স. সে লোকটিকে বলেছিলেন 'তুমি এখানেই নামাজ পড়ে নাও' একথাটি প্রমাণ করে যে, মসজিদে হারামই উত্তমতর।

তাছাড়া মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে যে সকল বিষয়ে ফয়সালা দেওয়া হয়েছিলো তা হলো, মদ, শুকর, মৃতপ্রাণী এবং মূর্তির মূল্য নেওয়া হারাম। গণককে গণনার কাজের যে পরিশ্রমিক দেওয়া হয় তাও হারাম। মৃতপ্রাণীর চর্বি যা মশক ও নৌকায় ব্যবহার করা হতো, তাও নিষিদ্ধ করা হয়। রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন, তাদের উপর মৃতপ্রাণীর চর্বিকে হারাম করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করতো। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, যে জিনিস খাওয়া হারাম তার মূল্য গ্রহণ করাও হারাম।

মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.কে ত্রিশজন সৈন্যসহ নাখলা নামক স্থানে উযযা প্রতিমার মন্দির ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উয্যা ছিলো মূর্তিপূজক আরবদের বিখ্যাত মূর্তির নাম। হজরত খালেদ কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছে উয্যার মন্দির ধ্বংস করে ফিরে এলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মূর্তিটি ধ্বংস করছো? তিনি বললেন, হাঁ। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি কি সেখানে কিছু দেখেছো? তিনি বললেন, না। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তো উয্যা মূর্তি ধ্বংস করতে পারোনি। হজরত খালেদ পুনরায় সেখানে গেলেন এবং অনেক তল্লাশীর পর সেখানে উশকো খুশকো চুলবিশিষ্ট এক উলঙ্গ নারী মূর্তি দেখতে পেলেন। তারপর তরবারীর আঘাতে তাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। অতঃপর রসুলেপাক স.

এর কাছে এসে সকল ঘটনা জানালেন। রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ, ওটাই ছিলো উয্যার মূর্তি। তোমাদের শহরে আর কোনো দিন উয্যার পূজা হবে না। ওই উয্যা ছিলো মূর্তিপূজক কুরাইশদের উপাস্য। সেটি ছিলো তামামা এবং বনী কেনানারও সম্মানিত মূর্তি। মুশরিক আরবরা লাত ও উয্যার নামে শপথ করতো। লাত্ ছিলো তায়েফে বনী ছাকীফ গোত্রের মূর্তি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'মান তাখাল্লাফা বিললাতি ওয়াল উয্যা ফালইয়াকুল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (যে লাত ও উয্যার কসম করে সে যেনো বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)।

আরেকটি ঘটনা ছিলো এরকম— হজরত আমর ইবনুল আসকে সু'আ এর মন্দিরশালা ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হলো। সেটি ছিলো হোযায়ল গোত্রের মূর্তি। তার মন্দিরটি ছিলো মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে। হজরত আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন সেই মন্দিরের পুরোহিত বললো, তুমি কী চাও? আমি বললাম, রসুলেপাক স. আমাকে এই মন্দিরটি তার প্রতিমাসহ ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছেন। সে বললো, তুমি এ কাজ করতে পারবে না। এই মূর্তিই তোমাকে বাধা দিবে। হজরত আমর বললেন, আমি নিকটে গেলাম এবং মূর্তিটি ভেঙে ফেললাম। তারপর পূজারীকে বললাম, তুমি দেখলে তো আমি কী করলাম? পূজারী বললো, আমি আল্লাহ্তায়ালার উপর ইমান আনলাম।

অপর একটি ঘটনাঃ হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আশহালা নামক জনৈক সাহাবীকে বিশজন আরোহী সহকারে দুই হেরেমের মধ্যবর্তী মুছাল্লাম নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করলেন মানাতের মূর্তিশালা ধ্বংস করার জন্য। এ মূর্তিটি জাহেলী যুগ থেকে আউস, খাযরাজ ও গাসসান গোত্রের উপাস্য ছিলো। তারা সকলেই ছিলো মানাতের পূজক। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, সেখানকার প্রধান পূজারী বললো, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো? তিনি বললেন, মানাতকে ধ্বংস করতে। পূজারী বললো, তুমি এবং আউস গোত্রের লোকেরা সকলেই জানে এর পরিণাম কী হবে। হজরত সাঈদ মূর্তির দিকে অগ্রসর হলেন। তখন সেখান থেকে একটি নারীমূর্তির প্রতিচ্ছায়া বুকের উপর হাত মারতে মারতে বিলাপ করে বেরিয়ে এলো। হজরত সাঈদ তরবারীর আঘাতে তাকে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। তারপর মূর্তিশালা ধ্বংস করে রসুলেপাক স. এর দরবারে ফিরে এলেন।

আরেকটি ঘটনাঃ নাখলা এলাকায় উয্যা মূর্তি ধ্বংস করে আসার পর হজরত খালেদকে মুহাজির, আনসার ও বনী সুলায়মের তিনশ' লোকসহ ইয়ালামলামের দিকে বনী জযীমা গোত্রের কাছে প্রেরণ করা হলো। উদ্দেশ্য ইসলামের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা। বনী জযীমা গোত্রের অবস্থা ছিলো এরকম— মূর্খতার

যুগে হজরত খালেদের চাচা মাকেহ ইবনে মুগীরা এবং হজরত আব্দুর রহমানের পিতা আওফ একবার তেজারত করে ইয়ামন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁরা যখন ইয়ালামলামে পৌঁছলেন তখন বনী জাযীমার লোকেরা সম্পদের লোভে তাদেরকে হত্যা করে ফেললো এবং তাঁদের মালপত্র ছিনিয়ে নিলো। বনী জযীমার লোকেরা তাই হজরত খালেদের আগমনের সংবাদ শুনে সন্ত্রস্ত হলো। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তারা সাবধানতাবশতঃ এগিয়ে এলো। হজরত খালেদ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা মুসলমান, সাইয়্যেদে আলম এবং তাঁর দ্বীনের আহকামের উপর আমরা ইমান এনেছি। আমরা নামাজ পড়ি। আমাদের এলাকায় আমরা মসজিদ বানিয়েছি। সেখানে আমরা আজান ও একামত দিচ্ছি। নামাজও কায়েম করেছি আমরা। হজরত খালেদ বললেন, তাহলে আমাদের সামনে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসেছো কেনো? তারা বললো, আমাদের মধ্যে এবং আরবের এক কওমের মধ্যে দুশমনী আছে। আমরা ভয় করছিলাম আপনারা আমাদের সেই শত্রুপক্ষ কি না। হজরত খালেদ তাদের এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন না। বললেন, তোমরা অস্ত্র সংবরণ করো। তারা তা-ই করলো। শরীর থেকে খুলে ফেললো যুদ্ধের সাজ। হজরত খালেদ হুকুম দিলেন এদের হাতগুলো কাঁধের সাথে বেঁধে ফেলো। যথারীতি নির্দেশ পালিত হলো। হজরত খালেদ তাদেরকে তাঁর সহচরগণের এক একজনকে এক একজনের দায়িত্বে দিয়ে বললেন, এদের হেফাযতে রাখো। মধ্য রাত্রে তিনি পুনঃনির্দেশ দিলেন যার দায়িত্বে যে কয়েদী আছে, সে যেনো তাকে হত্যা করে ফেলে। বনী সুলায়ম দলপতির নির্দেশ কার্যকর করলেন। এভাবে নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা করা হলো। কিন্তু মুহাজির ও আনসারগণ এরকম করলেন না। তাঁরা তাদের হেফাযতে থাকা বন্দীগণকে হত্যা করা থেকে বিরত রইলেন। এক বর্ণনায় আছে ওইসব বন্দীরা যখন তাদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করতে লাগলো, তখন হজরত খালেদ তাদেরকে তরবারীর নিচে আনতে লাগলেন এবং তাঁদের প্রায় একশ লোককে হত্যা করে ফেললেন। পরে জযীমার এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে হজরত খালেদের কাণ্ড-কীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। রসুলেপাক স. রাগান্বিত হলেন। দুই-তিনবার উচ্চারণ করলেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আবরান ইলাইকা মিম্মা সানা'আ খালেদ' (হে আল্লাহ্! খালেদ যা করেছে আমি তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত)। অতঃপর তিনি স. হজরত আলীকে জাযীমার দিকে পাঠালেন। নিহতদের দিয়ত (রক্তপণ) পরিশোধ করে তাঁদের শোক প্রশমিত করা এবং হজরত খালেদকে তিরস্কার করার জন্যই ছিলো তাঁকে সেখানে প্রেরণের উদ্দেশ্য। হজরত আলী রা. রসুলেপাক স. এর হুকুমে উক্ত কবীলায় গেলেন এবং নিখুঁতভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। শোকগ্রস্তদের শোক প্রশমিত করলেন। শেষে ফিরে এলেন রসুলেপাক স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে।

জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন বনী জাযীমার সঙ্গে নির্দয় আচরণ করার কারণে রসুলেপাক স. ঐদিন হজরত খালেদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। অবশেষে বনী জাযীমার লোকেরা যখন তুষ্ট হলো এবং কয়েকজন সাহাবী যখন রসুলেপাক স.এর নিকট তার পক্ষে সুপারিশ নিবেদন করলেন, তখন তাঁকে ক্ষমা করা হলো। এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, হজরত খালেদের মতো একজন সাহাবীর দ্বারা এরকম নিষ্ঠুর কাজ সংঘটিত হয়েছিলো। উলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি একাজ করেছিলেন ভুল ইজতেহাদের কারণে। তিনি ভেবেছিলেন, যেহেতু তারা অস্ত্রসজ্জিত। তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধ করা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। আর অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। 'ওয়াল মুজতাহিদু ইউখতি ওয়া ইউসীব' (ইজতেহাদকারী ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, আবার তার সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে)। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রসুলেপাক স. দিয়তের হুকুম দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. অধিকাংশ সময় দিয়ত তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিতেন। যেমন খয়বরের ইহুদীদের সঙ্গে বিবাদের সময়কালে করেছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে হজরত খালেদ এবং বনী জযীমার ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে হাদিস গ্রন্থসমূহে অধিক বিশুদ্ধতার সাথে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে— হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. হজরত খালেদকে জযীমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা ইসলামের হক যথাযথ আদায় করেনি। তারা 'আসলামনা' (আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি) কথাটি না বলে তদস্থলে বলেছিলো 'সাবানা' (আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি)। একারণেই হজরত খালেদ তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, বনী জযীমার লোকেরা সরীহ শব্দ 'আসলামনা' না বলে দেনায়া শব্দ 'সাবানা' বলাতে হজরত খালেদ মনে করেছিলেন, ইসলামকে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো তারা এরকম কথা বলেছে। এরূপভাবেই তিনি তাদেরকে প্রথমে বন্দী, অতঃপর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদিস গ্রন্থসমূহে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। অবিমিশ্রণদুষ্টতাও রয়েছে। তাছাড়া জীবনী গ্রন্থসমূহে যে সকল বর্ণনা এসেছে, তাতে কিছু কিছু বিবৃতি সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, কথিত কাওমের লোকেরা সুস্পষ্টভাবে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছেন। শরীয়ত ও শরীয়তের শেআরসমূহ কায়েম করেছেন এবং নবুওয়াতের স্বীকৃতি পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র বহন করছি না। এতোকিছু বলা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা তো থাকাই সম্ভব নয়। তাছাড়া এরকম বর্ণনা করা যে, এ

কাওমের লোকেরা হজরত খালেদের চাচাকে এবং হজরত আব্দুর রহমানের পিতাকে জাহেলী যুগে হত্যা করেছিলো। এধরনের বর্ণনা সুধারণাবিরুদ্ধ। এরকম বিশ্বাস করলে হজরত খালেদের প্রতি মন্দ মনোভাব আপনা আপনিই এসে যেতে পারে। মনে হতে পারে পূর্ব শত্রুতার কারণে তিনি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। অথচ রসুলেপাক স. তাঁর শানে বলেছেন, 'খালেদুন সাইফুন মিন সুয়ুফিল্লাহ' (খালেদ আল্লাহ্র তরবারীসমূহের মধ্যে অন্যতম)। আল্লাহ্র তরবারী দ্বারা এহেন নাহক হত্যাকাণ্ড কেমন করে সংঘটিত হতে পারে? এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। আমি তখন মক্কার কাজী আলী ইবনে জারুল্লাহর কাছে ছিলাম। তিনি বনী যহর এবং হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের বংশধর ছিলেন। তাঁর সামনে হজরত খালেদের মক্কাবিজয়ের দিনের প্রসঙ্গ তোলা হলো, জানতে চাওয়া হলো, সেদিন রসুলেপাক স. এর পরিষ্কার নির্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও হজরত খালেদ হত্যাকাণ্ডে তাড়াহুড়া করেছিলেন। একথা শুনে কাজী সাহেব লজ্জিত হলেন। বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি ছিলেন ত্বরাপ্রবণ। যুদ্ধের সময় তাঁর এই ত্বরাপ্রবণতা আরো বেশী বেড়ে যেতো।

বিঃদ্রঃ 'সাবী' শব্দের অর্থ ধর্মান্তরিত হওয়া। এক ধর্মমত পরিত্যাগ করে নতুন কোনো ধর্মমত গ্রহণকারীকে সাবী বলা হয়। কুরাইশরা রসুলেপাক স.কে সাবী বলতো। কেননা তারা মনে করতো, তিনি তাঁর বাপদাদার ধর্মত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন। হজরত খালেদের নিকট শব্দটি পছন্দ হয়নি। তারা স্পষ্ট করে যদি বলতো 'আসলামনা' (আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি) তাহলে ওরকম মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক।

হুনাইনের যুদ্ধ

হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় অষ্টম হিজরীতে। হুনাইন একটি কূপের নাম, যা ছিলো মক্কা মুকাররমা থেকে তিনদিনের পথের দূরত্বে তায়েফের কাছে, এই যুদ্ধকে হাওয়াযেনের যুদ্ধও বলা হয়। হাওয়াযেন হচ্ছে, ওই স্থানে বসবাসকারী গোত্রের নাম। ঘটনার বিবরণ এরকম— মক্কাবিজয়ের পর যখন রসুলেপাক স. এর যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন, তখন দু'টি গোত্র ছাড়া আরবের অন্যান্য সকল গোত্রই আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। বিদ্রোহী গোত্র দু'টির মধ্যে একটির নাম হাওয়াযেন। অপরটির নাম ছাকীফ। দু'টি গোত্রই ছিলো শক্তিমান। দীর্ঘদেহী ওই মানবগোষ্ঠীদ্বয় ছিলো ধনসম্পদেরও প্রভূত অধিকারী। মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষও ছিলো চরম। ওই দুই গোত্রের অধিপতিদ্বয় মিলিত কণ্ঠে বলতে শুরু করলো মোহাম্মদ মক্কাবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। মক্কাবাসীরা যুদ্ধ বিদ্যায় অদক্ষ। তাই তারা মোহাম্মদকে প্রতিহত করতে পারেনি। মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে বুঝতে পারতো, যুদ্ধ কাকে বলে। সম্ভবতঃ তারা এখন

আমাদের দিকে ধাবিত হবে। কাজেই তাদের আক্রমণের পূর্বেই আমাদেরকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটাই হবে আমাদের জন্য উত্তম। এভাবে তারা তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগলো। মুসলমানদের কাছে অবশ্য তাদের এধরনের অপমন্তব্যের কোনো গুরুত্বই ছিলো না। কেননা তারা ছিলেন বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত। ওই যুদ্ধে গনিমত হিসেবে অনেক সম্পদ করতলগত হয়েছিলো তাদের। মুসলমানগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক মাল লাভ করেছিলেন। অতো বেশী গনিমত অন্য কোনো যুদ্ধেই তাঁরা পাননি। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. সংবাদ পেলেন, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তাদের পরিবার পরিজন, চতুষ্পদ প্রাণী ও প্রচুর পরিমাণে মাল আসবাব নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। এই সংবাদ পেয়ে রসুলেপাক স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্ তাদের সবকিছুই মুসলমানদের অধিকারে আসবে।

রসুলুল্লাহ্ স. শাওয়াল চন্দ্রের দুই তারিখ শনিবার দিন মক্কা মুকাররমা থেকে বারো হাজার সৈনিক এবং দু'হাজার তুলাকা ও সহযোগী যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে একশত যুদ্ধবর্ম চাইলেন। সফওয়ান জিজ্ঞেস করলেন একেবারে দিতে হবে, না ধার দিলেও চলবে? রসুলেপাক স. বললেন, ধার দিলেও হবে। তবে যেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সফওয়ান মনে করেছিলেন, রসুলেপাক স. হয়তো বলপূর্বক বর্মগুলো দখল করে নিবেন। ওই বাহিনীতে আশিজন মুশরিকও ছিলো। সফওয়ান ইবনে উমাইয়াও ছিলো তাদের একজন। হজরত এতাব ইবনে উসায়দকে মক্কার আমেল নির্ধারণ করা হলো। রসুলেপাক স. শাওয়ালের দশ তারিখে মঙ্গলবার হুনাইনে পৌঁছলেন। হাওয়াযেন গোত্রের নেতা ছিলো মালেক ইবনে আউফ নকরী এবং ছাকীফ গোত্রের সরদার ছিলো কেনানা ইবনে আবদ, অথবা লায়ল ছাকাফী, তারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে আগ থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলো। প্রতিবেশী কোনো কোনো শাখাগোত্রও যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। এভাবে কাফেরদের চার হাজার সৈন্য উপস্থিত হলো উন্মুক্ত এক প্রান্তরে। তাদের মধ্যে দরীদ ইবনে সাম্মা নামক এক অন্ধ বৃদ্ধ ছিলো। সে ছিলো যুদ্ধাবিদ্যাবিশারদ। কথিত আছে, তখন তার বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তার বয়স হয়েছিলো একশ ষাট বছর। সে মালেক ইবনে আউফ নফরীকে বললো, তোমরা পরিবার পরিজন ও মাল আছবাব নিয়ে ময়দানে বের হয়ো না। কিন্তু তারা তার কথা মানলো না। তখন সে বললো, হে হাওয়াযেন সম্প্রদায়! মালেক তোমাদেরকে অপমান ও অপদস্থ করবে। তোমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদ দুশমনদের অধিকারে দিয়ে দিবে। তোমাদের সকলকে দুশমনদের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে সে পশ্চাদপসরণ করবে। তার একথার ফলে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। মালেক বললো, তোমরা

যদি আমার কথা না মানো, আমার আনুগত্য না করো তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। একথা বলে সে খাপ থেকে তরবারী বের করে তার অগ্রভাগ বুকের উপর স্থাপন করে বলতে লাগলো, তোমরা যদি আমার কথা না মানো, আমার আনুগত্য না করো তাহলে আমি এই তরবারীর উপর পতিত হবো। মুহূর্তমধ্যে আমার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এই তলোয়ার। হাওয়াযেনরা বললো, মালেক আবেগতাড়িত এক অপরিণামদর্শী যুবক। এখন আমরা যদি তার কথা না মানি, তবে মূর্খতাবশতঃ সে আত্মহত্যা করবে। আর দরীদ একজন বৃদ্ধ অক্ষম ও অন্ধ ব্যক্তি। তিনি নেতৃত্বদানের যোগ্যও নন। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে বলেও জানি না, যে আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে। সুতরাং তারা দরীদের কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং মালেকের মতামতের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলো। অবশেষে সকলেই হুনাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হলো।

কথিত আছে, মালেক ইবনে আউফ ইসলামী বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একদল লোক পাঠালো। ওই দলটি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর কাঁপতে কাঁপতে মালেকের নিকট পৌঁছলো। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের পেরেশানীর কারণ কী? তারা বললো, আমরা যখন ইসলামী বাহিনীর কাছে পৌঁছলাম তখন শাদা পোশাক পরিহিত লোকদেরকে শাদা-কালো রঙের ঘোড়ার উপর আরোহী অবস্থায় দেখলাম। এ ধরনের লোক আমরা কখনও দেখিনি। এ অবস্থায় এখান থেকে ফিরে যাওয়াই আমাদের জন্য সমীচীন। আমাদের সিপাহীরা তাদেরকে দেখলে তাদেরও অবস্থা হবে আমাদের মতো। মালেক তাদেরকে বিশ্বাস করলো না। প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সে এবার অন্য লোকদেরকে প্রেরণ করলো। তারাও এসে একই অবস্থার বর্ণনা দিলো। উল্লেখ্য, ওই শাদা পোশাকধারীরা ছিলো ফেরেশতা বাহিনী। তাঁরা ইসলামী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন বদরের যুদ্ধের সময়। এই বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাদের অবতরণ কেবল বদরের যুদ্ধের জন্যই বিশিষ্ট ছিলো না। কেউ কেউ বলেন, হুনাইনের প্রান্তরে ফেরেশতাদের আগমন ঘটেছিলো মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করনার্থে এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানার্থে। সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের দায়িত্ব তাঁদের ছিলো না।

মোট কথা মালেক ইবনে আউফ ওই সকল আলামত দেখার পরও তার অশুভ উদ্দেশ্য থেকে পিছপা হলো না। আক্রমণের বিষয়ে হলো অধিকতর দৃঢ়। জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেন, ইসলামী বাহিনীর সংখ্যাধিক্য দেখে মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, আমাদের বাহিনী সুবিশাল। সুতরাং পরাজয় আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। রসুলেপাক স. এরকম মন্তব্যে অতুষ্ট হলেন। কেননা এধরনের মন্তব্যে থাকে অহংকারের আভাস। জীবনী

প্রণেতাগণ বলেন, ওই যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ মুসলমানগণ যেনো এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে যে, সৈন্যসংখ্যার আধিক্য ও পূর্ণ প্রস্তুতির উপর মুসলমানদের বিজয় নির্ভর করে না। বরং বিজয় নির্ধারিত হয় হকতায়ালার অভিপ্রায়ানুসারে 'ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য পক্ষ থেকে সাহায্য আসে না)। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন 'ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু ফী মাওয়াতিনা কাসীরাতিওঁ ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন ইয আ'যাবাতকুম কাছরাতুকুম ফালাম তুগনি আ'নকুম শাইয়া' (আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধর দিনে যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই)(২৫ঃ৯)।

সৈন্যসংখ্যার আধিক্যের অহংকার অবশ্যই অপছন্দনীয়। আর ওই ব্যক্তির মন্তব্য অহংকারপ্রসূত ছিলো বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরকম ছিলো না। হাদিসগ্রন্থ আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, 'খাইরু সাহাবাতিন আরবায়াতুন ওয়া খাইরুস্ সারাইয়া আরবাআ' মিআতিন ওয়া খাইরু জাইশি আরবায়াতা আলান ওয়ালাইঁ ইয়াগলিবা ইছনা আশারা আলফাম মিন কিল্লাতিন' (সর্বোত্তম সাহাবী চারজন, সর্বোত্তম অভিযান চারশ' আর সর্বোত্তম বাহিনী চার হাজার। বিপরীতপক্ষের স্বল্পতার কারণে বারো হাজার ব্যক্তি কক্ষণো বিজয়ী হতো না। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা বারো হাজার ছিলো। উক্ত সাহাবী মুসলিম বাহিনীর শান-শওকত দেখে একথা বলেছিলেন। বর্ণিত হাদিসের বর্ণনার আলোকে মনে হয় ওই মন্তব্যকারী সাহাবী হজরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন না, যেমন কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, মালেক ইবনে আউফ মুসলিম বাহিনী পৌঁছার পূর্বেই তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে হুনাইন প্রান্তরে প্রবেশ করেছিলো। প্রবেশ করে আগে আগেই লোকদেরকে বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে দিয়েছিলো সুদৃঢ়ভাবে।

লোকদেরকে হুকুম দিয়েছিলো, মুসলমানরা প্রথমে আমাদেরকে দেখতে পাবে না। এ ময়দানে প্রবেশ করার সাথে সাথে তোমরা একসঙ্গে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিও।

রসুলে পাক স. সুবেহ কাযেবের সময়, অপর বর্ণনানুসারে সেহরীর সময় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে তাদেরকে যুদ্ধের পতাকা দান করলেন এবং যাত্রা শুরু করলেন। হুনাইনের ঘাঁটিতে সংকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে যেতে হয়। রাস্তাটিও ছিলো বিপদসংকুল। রাস্তায় কোথাও কোথাও ছিলো গর্ত। সে কারণে সকলে মিলে এক সাথে সে জায়গা অতিক্রম করা কঠিন ছিলো। কয়েকজন এক সাথ হয়ে

ছোটো ছোটো দল করে করে এ কঠিন রাস্তাটি অতিক্রম করে ওই ঘাঁটিতে মুসলিম বাহিনী অবশেষে প্রবেশ করলো। কাফেররা সুযোগ পেলো। তারা ওঁৎপেতে থাকা আপন আপন জায়গা থেকে বের হয়ে ইসলামী বাহিনীর উপর একযোগে হামলা করলো। তীরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। তারা সকলেই ছিলো তীরন্দাজ যোদ্ধা। মুসলমানদের অগ্রবর্তী দলটির দায়িত্বে ছিলেন হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এবং বনী সুলায়ম নামক অপর এক সাহাবী। তাঁরা তখন ছিলেন নিরস্ত্র। তাঁরা পিছনের দিকে ফিরে আসতে চাইলেন। তাঁদের পিছনে ছিলো কুরাইশ কাফেরবৃন্দ এবং কিছু নওমুসলিম। তখন পর্যন্ত তাঁদের বিশ্বাস ছিলো অদৃঢ়। তাই তারা পলায়ন করতে শুরু করলো। প্রবীণ সাহাবীগণও হঠাৎ আক্রমণে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁরা আক্রমণ ও পলায়ন বরদাশত করতে পারলেন না। আত্মরক্ষার জন্য বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। মুসলিম বাহিনীতে এমন কিছু বিশৃংখলা দেখা দিলো যে, হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র মোকাবেলায় সুদৃঢ় রইলেন। ময়দানে যাঁরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত আলী, হজরত আব্বাস, হজরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ, রবীআ ইবনুল হারেছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, কছম, ফজল, উসামা ইবনে যায়েদ, উম্মে ইয়ামনের ভাই ইবনে উম্মে ইয়ামন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আকিল ইবনে আবু তালেব। আরও কয়েকজন আহলে বাইত, যেমন হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও হজরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুম। তারাও দৃঢ়তার সাথে ময়দানে অবস্থান নিলেন। কতিপয় সাহাবী রসুলেপাক স. এর অগ্রভাগে ছিলেন। আর কেউ কেউ ছিলেন ডানে ও বামে। হজরত আব্বাস রা. রসুলেপাক স. এর ঘোড়ার পাদানী ধরে রেখেছিলেন আর আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ ধরেছিলেন ঘোড়ার লাগাম। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আব্বাস ডান দিকের আর হজরত আবু সুফিয়ান বাম দিকের পাদানী ধারণ করেছিলেন। সে দিন রসুলেপাক স. ওই উটের উপর আরোহণ করেছিলেন, যার নাম ছিলো দুলদুল। এক বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ্ স. এর তখনকার বাহনটি ছিল একটি শাদা খচ্চর। ফারওয়া জুযামী নামক এক ব্যক্তি রসুলেপাক স.কে খচ্চরটি হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিলো।

জীবনীলেখকগণ বলেন, যুদ্ধে খচ্চরারোহী হওয়া পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হওয়াকেই প্রমাণ করে। এটা নবুওয়াতের নিদর্শনও। নতুন খচ্চর তো কোনো যুদ্ধের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এতো ব্যবহার হয় পূর্ণ শান্তির সাথে ভ্রমণবিলাসিতার ক্ষেত্রে। খচ্চর কখনোই যুদ্ধের উপযোগী প্রাণী নয়। যুদ্ধের ময়দানে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বাহন হচ্ছে ঘোড়া। কারণ ঘোড়া সৃষ্টিগতভাবেই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। এক্ষেত্রে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের ময়দানে রসুলেপাক স. এর সাহায্যের জন্য ফেরেশতাগণ শাদা-কালো রঙের ঘোড়ার উপর

ছওয়ার হয়ে এসেছিলেন। কাজেই ঘোড়ার উপর ছওয়ার হওয়া ছাড়া আর অন্য কিছুই যোদ্ধার জন্য শোভনীয় নয়। খচ্চরও নয় উটও নয়। তবে রসুলেপাক স. হুনাইনের যুদ্ধের দিন খচ্চরের উপর ছওয়ার হয়েছিলেন সম্ভবতঃ এ বিষয়টি বুঝানো উদ্দেশ্যে যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা আর শান্তিকালীন অবস্থা উভয়টি তাঁর কাছে সমান। কলবের শক্তি, নফসের বীরত্ব এবং আল্লাহ্তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল সব সময়ই তাঁর এক রকমই ছিলো। সে কারণেই হুনাইনের যুদ্ধের ময়দানে দেখা গিয়েছে, রসুলেপাক স. আঘাত করে করে তাঁর বাহনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ছওয়ারীর লাগাম ধরে টেনে রাখছেন। এমতাবস্থায় রসুলেপাক স. বলছেন, জেনে রেখো, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং রসুল। তিনি আরও বলছেন 'আনা নাবীউন লা কাযিব আনা ইবনু আবদুল মুত্তালিব' (আমিই নবী, তা মিথ্যা নয়, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র)। মুসলমানদের অন্তরে সাহস সৃষ্টি করার জন্য এরকম বলতেন তিনি স.। মুসলমানদের আল্লাহ্র সাহায্যের ওয়াদা স্মরণ করানোর জন্য বলতেন, আমি আছি, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা কোথায়? আমি আছি, তোমরা কোথায়? তিনি আরও বলতেন, হে আল্লাহ্কে সাহায্যকারী, হে নবীকে সাহায্যকারী। এ সব কথা বলে তিনি বুঝাতে চাইতেন যে, আমি আল্লাহ্র নবী আর নবী কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। আর আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্র সাহায্যের অঙ্গীকার সত্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন 'ছুম্মা আনযাল্লাহু সাকীনাতাহু আ'লা রসূলিহী ওয়া আ'লাল মু'মিনীনা ওয়া আনযালা জুনূদাল লাম তারাও হা' (অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই) (৯ঃ২৬)।

রসুলেপাক স. বলেছেন, 'আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব' (আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র)। তিনি একথা বলেননি 'আনা ইবনু আবদিল্লাহ্' (আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র)। তার কারণ হচ্ছে, পিতা হজরত আব্দুল্লাহ্র চেয়ে তাঁর দাদা হজরত আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অধিক খ্যাতিমান। আর একটি কারণ হচ্ছে, তাঁর দাদার বর্তমানে তাঁর পিতার ইনতেকাল হয়েছিলো। আরেকটি কারণ, মানুষের অন্তরে হজরত আবদুল মুত্তালিবের মর্যাদা ও শান এতো বেশী ছিলো যে, ওই মর্যাদায় পৌঁছতে কেউই সক্ষম হয়নি। হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা রসুলেপাক স. এর মোজেযার অন্তর্ভুক্ত। ময়দান থেকে যখন একদল লোক পলায়নগামী হয়ে গেলো তখন কাফেরদের একটি দল এবং কুরাইশদের মধ্য থেকে সদ্য ইসলামগ্রহণকারী কতিপয় লোক তাদের অন্তরে লুক্কায়িত সংশয় প্রকাশ করে বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদের সাথী সঙ্গীরা এমনভাবে পলায়ন করছে যে, মনে হয় তারা দরিয়ার কিনারায় না পৌঁছানো পর্যন্ত থামবে না। সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার মামা

বেলাল ইবনে খলিল বলতে লাগলো, আজ ওই দিন, যে দিন যাদু বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কোনো জীবনীবিশারদ বলেছেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের মুখ থেকেও এরকম কথা বেরিয়েছিলো। সে সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে লক্ষ্য করে বললো, তোমাকে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গী-সাথীরা পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার অন্তর থেকে তখন শিরিক ও কুফুরী এবং মূর্তির প্রতি সমীহবোধ উধাও হয়ে গিয়েছিলো। রসুলুল্লাহ্ স. এর মহানুভবতার প্রভাবে তখন তিনি হয়ে গিয়েছিলেন প্রকৃত মুসলিম। তাই তিনি আর সুফিয়ানের এহেন মন্তব্যেও আনন্দ প্রকাশ করলেন না। তিনি তাঁর মুখের উপর বলে দিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার মুখ ভেঙে দিবেন। হাওয়াযেন গোত্রের কারও সাহায্যে আসার চাইতে কুরাইশ বংশের কোনো ব্যক্তির সাহায্যে রত থাকাকে আমি শ্রেয় মনে করি।

প্রায় সকলে যখন এরকম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো, তখন রসুলেপাক স. হাতেগোণা কয়েকজনকে নিয়ে ময়দানে অটল অবস্থান গ্রহণ করলেন। হজরত আব্বাসকে বললেন, তুমি সকলকে উচ্চস্বরে ডাক দাও— হে আনসার সম্প্রদায়! হে আসহাবে সামুরা! সামুরা একটি বৃক্ষের নাম, যার নিচে হুদাইবিয়ায় বায়াত সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁদেরকে আসহাবুশ্ শাজার বা আসহাবে বায়তুর রেদওয়ানও বলা হয়। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ আরও বলেছেন, রসুলেপাক স. তাঁদেরকে ইয়া আসহাবা সুরাতিল বাকার বলেও ডাক দিতে বলেছিলেন। সুরা বাকারার আসহাব বলে সম্বোধন করা দ্বারা সাহাবীগণকে সম্মান করা বুঝানো হয়েছে। কেননা মহাসম্মানিত সাহাবীগণ সুরা বাকারা পাঠ করেই ইমান এনেছিলেন। এটি কোরআন মজীদের সবচেয়ে বড় সুরা। হজরত আব্বাসের কণ্ঠস্বরও ছিলো গুরুগম্ভীর ও উচ্চ। তাই রসুলেপাক স. তাঁকেই উচ্চ আওয়াজে ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ যখন হজরত আব্বাসের ডাক শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলে জবাব দিলেন। ডাক শুনে সাহাবীগণ এমনভাবে সমবেত হতে লাগলেন যে, মনে হলো মৌমাছিরা তাদের নেত্রীমৌমাছির কাছে অতি দ্রুত একত্রিত হচ্ছে। হজরত আব্বাসের দিকে দৌড়ে যেতে লাগলেন সকলে। আর কোনো কোনো সাহাবীর ঘোড়া ধীরগতিসম্পন্ন ছিলো। তাঁরা হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে রসুলেপাক স. এর নিকট চলে এলেন। এভাবে যখন প্রায় সকল যোদ্ধা জমায়েত হয়ে গেলেন, তখন কালবিলম্ব না করে দুশমনদের উপর হামলা শুরু করে দিলেন তাঁরা। রসুলেপাক স. বললেন, 'আলান হামিয়াল ওয়াতীম' (এখন তন্দুর উত্তপ্ত হয়েছে)। 'ওয়াতিস' বলা হয় তপ্তচুল্লিকে, তন্দুরকে। উত্তপ্ত হওয়ার পর যার মধ্যে কাঁচা রুটি রাখা হয়। এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এই প্রবাদটি সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় যুদ্ধ খুব প্রকট আকার ধারণ করলে। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. যে

ফাসাহাতে কালামের (সুকুমার বাক্যাবলীর) অধিকারী ছিলেন এটা তার একটি প্রমাণ। কারণ এটি তিনি অন্য কারও কাছ থেকে শিখে বলেননি। এই বাক্যটি ইতোপূর্বে আর কারও মুখ থেকে শোনাও যায়নি।

রসুলেপাক স. ছওয়ারীর উপর থেকে অবতরণ করলেন এবং এক মুষ্টি মাটি হাতে নিলেন। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. ছওয়ারীর উপর থেকেই হজরত আব্বাসের কাছে মাটি চেয়েছিলেন। তারপর 'শাহাতিল উজুহ্' বলে মুষ্টিবদ্ধ মাটি ছুঁড়ে দিলেন দুশমনদেরকে লক্ষ্য করে। নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাকণাগুলো মুশরিকদের সকলের চোখে মুখে পতিত হলো। এমন কোনো কাফের ছিলো না যার চোখে নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাকণা পতিত হয়নি। এক বর্ণনায় আছে, এ মাটি দ্বারা মুশরিকদের চোখমুখ ভরে গিয়েছিলো। তারপর বললেন, শপথ মোহাম্মদের প্রভুপালকের, তারা পরাজিত হয়ে গিয়েছে। তারপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দাও। কাফেরদের জন্য এটা সমীচীন নয় এবং তারা এর উপযুক্ত নয় যে, তারা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন এই দোয়া করেছিলেন 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া ইলাইকাল মুসতাকা ওয়া আনতাল মুসতাআনু ওয়াবিকাল মুসতাগাসু ওয়া আ'লাইকাত তুকলানু'। তারপর রসুলেপাক স. বললেন, মোহাম্মদের রবের শপথ! সত্যপ্রত্যাখানকারীরা পালিয়ে যাবে। হজরত জিব্রাইল আ. উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে মোহাম্মদ! আল্লাহ তায়ালা আজ আপনাকে ওই কলেমার তালকীন দিচ্ছেন, যা তিনি নবী মুসাকে তালকীন দিয়েছিলেন, যখন বনী ইসরাইলদের জন্য নীল দরিয়ার মাঝখান দিয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছিলো। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়— 'ওয়ামা রমাইতা ইজ রমাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রমা ওয়ালিইয়ুবলিয়াল মু'মিনীনা মিনহু বালাআন হাসানান ইন্নাল্লাহা সামীউন আ'লীম' (এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ইহা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)(৮ঃ১৭)।

হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. মুশরিকদের প্রতি যে পাথরকণা ও মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তার আওয়াজ এরকম শোনা যাচ্ছিলো, যেনো আকাশ থেকে কোনো কিছু বড় থালার মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হাওয়াযেন কবীলার যে সকল লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো, তাদেরই মধ্য থেকে কারও সন্তান তার পিতার কাছ থেকে এরূপ বর্ণনা শুনেছে যে, আমাদের উপর যখন পাথরকণা ও মাটি নিক্ষেপ করা হলো, তখন কোনো চক্ষু এমন ছিলো না যে, তা মাটি দিয়ে ভরপুর হয়নি। আমাদের বুক থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ভীষণ ভয় পেলাম আমরা। সে আরও বলেছে,

আমরা এমন আওয়াজ শুনতে পেলাম, যেনো তশতরির উপর হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হচ্ছে। সহসা আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলো। মেঘের মিছিল আমাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেললো। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, কালো কালো পিপীলিকা পুরো প্রান্তর ছেয়ে ফেলেছে। আরো দেখা গেলো, প্রতিটি পাথর ও গাছপালায় সর্বত্রই শাদা পোশাক পরিহিত অসংখ্য যোদ্ধা শাদা-কালো বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে আছে তাদের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই বিশাল বিশাল দেহের অধিকারী। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এমন বর্নাঢ্য জ্যোতিচ্ছটার দিকে চোখ তুলে তাকানোই যাচ্ছিলো না।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সেই দিন তাঁর নবীকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে হাওয়াযেন কবীলার লোকেরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ওই সকল শুভ্রবসনধারী লোকেরা কোথায় গেলো, যাদেরকে আমরা শাদা-কালো ঘোড়ায় আরোহণকারী রূপে দেখেছিলাম? আমাদের লোকগুলো তো মারা গিয়েছে তাদের হাতেই। এখন তারা কোথায়? এই বিবরণ শুনে বুঝা যায় যে, হুনাইনের যুদ্ধেও ফেরেশতা অবতরণ করেছিলো। যেমন অবতরণ করেছিলো বদরের যুদ্ধে। যারা এরূপ বলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ কেবল পরোক্ষ সাহায্যের জন্য ছিলো, সরাসরি আক্রমণের দায়িত্ব ছিলো কেবল বদরের যুদ্ধের সময়, তাদের অভিমতটি সুদৃঢ় নয়।

এরপর শুরু হলো সরাসরি আক্রমণ। মুসলমানগণ খাপ থেকে তরবারী বের করে কাফেরদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাহাবীগণ এমন আক্রমণ রচনা করলেন, যেনো আকাশ থেকে তারকারাজি ছিটকে ছিটকে কাফেরদের উপর পতিত হতে লাগলো। শুরু হলো কাফেরদের পলায়নের পালা। উটের দুধ দোহন করতে যে সময় লাগে এতোটুকু সময়ও তারা টিকতে পারলো না।

শায়বা ইবনে ওছমান নামক একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, যখন কুরাইশ বাহিনী মোহাম্মদের সঙ্গে হুনাইনে গিয়েছিলেন, তখন আমিও তাদের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, যুদ্ধের ময়দানে সুযোগ পেলে আমি মোহাম্মদকে শহীদ করে দিবো। উহুদের যুদ্ধে আমার পিতা নিহত হয়েছিলেন। তখন থেকে আমার মনে জ্বলছিলো প্রতিহিংসার আগুন। আমি মনে মনে সংকল্প করেছিলাম, সকল মানুষ তাঁর অনুগত হয়ে গেলেও আমি তাঁর আনুগত্য কখনোই করবো না। এরকম অসদুদ্দেশ্য নিয়ে আমি রসুলেপাক স. এর পিছনে চলতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি তাঁর দিকে তরবারী তাক করলাম। ঠিক তখনই চেয়ে দেখি বিদ্যুতের মতো তীক্ষ্ণ আগুনের শিখা আমার দিকে ধেয়ে আসছে। মনে হলো ওই অগ্নিশিখা আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে। এমন সময় রসুলেপাক স.

ডাকলেন, শায়বা! কাছে এসো। আমি রসুলেপাক স. এর কাছে গেলাম। তিনি তখন তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে আমার বুকের উপর মৃদুভাবে আঘাত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি একে শয়তানের ক্ষতি থেকে হেফাযত করো। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্তায়ালা আমার অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিলেন। আল্লাহ্র শপথ! সেই মুহূর্তেই মনে হতে লাগলো, রসূলুল্লাহ স. আমার জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়। রসুলেপাক স. বললেন, যাও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ো। আমি রসুলেপাক স. এর অগ্রভাগে চলে গেলাম। তরবারী পরিচালনা করতে লাগলাম বীর বিক্রমে। আল্লাহ্র শপথ! তখন আমার পিতাও যদি শত্রু হিসাবে সামনে আসতো, তবুও আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম। কাফেরেরা পরাজিত হলো। রসুলেপাক স. ফিরে এলেন, আপন তাঁবুতে। তাঁর রূপ-সুষমা অবলোকন করার উদ্দেশ্যে আমিও তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, শায়বা! তুমি তোমার অন্তরে যা পোষণ করেছিলে, তার চেয়ে উত্তম তো এটাই, যা আল্লাহ্তায়ালা তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাই নয় কি? আমি স্বীকার করলাম। অন্তরের অশুভ উদ্দেশ্যের কথা খুলে বললাম, তাঁকে বললাম, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ্। আরো বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্য এস্তেগফার করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাদিসের বিবরণ দৃষ্টে একথা বুঝতে আর বাকী থাকে না যে, হজরত শায়বার অন্তরে ওই সময়ই ইমান ও ভালোবাসা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলো, যখন তিনি স. তাঁর সীনার উপর পবিত্র হাত রেখেছিলেন। তাই সাথে সাথে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে শুরু করেছিলেন অকুণ্ঠ চিত্তে, যদিও তখন পর্যন্ত শাহাদতের বাণী তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। এই পবিত্র বাণী তিনি উচ্চারণ করে ছিলেন পরে। রসুলুল্লাহ্ স. এর তাঁবুতে প্রবেশ করার পর। এই হাদিস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ইমান মূলতঃ অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের আহকাম জারী করার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়। সেটিও যখন অর্জিত হয়, তখন ইমান পায় তার পরিপূর্ণ রূপ।

সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত বারা ইবনে আযেব বলেন, কিছু লোক একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু রসুলেপাক স. পলায়ন করেননি। তিনি কেন্দ্রস্থলে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যখন হাওয়াযেনদের উপর হামলা করলাম, তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। অতঃপর আমরা যখন গনিমতের দিকে মনযোগী হলাম, তখন তারা আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে প্রথমে পলায়ন ও পেরেশানির পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কারণ আমরা ঝুঁকে পড়েছিলাম পার্থিব সম্পদের প্রতি। উহুদের যুদ্ধে পর্যুদস্ততার কারণও ছিলো তা। হজরত বারা

বলেন, তবে রসুলেপাক স. ওই সঙ্গীণ পরিস্থিতিতেও তাঁর শাদা রঙের গাধার উপর আরোহণ করে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিলেন, 'আনান নাবিউ লা কাযিব আনা ইবনু আ'বদিল মুত্তালিব' (আমি সত্য নবী। এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র)। উল্লেখ্য, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। এরকম হবেই বা না কেনো, যিনি বীরত্বে সর্বোচ্চ শিখরচারী, হক তায়ালার অঙ্গীকারের পূর্ণ আস্থাবান, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব তো হবেই? একথার উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসুলেপাক স. এর প্রতি পরাজিত হওয়ার ধারণা অবৈধ। কাজী আয়ায মালেকী তার 'আশশেফা' গ্রন্থে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছেন এভাবে— কেউ যদি এরকম বলে যে, রসুলেপাক স. পলায়নের পথ অবলম্বন করেছিলেন, তবে তাকে তওবা করতে হবে। সে যদি তওবা করে তাহলে ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, আল্লামা দিমইয়াতী বলেছেন, উক্ত ব্যক্তি যদি এরকম আকীদা পোষণ করে যে, রসুলেপাক স.কে দোষারোপ করা তার উদ্দেশ্য নয়, তখনই কেবল তরবারী প্রসঙ্গটি আসবে। কেননা দোষারোপ করা বা গালিগালাজ করার উদ্দেশ্য যদি করে থাকে তবে তার তওবা কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়ে উলামা কেরামের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। আর এ বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে যে, তাকে হত্যা করতে হবে মুরতাদ হওয়ার কারণে, শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হুনায়ন যুদ্ধে চারজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন আয়মান ইবনে উম্মে আরমান। তিনি ছিলেন হজরত উসামা বিন যায়েদের মা সম্পর্কের ভাই। তিনি রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। আর কাফেরদের মধ্য থেকে নিহত হয়েছিলো সত্তুর জন। জীবিতদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অবশিষ্টরা পলায়ন করেছিলো। পলায়নকারীরা তিন দলে বিভক্ত হয়েছিলো। মালেক ইবনে আউফ ও তার সঙ্গীরা তায়েফের দুর্গের দিকে পলায়ন করেছিলো। আরেকটি দল পলায়ন করেছিলো বতনে নখলার দিকে। আর একদল আপন আপন মাল হেফাযত করার জন্য আওতাসের দিকে দৌড়ে গিয়েছিলো। মুসলমানগণ তাদের পিছনে তাড়া করেন। অবশেষে তাদের সবাইকে হত্যা করতে সমর্থ হন। রসুলেপাক স. তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন 'মান কাতালা কাতীলান ফাল্হু সালাবুহু' (যে যাকে হত্যা করবে তার মালপত্র সেই পাবে)। এক বর্ণনায় আছে, যে যাকে হত্যা করবে তার এ কাজের প্রমাণ পাওয়া গেলে নিহত ব্যক্তির ছামান, হাতিয়ার, কাপড় ও পশু সবকিছু দেওয়া হবে তাকেই। হজরত আবু কাতাদা আনসারী এক কাফেরকে হত্যা করলেন। কিন্তু নিহত ব্যক্তির মালপত্র চলে গেলো অন্য একজনের কাছে। তিনি যখন বিষয়টি রসুলেপাক স.কে জানালেন, রসুলুল্লাহ্ স. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

ডেকে আনালেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি বললেন, আবু কাতাদা ঠিকই বলেছেন। তবে আমার ইচ্ছা মালপত্রগুলো আমার কাছেই থাকুক। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি দয়া করে আবু কাতাদাকে বলুন, সে যেনো মালমাত্তাগুলো আমাকেই দিয়ে দেয়। হজরত আবু বকর সিদ্দীক একথা শুনে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র রসুল আল্লাহ্‌র সেই ব্যঘ্রকে বঞ্চিত করবেন না। এটা তারই হক। রসুলেপাক স. বললেন, শুনেছো, আবু বকর কী বলেছে। তুমি তার মালগুলো ফিরিয়ে দাও। হজরত আবু কাতাদা তার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি যুদ্ধবর্ম পরে বিক্রয় করে তার মূল্য দিয়ে একটি বাগান ক্রয় করেছিলেন।

সেই দিন রসুলেপাক স. নিহত এক মহিলার মরদেহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে অনেক লোক ভীড় করেছিলো। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, এখানে এতো ভীড় কেনো? লোকেরা বললো, এখানে পড়ে রয়েছে এক কাফের মহিলার লাশ। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ একে হত্যা করেছেন। রসুলেপাক স. তৎক্ষণাৎ খালেদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, মহিলা, শিশু এবং মজদুরদেরকে যেনো হত্যা না করা হয়। সম্ভবতঃ খালেদ ইবনে ওয়ালীদ শরীয়তের এই বিধানটি আগে জানতেন না।

এরপর হজরত আবু মুসা আশআরীর চাচা আবু আমের আশআরী একটি বাহিনী নিয়ে আওতাসের দিকে পলায়নকারী কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করলেন। ওই বাহিনীতে তাঁর সহযোদ্ধা হিসেবে ছিলেন হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হজরত আবু মুসা আশআরী, হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া প্রমুখ। মুসলিমবাহিনী আওতাসে পৌঁছানোর সাথে সাথে যুদ্ধ বেধে গেলো। সেখানে কাফেরদের নেতা অশীতিপর বৃদ্ধ দরীদ ইবনে সাম্মা হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের হাতে নিহত হলো। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হজরত আবু আমেরও শাহাদত বরণ করলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁর শাহাদতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তবে বিশুদ্ধতার বর্ণনায় ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— যুদ্ধ চলাকালে বনী জশম গোত্রের এক লোক যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে তীর নিক্ষেপ করলো। তীরটি বিদ্ধ হলো তাঁর উরুদেশে। সে তীরটি বের করা সম্ভব হলো না। হজরত আবু মুসা তীর নিক্ষেপকারী লোকটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তরবারীর আওতায় যখন পেলেন তখনই তাকে হত্যা করে ফেললেন। ফিরে এসে তীরটি আবু আমেরের উরু থেকে বের করার চেষ্টা করলেন। এবার অনেক চেষ্টার পর তীরটি বের করা গেলো। কিন্তু রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হলো না। হজরত আবু আমের বুঝতে পারলেন অন্তিম সময় সমুপস্থিত। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! রসুলেপাক স. এর নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো। বোলো, তিনি যেনো আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তয়ালার নিকট দোয়া করেন। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, অতঃপর সে যুদ্ধের সেনাপতি করা হলো আমাকে। আর

আল্লাহ্তায়ালা আমার হাতেই ওই যুদ্ধের বিজয় দান করলেন। যুদ্ধশেষে আমি যখন রসুলেপাক স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর পবিত্র তাঁবুমধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, তিনি চাটাইয়ের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছেন। চাটাইটি ছিলো খেজুরের ছাল দিয়ে নির্মিত। তাঁর পার্শ্বদেশে ছিলো চাটাইয়ের দাগ। আমি হজরত আবু আমেরের ঘটনা এবং তাঁর আবেদন রসুলেপাক স. এর খেদমতে বর্ণনা করলাম। তিনি স. ওযুর জন্য পানি চাইলেন। পানি আনা হলো। তিনি স. ওযু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর দু'হাত তুলে দোয়া করলেন। দোয়ার সময় হস্তদ্বয় এতো উঁচু করলেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ পেলো। তিনি স. বললেন, ''আল্লাহুম্মা ইয়াগফির লিআবী আমির ওয়াজআলহু মিন আ'লা উম্মাতি ফিল জান্নাতি''(হে আল্লাহ! তুমি আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও এবং বেহেশতে তাকে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোন্নত বানিয়ে দাও)। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, আমি বললাম, দয়া করে আমার মাগফেরাতের জন্যও দোয়া করুন। রসুলে করীম স. বললেন, 'আল্লাহুম্মাগফির লিআবদিল্লাহ্ ইবনে কায়েস ওয়া আদখালাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি মুদখালান কারীমা' (হে আল্লাহ্! তুমি আব্দুল্লাহ্ (আবু মুসা আশআরীর নাম) ইবনে কায়সকে (কায়স তাঁর পিতার নাম) ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত স্থানে রেখো)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোয়া করার পূর্বে ওযু করা ও নফল নামাজ পড়া মোস্তাহাব। তাছাড়া হাদিসটি আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয় যে, কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির উপস্থিতিকে উত্তম ও মূল্যবান মনে করা উচিত এবং এ সুযোগে তাঁর কাছে মাগফেরাতের জন্য দোয়ার দরখাস্ত করা উচিত।

রসুলেপাক স. হুকুম দিলেন, হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমত যেনো জিইররানা নামক স্থানে জমা করা হয় এবং তা যেনো খুব দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যুদ্ধের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হলে ওই গনিমত বণ্টন করা হবে। জিইররানা আওতাসের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। স্থানটি হুনাইন ও মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। যুদ্ধশেষে রসুলেপাক স. সেখানে পৌঁছে গনিমতের মাল বণ্টন শুরু করলেন এবং পনেরো ষোল দিন সেখানে অবস্থান করলেন। জিইররানা ছিলো এক নারীর নাম। তার নামানুসারেই পরে ওই স্থানটি আখ্যায়িত হয়। সেখান থেকে এক রাতে রসুলেপাক স. মক্কায় এসে ওমরা করলেন। তিনি ঘোষণাকারীকে এমতো ঘোষণা প্রচার করতে বললেন— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো গনিমতের মালের মধ্যে কোনোরূপ খেয়ানত না করে। ঘোষণা শুনে যার কাছে যা কিছু ছিলো, তাঁরা তার সবই রসুল স. এর সামনে হাজির করলেন। আকীল ইবনে আবু তালেব গনিমতের মাল থেকে একটি সুঁই নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। তিনি তা দিয়ে তাঁর কাপড় সেলাই করতেন। তিনিও তাঁর স্ত্রীকে প্রদত্ত সুঁইটি নিয়ে গনিমতের মালের মধ্যে জমা

দিলেন। হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল ছিলো অনেক। এতো মাল অন্য কোনো যুদ্ধে মুসলমানগণ হস্তগত করতে পারেননি। বাঁদীদের বিষয়ে হুকুম করলেন, যে বাঁদী গর্ভবতী, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা যাবে না। আর যে বাঁদী সন্তানসম্ভবা নয় তার সাথেও এক হায়েয না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, বন্দিনীদের একজনের নাম ছিলো সীমা বিনতে হারেছ ইবনে আব্দুল উয্যা। কোনো এক সাহাবীর কাছে সে বললো, আমি তোমাদের মনিব অর্থাৎ রসুলেপাক স. এর দুধবোন। একথা শুনে লোকেরা তাকে রসুলেপাক স. এর কাছে নিয়ে গেলো। সীমা বললো, মোহাম্মদ! আমি তোমার দুধবোন সীমা। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি কি তার কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে? সে কিছু কিছু ঘটনা রসুলেপাক স. এর নিকট বর্ণনা করলো। তিনি তা স্বীকার করলেন। নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তার উপর তাকে বসতে দিলেন। রসুলেপাক স. এর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ ভিজে গেলো চোখের পানিতে। দুধমাতা হজরত হালীমা ও তাঁর গোত্রজনতার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। সীমা বললেন, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমার সাথে থাকতে পারো। মর্যাদার সাথেই রাখা হবে তোমাকে। আর যদি আপন পরিবারে ফিরে যেতে চাও, তাহলে সসম্মানে উপঢৌকনের সাথে তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে একটি বাঁদী, তিনটি গোলাম ও কিছু বকরী হাদিয়া দিয়ে বিদায় দিলেন। তিনি ইমানের অলংকারে অলংকৃত হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কোনো কোনো কিতাবে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সীমা জিইররানার ওই জায়গায় এসেছিলেন, যেখানে গনিমতের মাল বণ্টন করা হচ্ছিলো। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি তার পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হুনাইনের বন্দিনীদের একজন। দু'ধরনের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, সীমা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখা করার জন্য হুনাইনে গিয়েছিলেন। তারপর বিদায় হওয়ার আবেদন করলে রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, আপন কাওমে ফিরে যেতে চাইলে জিইররানায় যেয়ে অপেক্ষা করো। আমি তায়েফ থেকে ফিরে জিইররানায় আসবো। তখন আমি তোমাকে কিছু হাদিয়া দিবো। অতঃপর রসুলেপাক স. যখন জিইররানায় পৌঁছলেন, তখন সীমা ও তাঁর কাওমের জন্য অনেক পশু ও অন্যান্য মালপত্র দান করলেন। যে বর্ণনাকারী তাঁকে জিইরারানায় দেখেছেন, তিনি সে রকমই বর্ণনা করেছেন। আর যিনি হুনাইনে দেখেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর মতো করেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তায়েফ দুর্গ বিজয়

মালেক ইবনে আওফ ছাকীফও হাওয়াযেন কবীলার মুশরিকদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে হুনাইন থেকে পলায়ন করে তায়েফে চলে গিয়েছিলো। সেখানে তায়েফের দুর্গে পূর্ব থেকেই সে আশ্রয় চেয়ে রেখেছিলো। হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার এক বৎসর পূর্বে দুর্গকে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিলো। তারা হুনাইন থেকে পলায়ন করে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলো। ফটকসমূহ বন্ধ করে দিলো। প্রধান ফটকে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করলো। এখানেও তারা যুদ্ধ করবে বলে দৃঢ় সংকল্প করলো। তায়েফ একটি বড় শহর, যা মক্কা থেকে দুই বা তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। আরাফাতের পথ ধরে বা ওয়াদীয়ে নুমান (একটি পাহাড়ের নাম) থেকে তায়েফে গেলে এক রাতের পথ অতিক্রম করতে হয়। তায়েফে আনার, আঙ্গুর প্রভৃতি বিভিন্ন ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আজমের লোকেরা এ স্থানকে বলে হেজাজ। এখানকার ফলমূল খুব উন্নতমানের। আবহাওয়াও মনোমুগ্ধকর। হেজাজ ছিলো ওই অঞ্চলের রাজধানী। আর তায়েফ তার অন্তর্গত একটি শহর। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় ওই বাগিচাটি, যা আসহাবে মরিয়মের হস্তগত ছিলো এবং যার বর্ণনা সুরা 'নুন ওয়াল কালাম' এর মধ্যে প্রদান করা হয়েছে, হজরত জিবরাইল আ. ওই বাগিচাটিকে মাটি থেকে উপড়ে এনে খানায়ে কাবা তওয়াফ করিয়েছিলেন এবং পরে তাকে পূর্ব স্থানে স্থাপন করেছিলেন। তখন থেকে এর নামকরণ হয় তায়েফ। বাগিচাটি ইতোপূর্বে ছিলো সানআর পাশে, পরে যে স্থানে বাগিচাটিকে স্থাপন করা হয়, সেই স্থানের নাম ছিলো দজ। কোনো কোনো বর্ণনানুসারে তাকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা মদীনা তাইয়্যেবা এবং তায়েফকে হেরেম বলে থাকে। হানাফী মাযহাবও তাই মনে করে।

রসুলেপাক স. তায়েফের দুর্গ জয় করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে অগ্রবর্তী দল হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। যাত্রাপথে পড়লো লিয়ানা নামক একটি জায়গা। সেখানে মালেক ইবনে আউফ নাদরীর একটি মহল ছিলো। সেনাপতি হুকুম করলেন, মহলটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। শিরিকের চিহ্ন ধূলিসাৎ করে দাও। অবশ্যই এই মহলের অভ্যন্তরে মূর্তি রয়েছে। রসুলেপাক স. তায়েফের দিকে যাত্রা করার পূর্বে হজরত তুফায়েল ইবনে আমর দাউসীকে যুল কাফফাইন মন্দির ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। ওই মন্দিরে ছিলো একটি কাঠের মূর্তি। তিনি তাঁর কাওমের লোকদের সাহায্য নিয়ে ওই মন্দির ধ্বংস করে তায়েফে গিয়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তুফায়েল ইবনে আমর দাউসীর একটি কবিতায় সেখানকার মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—

ইয়া যালকাফফাইন লাসতু মিন ইবাদিকা
মিলাদুনা আকদামু মিন মিলাদুকা
ইন্নি খশীতুন নারা ফুওয়াদাকা

(অর্থঃ হে যুলকাফফাইন প্রতিমা! আমি তোমার অর্চনাকারী নই, আমাদের জন্ম তোমার জন্ম থেকে অগ্রগণ্য। কেননা মুশরিকরা তোমাকে কাঠ চিড়ে প্রস্তুত করেছে। আর আমাদেরকে পয়দা করেছেন আল্লাহ্তায়ালা। আমি তোমার কলিজার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি)। হজরত তুফায়েল রা. ওই প্রতিমা ধ্বংস করার চারদিন পর তায়েফে পৌঁছেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলো তার কাওমের কতিপয় সমমনা লোক। তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দুর্গ জয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী।

ইসলামীবাহিনী তায়েফের দুর্গের পাদদেশে এসে যখন অবস্থান গ্রহণ করলো তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দুর্গের চূড়া থেকে তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিলো। তীরের আঘাতে আহত হলেন মুসলিমবাহিনীর অনেকেই। কেউ কেউ শাহাদতবরণ করলেন। হাওয়াযেন কবীলার লোক তীরন্দাজীতে খুব পারদর্শী ছিলো। পরিস্থিতি দৃষ্টে নির্দেশ জারী করা হলো, মুসলিমবাহিনীকে স্থান ত্যাগ করে উঁচু স্থানটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে (যেখানে বর্তমানে তায়েফের মসজিদ অবস্থিত)। এই অভিযানে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা যয়নব রা. এবং সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রা.। তাঁদের জন্য কুটির নির্মাণ করা হলো। সাহাবীগণকে হুকুম দেওয়া হলো, এখানকার সকল ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলো। এরকম করলে কাফেরদের অপমান ও লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পাবে। প্রচুর ফলের বাগান ছিলো সেখানে। বাগানের মালিকরা প্রত্যক্ষ করলো একে একে সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তারা বিনীত প্রার্থনা জানালো, আল্লাহ্রওয়াস্তে আমাদের উপর দয়া করুন এবং বৃক্ষনিধন থেকে বিরত থাকুন। রসুলেপাক স. বললেন, 'ইন্নি আদউহাল্লাহা ওয়া রহম' (আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে এবং দয়া প্রদর্শনার্থে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করলাম)। ওই দুর্গ অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলো পনেরো দিন। এক বর্ণনায় আছে, আঠারো দিন। আর এক বর্ণনায় আছে, চল্লিশ দিন। সেখানে ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধেই প্রথম কামান ব্যবহার করা হয়েছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া তুফায়েল ইবনে আমর দাউসী যুল কাফফাইন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোও কাজে লাগানো হয়েছিলো। এই যুদ্ধে অনেক কাফের নিহত হয়েছিলো। সাহাবীগণের মধ্য থেকে অনেকে আহত হয়েছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন বারোজন। তন্মধ্যে চারজন আনসার, সাতজন কুরাইশী এবং একজন লাইছ কবীলার লোক ছিলেন। শহীদগণের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর। কেউ কেউ বলেন,

আবুল মেহজান ছাকাফী তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিলো। ওই তীরের জখম অবশ্য ভালো হয়ে গিয়েছিলো। পরে আহত স্থানে পচন দেখা দেয়। পরবর্তীতে এই জখমের কারণেই রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সাইয়্যেদা উম্মে সালামার ভাই হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াও ছিলেন সেখানকার দ্বাদশ শহীদের একজন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে হাফেজ বদরুদ্দীন ইরাকীর 'শরহে তাকরীব' কিতাব থেকে সংকলিত হয়েছে, ওই যুদ্ধে আবু সুফিয়ান সখর ইবনে হারবের একটি চোখ উপড়ে গিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে ইবনে সাআদ বর্ণনা করেছেন, বেরিয়ে আসা চোখ নিজে থেকে চেপে ধরে তিনি নবী করীম স. এর নিকট এলেন। রসুলেপাক স. বললেন, কোনটা চাও? ওই চক্ষু, যা তুমি বেহেশতের মধ্যে পাবে? নাকি এই চক্ষু, যা আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে ফিরিয়ে দিবেন? তিনি বললেন, বেহেশতে যে চক্ষু আমি পাবো, তাই আমার কাছে প্রিয়। একথা বলে তিনি চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। চোখের উপরে দেওয়া পট্টি তুলে ফেলে দিলেন। জানা যায়, তাঁর অপর চক্ষুটিও হজরত ফারুক আজমের খেলাফতকালে নষ্ট হয়ে যায়।

অবরোধকালে রসুলেপাক স. ঘোষকের মাধ্যমে এলান করিয়ে দিলেন, কোনো ক্রীতদাস যদি দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর প্রায় বিশজন ক্রীতদাস কোনো না কোনো বাহানা করে আহলে তায়েফের কাছ থেকে চলে এসেছিলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নুফা' ইবনুল হারেছ, যার মনীব ছিলো বকরা নামক এক ব্যক্তি। তখন তিনি আবু বকরা নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং একজন উত্তম সাহাবী হয়ে যান। ঘোষণা মোতাবেক সকল গোলামকেই আজাদ করে দেওয়া হয়েছিলো। তাদের গোলামীকে আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগীর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলো। তাদেরকে কোনো না কোনো সাহাবীর হাওলা করে দেওয়া হয়েছিলো এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনাদি পূরণে সচেষ্ট থাকবেন। পরে তায়েফবাসীরা যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো, তখন তারা দাবী জানালো, আমাদের গোলামদেরকে আমাদের কাছে ফেরত দেওয়া হোক। রসুলেপাক স. বললেন, তারা আল্লাহ্র আজাদকৃত গোলাম। এখন তারা আর তোমাদের গোলামীতে নেই। আবু বকরার বংশধারা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়— নুফায় ইবনুল হারেছ ইবনে কালদাহ ছাকাফী। কেউ কেউ বলেছেন, নাকী ইবনে মাবরুহ ইবনে কানদাহ। তারা আরও বলেছেন, তিনি হারেছ ইবনে কালদাহ অথবা মাসরুহ ইবনে কালদাহ'র গোলাম ছিলেন, যাঁকে সে পালকপুত্র বানিয়ে রেখেছিলো।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, তায়েফের অবরোধকালে রসুলেপাক স. হজরত আলীর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আশপাশের অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ো। নির্দেশ পেয়ে তাঁরা আশপাশের লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়লেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তাঁরা হাওয়াযেন ও ছাকীফ কবীলার মূর্তিসমূহ ভেঙে দিলেন এবং মুশরিকদের ঘরবাড়ি ও কীর্তিসমূহ বরবাদ করে দিলেন। কাজ শেষে তারা রসুলেপাক স.এর কাছে ফিরে এলেন। রসুলেপাক স. এর নেকদৃষ্টি যখন হজরত আলীর উপর পড়লো, তিনি স. প্রসন্নচিত্তে 'আল্লাহু আকবার' বললেন, তারপর তার সঙ্গে একান্তে অনেক আলাপ করলেন। অনেক হিতোপদেশ প্রদান করলেন। নির্জন আলাপচারিতার সময় দীর্ঘায়িত হলো। হজরত জাবের বর্ণনা করেন, তখন সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, আশ্চর্য তো! রসূলুল্লাহ্ স. দেখি দূর-দূরান্তের গোপন কথা কেবল আপন চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গেই বলেন। অন্যদের কাছে তো বলেন না। একথা যখন তাঁর কানে গেলো তখন তিনি স. বললেন, 'মা আনজাইতুহু ওয়ালা কিন্নাল্লাহা আনজা' (আমি তার সাথে ভেদের কথা বলিনি; বরং আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন)। তাঁর একথার মর্মার্থ হচ্ছে, আমি ইচ্ছা করে তার সাথে গোপন কথা বলিনি, বরং আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করেছেন, তাই বলেছি।

অবরোধ যখন পনেরো ষোলো দিন অথবা বর্ণনান্তরে চল্লিশ দিন স্থায়ী হলো, তখন রসুলুল্লাহ্ স. সবাইকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, দুর্গ বিজয়ের জন্য তোমরা আর অপেক্ষা কোরো না। বরং এখান থেকে প্রস্থান করো। বিষয়টি সাহাবীগণের নিকট কঠিন মনে হলো। তাঁরা বলতে লাগলেন, কী আশ্চর্যের বিষয়! আমরা এখান থেকে চলে যাবো, অথচ দুর্গ বিজিত হবে না। এ কেমন কথা! রসুলুল্লাহ্ স. তাঁদেরকে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, তোমরা যদি চাও তাহলে যুদ্ধ করে দেখতে পারো, বিজয় হাসিল হয় কিনা। পরের দিন সাহাবীগণ যুদ্ধ করলেন। অনেক লোক আহত হলো। অবশেষে তাঁরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হলেন। রসুলেপাক স. বললেন, 'আন্না কাফিলূনা গাদান ইনশাআল্লাহুতায়ালা' (আগামীকাল আমরা প্রস্থান করবো ইনশাআল্লাহ্)। এমতো মন্তব্য শুনে সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন। সকলে যখন নিজ নিজ বাহনের উপর মালপত্র বোঝাই করতে লাগলেন, তখন রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ছাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি স. বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাদেরকে হেদায়েত দান করুন, তাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত করে আমার নিকটবর্তী করে দিন।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, অবরোধের সময় রসুলেপাক স. স্বপ্নে দেখলেন, দুধের একটি বড় পেয়ালা তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। তিনি তাতে চুমুক দেওয়ার পূর্বেই একটি মোরগ এসে পেয়ালাতে তার ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে পেয়ালাটি ফেলে দিলো। রসুলেপাক স. এ স্বপ্নটি জানালেন কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। কেননা তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ে ছিলেন পূর্ণ অভিজ্ঞ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ স্বপ্নের ইঙ্গিত এই যে, এ বৎসর দুর্গ বিজয় হবে না। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। আমারও তাই মনে হয়েছে। জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন, সাইয়্যেদে আলম স. তায়েফের বিষয়ে নওফেল ইবনে মুআবিয়া দায়লামীর সঙ্গে পরামর্শ করলে তিনি বললেন, এরা হচ্ছে খেঁকশিয়াল স্বভাবের লোক, যারা গর্তের ভিতর আশ্রয় নেয়। ধরতে গেলে ধরা যায় না। ছেড়ে দিলে কোনো আঘাত করা যায় না। হজরত ফারুকে আজম হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে জানতে পারলেন রসুলেপাক স. তায়েফ বিজয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শুনতে পেলাম আপনি নাকি তায়েফ বিজয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। ঠিকই শুনেছো। হজরত ওমর বললেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, প্রস্থান করার ঘোষণা দিই। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর কথায় সায় দিলেন। হজরত ওমর প্রস্থান করার ঘোষণা করে দিলেন। সকলে প্রস্থান করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে শায়েখ মহিউদ্দীন নববী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামের প্রতি দয়া ও বিনম্রতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট তাঁদের কাছে পৌঁছেছিলো, সে দিকে লক্ষ্য করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেছিলেন। কাফেররা তো তাদের দুর্গের ভিতরে নিরাপদে অবস্থান করছিলো। আর মুসলমানদেরকে আহত করে চলেছিলো। তাই এস্থান থেকে প্রস্থান করার ইচ্ছা করেছিলেন তিনি স.। রসুলেপাক স. একথা জানতেন এবং আশা করতেন কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা ছাড়াই পরবর্তীতে এই দুর্গ বিজিত হবে। কিন্তু সাহাবা কেরাম অবস্থান করতে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ছিলেন অতি উৎসাহী। তাঁদের মনোতুষ্টির দিকে লক্ষ্য করেই তিনি স. সেখানকার অবস্থান দীর্ঘায়িত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখা গেলো, সাহাবা কেরাম সীমাহীনভাবে আক্রান্ত ও জখম হয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা রসুলেপাক স.এর অভিপ্রায়ের কাছে নতি স্বীকার করলেন। তিনি স. এতে করে খুশি হলেন এবং মৃদু হাসলেন।

তায়েফ থেকে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামকে বললেন, তোমরা পাঠ করো— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ওয়া সদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আ'বদাহু ওয়া হাজামাল আহযাবা ওয়াহদাহু। যাত্রাকালে বললেন—

'আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূনা' এটি একটি দোয়া মাছুরা। সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত। এখন চিন্তা করা উচিত রসুলেপাক স. দুশমনদের সাথে জেহাদ করার পর বের হওয়ার সময়, যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত এবং সাহাবা কেরামকে জমায়েত করার সময় কিছু পাঠ করতেন কিনা। সবকিছু যখন সম্পন্ন হয়ে যেতো তখন কোনো একজন সাহাবীর কাছে তা অর্পণ করে নিজে মুক্ত হয়ে যেতেন এবং যাবতীয় কিছু আল্লাহ্তায়ালার কাছে সঁপে দিতেন 'আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূনা সদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু' বলে বস্তুর ক্ষমতাকে নফী করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করতেন। আর বাস্তবতাও তাই। কেননা মানুষ ও তার সকল কাজের স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা। সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই সবকিছুর তদবীর ও সাহায্য করে থাকেন। তাঁর যেভাবে ইচ্ছা হয় সেভাবেই সবকিছু জারী করেন। তাঁর মাখলুক থেকে যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই তিনি তাঁর অভিপ্রায়াধীন করেন। সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে প্রকাশিত হয় এবং সব বিষয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ছাড়াই কাফেরদেরকে হালাক করে দিতে পারেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়ালাও শাআল্লাহু লানতাসারা মিনকুম ওয়ালাকিল লিইয়াব্লুয়া বা'দাকুম বিবা'দিন' (আল্লাহ্তায়ালা চাইলে অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি একপক্ষকে অপরপক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন)। তিনি আরও বলেছেন— 'লিনাবলু ওয়ান্নাকুম হাত্তা না'লামাল জাহিদীনা মিনকুম ওয়াস্সবিরীনা ওয়া নাবলুয়া আহবারাকুম' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। এমনকি আমি জেনে নিবো তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী কে এবং ধৈর্যধারণকারী কে? এবং আমি পরীক্ষা করবো তোমাদের খবরসমূহ)। সুতরাং শরিয়তের আওতাভূত ব্যক্তির উপর কর্তব্য— সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের আনুগত্য করা। যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুতকালেও এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়গ্রহণ কালেও। রসুলেপাক স. এরকমই করতেন। প্রথমে তিনি রবুবিয়াতের মাকামের আদব এবং উম্মতের যাবতীয় বিধান সাপেক্ষে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতেন। তারপর হক তায়ালার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতেন এবং যাবতীয় বিষয় তাঁর দিকেই সোপর্দ করতেন। তারপর আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর পবিত্র হস্তে তাঁর উচ্চতর কুদরত ও অন্তর্নিহিত হেকমত থেকে যা চাইতেন, তার প্রকাশ ঘটাতেন, যা রসুলেপাক স. এর জন্য হতো সম্পদস্বরূপ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. তায়েফ থেকে যাত্রা করে জিইররানায় পৌঁছলেন। সেখানে গনিমতের মাল একত্রিত করা হয়েছিলো। গনিমতের মালের সংখ্যা ছিলো দু'হাজার বন্দী, বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের অধিক বকরী ও চার হাজার

আওকিয়া রৌপ্য। চল্লিশ দেরহামে এক আওকিয়া হয়। এক বর্ণনায় আছে, বকরীর সংখ্যা এতো অধিক ছিলো যে, তার পূর্ণ সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। সেখানে পৌঁছার পর রসুলেপাক স. সকল গনিমতের মাল মানুষের মধ্যে দান করলেন। বিশেষ করে মুআল্লাফাতুল কুলুবের ক্ষেত্রে দান করলেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের উপর দায়িত্ব দিলেন সবাইকে একত্র করার। তারপর বকরী ও উটসমূহ গণনা করে মানুষদের মধ্যে বণ্টন করলেন। প্রত্যেক পদাতিক সৈনিক পেলেন চারটি উট ও চল্লিশটি বকরী। আর অশ্বারোহী সৈনিকদের প্রত্যেককে দিলেন বারোটি উট ও একশ বিশটি বকরী। তদুপরি দিলেন একটি করে ঘোড়া। একটি ঘোড়ার বেশী কাউকেই দেননি।

জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন, সমস্ত মাল রসুলেপাক স. এর নিকট জমা হওয়ার পর আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আজ আপনি সকল কুরাইশদের চেয়ে অধিক ধনী। রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আমাকেও কিছু দিন। রসুলেপাক স. হজরত বেলালকে হুকুম দিলেন, তাঁকে চল্লিশ আউকিয়া রৌপ্য এবং একশ উট দিয়ে দাও। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পুত্র ইয়াযীদকেও কিছু অংশ দিন। এই ইয়াযীদ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর এক ইয়াযীদ ছিলো হজরত মুআবিয়ার পুত্র। হজরত মুআবিয়া রা. এর পুত্র ইয়াযীদের নাম রাখা হয়েছিলো এই ইয়াযীদের নামানুসারে। এই ইয়াযীদ ছিলেন মুআবিয়ার পুত্র, ইয়াযীদের চাচা। রসুলেপাক স. বললেন, তাকেও চল্লিশ আউকিয়া রৌপ্য ও একশ উট দিয়ে দাও। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার দ্বিতীয় পুত্র মুআবিয়াকেও অংশ দান করুন। তিনি স. বললেন, তাকেও চল্লিশ আউকিয়া রৌপ্য ও একশ উট দাও। তখন হজরত আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক, আপনি যুদ্ধকালেও মহানুভব। আর বিজয়কালে অধিকতর মহানুভব। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এমনিভাবে হাকীম ইবনে হাযামকেও একশ উট দান করলেন। যখন বুঝতে পারলেন, তিনি আরও বেশী পেতে চান, তখন বললেন, তাকে আরও একশ উট দিয়ে দাও। আর গোত্রপতিদের প্রত্যেককেও রসুলেপাক স. পঞ্চাশটি করে উট দান করলেন। তাঁদের নাম— সাহল ইবনে আমর, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, হুওয়াইতেব ইবনে আব্দুল উয্যা, উসায়দ ইবনে হারেছা ছাকাফী, আবু জাহেলের ভাই হারেছ ইবনে হাস্তাম, কায়েস ইবনে আদী এবং আকরা ইবনে হারেছ তামীমী। আরও যাঁদেরকে দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলা ইবনে জারিয়া ছাকাফী, মাখরামা ইবনে নওফল, সাঈদ ইবনে ইয়ারবু, ওছমান ইবনে নওফল, হেশাম ইবনে আমর আমেরী প্রমুখ সাহাবীবৃন্দ। এসব গনিমতের মাল সাহবীগণকে তিনি স. সাকুল্য মাল থেকে দিয়েছিলেন, না কি দিয়েছিলেন 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) থেকে তা নিয়ে মতভেদ আছে। এক দল মনে করেন, ওগুলো

এক পঞ্চমাংশ থেকে দেওয়া হয়েছিলো। আবার আর এক দল মনে করেন, দেওয়া হয়েছিলো সাকুল্যমাল থেকে। শেষোক্ত অভিমতটিই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। সার কথা হচ্ছে, রসুলেপাক স. সমস্ত মাল ও নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য সবকিছুই ইসলামের সৈনিকদল ও মক্কাবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে খুশি করেছিলেন। তখন পর্যন্ত যারা ইমান আনেনি, এসব মাল পাওয়ার পর তারা ইমান গ্রহণ করলো। কিছু কিছু লোক যারা দুর্বল ইমানের অধিকারী ছিলো এর ফলে তাদের ইমানও মজবুত হয়ে গিয়েছিলো।

জীবনীগ্রন্থরচয়িতাগণ বলেছেন, ওই সময় রসুলেপাক স. কোনো এক ঘাঁটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। হজরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঘাঁটিটি বকরী ও অন্যান্য পশুতে ভরপুর ছিলো। হজরত সফওয়ান ঘুরে ঘুরে তা দেখছিলেন এবং প্রীত হচ্ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি তোমার ভালো লেগেছে? তিনি বললেন, হাঁ। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, যাও আমি সব তোমাকে দিয়ে দিলাম। সফওয়ান সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হস্তগত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র নবী ছাড়া অন্য কেউই দানশীলতার দিক দিয়ে এতো অগ্রগামী হতে পারে না। এরপর তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। অথচ আরবের অনেক নাদান মূর্খ ও অত্যাচারীর দ্বারা রসুলেপাক স. অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রসুলেপাক স. বলেছেন— 'রহিমাল্লাহু মূসা উযিয়া বিআকসারা মিন হাযা ফাসবরুন' (আল্লাহ্তায়ালা নবী মুসার উপর দয়া করেছেন, তাকে আমার চেয়েও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন)।

উয়ায়না ইবনে হিসন এবং আকরা ইবনে হাবেছকে একশ' উট দেওয়া হলো। আব্বাস ইবনে মরওয়াসকে দেওয়া হলো একশ'টির কম। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে এই কবিতা পাঠ করলেন— হিসন ও হাবেছ সমাজে মরওয়াসের উপর প্রাধান্য লাভকারী হতে পারেন না। মোট কথা আব্বাস ইবনে মরওয়াস তাঁর পিতার জন্য হিসন এবং হাবেছের উপর গৌরব করতেন। তিনি ছিলেন উয়ায়না এবং আকরার পিতা। এই কবিতাংশ যখন রসুলেপাক স. এর কানে পৌঁছলো, তখন তিনি স. বললেন, 'ইকতাউ আন্নী লিছানাহু' (আমার পক্ষ থেকে তার জবানকে বন্ধ করো)। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁকে উটের আস্তাবলে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তাঁকে একশ' উট দিয়ে দিলেন। তা পেয়ে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে বদনামমূলক কবিতা পড়েছো? তিনি কৈফিয়ত পেশ করে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক, আমি আমার জিহ্বার মধ্যে এমন অনুভব করেছি, যেনো পিপীলিকা আমার জিহ্বাতে হাঁটা হাঁটি করছে। তাই

নিরুপায় হয়ে আমি কবিতা পাঠ করেছিলাম। রসুলেপাক স. মৃদু হেসে বললেন, উটনী যেমন তার বাচ্চাকে ছাড়তে পারে না, আরবরা তেমনি কবিতা বলা ছাড়তে পারে না।

কোন কোন জীবনচরিত গ্রন্থে এসেছে, রসুলেপাক স. যখন এই কবিতাংশ শুনলেন তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, এ কবিতায় ছন্দপতন ঘটেছে। হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'বাইনাল আইনাইহি ওয়াল আকরা' হওয়া উচিত। রসুলেপাক স. বললেন, এভাবেই বলা হোক অথবা ওভাবেই বলা হোক, উভয়েরই ভাবার্থ এক। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি কবি নন এবং কাব্য রচনা আপনার জন্য সমীচীনও নয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য সমীচীনও নয়। কেউ কেউ বলেছেন, ছন্দের তালে কবিতা আবৃত্তি করা রসুলেপাক স. এর জন্য সহজ ছিলো ন। ছন্দ ও ছন্দপতন এ সবের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করাও তাঁর জন্য ছিলো না শোভনীয়। সুবহানাল্লাহ্‌!

যা হোক রসুলেপাক স. প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিকেই দান করে তাদেরকে খুশি করলেন এবং তাদের যাহের ও বাতেনকে আবাদ করলেন। বিশেষ করে মক্কাবাসী যারা মুআল্লাফাতুল কুলুব ছিলো, তাদেরকে সীমাতিরিক্ত দান করলেন। আর ওই সকল আনসার, যাঁরা রসুলেপাক স. এর দরবারে ছিলেন বিশুদ্ধ উপবেশনকারী, তাঁদেরকে দানের আওতা থেকে বাইরে রাখলেন। মক্কাবাসীদের মতো তাঁদেরকে অধিক দান করলেন না। জীবনীগ্রন্থরচয়িতাগণ বলেন, এর ফলে আনসারগণের মনে কিছুটা অভিমান সৃষ্টি হলো। তাঁরা মনে মনে ভাবলেন, যে সকল কুরাইশদের মধ্যে নেফাকের গন্ধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে খাঁটি নয়, তাছাড়া অন্যান্য গোত্র, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাদের কোনো অবদানই নেই, তাদেরকে দানে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। অথচ আমাদেরকে করা হলো বঞ্চিত। কাফেরদের রক্ত আমাদের তরবারী থেকে এখনও শুকিয়ে যায়নি। আনসারদের এ ধরনের কথাবার্তা যখন রসুলেপাক স. এর কানে পৌঁছলো, তখন তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনালেন। যে তাঁবুতে তিনি অবস্থান করছিলেন, সেখানে তাঁদেরকে বসতে দিলেন। আনসারগণ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। রসুলেপাক স. বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! এ কেমন কথা আমি তোমাদের পক্ষ থেকে শুনতে পাচ্ছি? তোমরা কি এমন কথা বলোনি? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ এমন কথা বলেননি। অবশ্য আমাদের নওজোয়ানদের দায়-দায়িত্ব আমরা নিতে পারিনি। সম্ভবতঃ তাদের মুখ থেকে এরকম কথা বেরিয়ে এসেছে। রসুলেপাক স. বললেন, যদি তোমরা বুঝে থাকো তো ভালো। আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট কাফের হিসেবে পাইনি? অতঃপর

আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। ইমানের সম্পদ দানে ধন্য করেছেন। ইমান হচ্ছে এমন এক সম্পদ, যা এ সব দান দক্ষিণার চেয়ে অধিক মহান ও মর্যাদাপূর্ণ। ইতোপূর্বে কি তোমরা একে অপরের প্রতি দুশমনি পোষণ করতে না? অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের পরস্পরের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাস্তব অবস্থা ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা পরস্পরে সীমাহীন ঝগড়া ও রক্তপাতে লিপ্ত ছিলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ তো লেগেই ছিলো। এমনকি তাদের মধ্যে একশ' বিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ জারী ছিলো। যেমন আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কালামে উল্লেখ করেছেন, 'ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আ'লাইকুম ইজ কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলূবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানাওঁ ওয়া কুনতুম আলা শিফা হুফরাতিম মিনান্নারি ফাআনকাজাকুম মিনহা' (তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর! তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন)(৩ঃ১০৩)। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে আরও বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের গনিমতের মাধ্যমে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। মদীনায় আমার অবস্থানের বদৌলতে তোমাদের মাল ও আওলাদের মধ্যে বরকত দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন— 'ওয়া আছাবাহুম ফাতহান কারীবাওঁ ওয়া মাগানিমা কাছীরাতাইঁ ইয়া'খুজূনাহা ওয়া কানাল্লাহু আ'যীযান হাকীমা ওয়াদাকুমুল্লাহু মাগানিমা কাছীরাতান' (এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যাহা উহারা হস্তগত করিবে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)(৪৮ঃ১৮,১৯)। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে অনেক গনিমত দানের অঙ্গীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক আয়াতে কারীমা রয়েছে। যে সকল নেয়ামত আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর মাধ্যমে আনসারদেরকে দান করেছেন, তিনি তাদেরকে সেগুলো একে একে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আনসারগণ সবকিছু চুপচাপ শুনে গেলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা কথার উত্তর দিচ্ছো না কেনো? আনসারগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক, আমরা কী জবাব দিবো? আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রসুলের এহসান আমাদের উপর সীমাহীন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা যদি চাও, এরকম বলতে পারো এবং এরূপ বললে তোমাদের কথা মিথ্যা হবে না। তোমরা তো বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমতাবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনার কাওম আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। আমরাই আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। কেউ আপনার

প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না এবং আপনাকে কোনোরূপ সাহায্য করতো না। আমরাই আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি। আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আমরাই আপনাকে আমাদের গৃহসমূহে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার কোনো সহায় সম্বল ছিলো না। আমরা প্রীতি-ভালোবাসা ও বীরত্বের সাথে খেদমত করেছি। আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আমরা আপনাকে চিন্তামুক্ত করেছি। তাঁরা যখন সকল কথা রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে বিনয় ও শোকর গোজারী স্বরূপ শুনলেন, তখন বললেন, না না বরং আমরা বলি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অপার অনুগ্রহ আমরা পেয়েছি। হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সম্মানিত উপস্থিতি যদি আমাদের মধ্যে না ঘটতো তাহলে আমাদের ও অন্যদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য হতো না। আপনার মহান সান্নিধ্যের বদৌলতেই আমরা সম্মানিত হয়েছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ইনশাআল্লাহ্ ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হবো। আমরা কী? সবই আপনার বদৌলতে ও আপনার তোফায়েলে। আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর পূর্ণ পরিতুষ্ট। আমরা আপনার করুণাদৃষ্টির মুখাপেক্ষী এবং আপনার আনুগত্যের প্রত্যাশী। দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রত্যাশী আমরা নই। প্রবীণ আনসারগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁরা রসুলেপাক স. এর পবিত্র হস্তদ্বয় ও জানু মোবারককে চুম্বন করলেন। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এবং কুরাইশদেরকে দুনিয়াবী ধনসম্পদ দেওয়ার কারণ বর্ণনাকল্পে বললেন, কুরাইশরা জাহেলিয়াতের খুব কাছাকাছি সময়ে অবস্থান করছে। তারা অনেক মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছে। আমি চেয়েছি এ সমস্ত দান-দক্ষিণা দ্বারা তাদের মুসিবতসমূহের ক্ষতিপূরণ হোক। আমি চেয়েছি এর দ্বারা তারা ইমান ও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হোক। রসুলেপাক স. আরও বললেন, আসহাবে সুফ্ফার ফকীর সাহাবী জাঈল ইবনে সুরাকা যমরী আমাদের অনেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলো, অথচ তাকেও আমি কিছু দান করিনি। অথচ উয়ায়না ও আকরাকে একশ একশ করে উট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জাঈলকে কিছুই দেইনি। কারণ জাঈলের ইমান-এখলাসের উপর আমার ভরসা আছে। তিনি আরও বললেন, হে আনসার গোত্র! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা উট ও বকরীসমূহ নিয়ে আপন আপন ঘরে ফিরবে, আর তোমরা ফিরবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে নিয়ে। আল্লাহ্র শপথ! যে মর্যাদা নিয়ে তোমরা ঘরে ফিরছো, তা তাদের চেয়ে উত্তম, যারা উট-বকরী নিয়ে ঘরে ফিরছে। হে আনসারগণ! অতুষ্ট হয়ো না। আমি মাল দিয়েছি মুআল্লাফাতুল কুলুবদেরকে। তোমাদেরকে আমি তাদের মধ্যে গণ্য করি না। তোমাদের কামালে এখলাসের উপর আমি পূর্ণ আস্থা রাখি। লোকেরা যদি অন্য কোনো উপত্যকা ও ঘাঁটিতে চলে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা ও ঘাঁটিতে চলবো। অন্যরা বাহ্যিক পোশাক পরিধান করেছে। আর আনসারগণ পরিধান করেছে অভ্যন্তরীণ পোশাক, যা সত্তাসম্পৃক্ত। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন,

আনসারগণ হচ্ছে আমার কারশ এবং আয়বত। কারশ মানে শিশু সন্তান। আর আয়বত হচ্ছে চামড়ার ব্যাগ, ছোটো সিন্দুক বা ছোটো থলে। সিন্দুক বা থলের মধ্যে যে রকম মূল্যবান বস্ত্ররাখা হয়, তেমনি আনসারগণ তাঁদের অন্তরের মধ্যে ভেদ ও নূরসমূহ হেফাজত করেছে। রসুলেপাক স. আরও বললেন, হে আনসারগণ! জীবিত ও লোকান্তরিত সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো। এরপর তিনি তাঁদেরকে এক প্রকারের পার্থিব সুসংবাদও দিলেন। বললেন, আমি চাই এ মর্মে একটি দস্তাবিজ লিখে দিতে যে, আমার পর বাহরাইন খাস করে তোমাদের জন্য হবে। যা অতি উত্তম একটি জায়গা। যা বিজয় করা থেকে আমাকে সুরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। এসব কথা শুনে আনসারগণ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনাকে পাওয়ার পর আমাদের আর এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। পার্থিব ধন-সম্পদের অভিলাষীও আমরা নই। সেই দিন না আসুক, যেদিন আপনার ছায়া আমাদের মাথার উপর থেকে হারিয়ে যাবে। রসুলেপাক স. বললেন, জীবন দেওয়া এবং এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার পরে তোমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে। তোমাদের সবর ও তাকওয়া গ্রহণ করা উচিত, যাতে করে তোমরা কোনোরূপ অনুতাপ ও অমঙ্গল ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে মিলিত হতে পারো। আমাকে এমতো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে হাউযে কাউছারের নিকটে, যে হাউযে কাউছারের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সানআ এবং আম্মান রাজ্যের সমান। যার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকারাজির চেয়েও অধিক। আনসারগণ আল্লাহ্‌তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। আল্লাহ্‌র রসুল তাদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। রসুলেপাক স. এর খাস তাওয়াজ্জুহ লাভ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

রসুলেপাক স. জিইররানা নামক স্থানে যখন বন্দী ও অন্যান্য মাল বণ্টন করে শেষ করলেন, তখন হাওয়াযেন কবীলার একদল লোক রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তারা তাদের কাওমের অন্যান্য লোকদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়েও খবর পৌঁছালো। তাদের মধ্যে আবু বুরকান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হালীমা সাদীয়া রা. এর দিক দিয়ে রসুলেপাক স. এর দুধ চাচা। আর একজন ছিলো যুবায়ের ইবনে সারবাহী। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের উপর যে বালা-মসিবত পতিত হয়েছে, তা আপনার অজানা নয়। এখন আপনি আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে দয়া ও মেহেরবানী করেছেন। আমরা আপনার কাছে আশা করবো যে, আপনি আমাদের বন্দী ও মালপত্র ফিরিয়ে দিবেন। কেননা এ সকল মালপত্র ও বন্দীদের মধ্যে রয়েছেন আপনার দুধ সম্পর্কীয় ফুফু, খালা এবং তাদের নিকটাত্মীয়গণ। আপনার শৈশবে দুধ পান করার কালে তারা আপনার দেখাশোনা

ও খেদমত করেছে। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তো গনিমতের মাল বণ্টন করে ফেলেছি। আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, তোমরা আসবে এবং এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু তোমরা অনেক দেরী করে ফেলেছো। তোমরা সঠিক সময়ে আসোনি। এখন আমি কী করতে পারি? আমার সঙ্গে বিশাল জনতা রয়েছে। তাতো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো। সত্য কথা বলা হোক, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এখন সকল বন্দী ও মাল ফিরিয়ে আনা তো কঠিন। তবে তোমরা বন্দী বা মাল থেকে যে কোনো একটি বাছাই করে নাও। দু'টি এক সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তারা বললো, পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে উট বকরী বা নগদ অর্থ দিয়ে আমরা কি করবো? সুতরাং আমরা বন্দীদেরকেই বেছে নিলাম। তখন রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে বনী হাশেমের ভাগে যা পড়েছে আমি তা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবো। তোমাদের খাতিরে আমি অন্যদেরকেও বলবো, তারা যেনো তাদের অংশ থেকে তাদের দাবী উঠিয়ে নেয়। আর তা হতে হবে এভাবে— জোহরের নামাজের সময় যখন হয়ে যাবে, তখন তোমরা সকলেই এসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং আমাকে মুসলমানদের জন্য সুপারিশকারী বানাবে। তোমরা এরকম বলবে যে, আমাদের বাচ্চা ও নারীদেরকে ফিরিয়ে দিন। তারপর আমি তোমাদের জন্য মুসলমানদের কাছে সুপারিশ করবো। হাওয়াযেন কবীলার লোকেরা রসুলেপাক স. এর নির্দেশ মতো কাজ করলো। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি পাঠ করার পর বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের ভাই হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে তারা আবদার নিয়ে এসেছে এবং তাদের সঙ্গে আমার এরকম কথা হয়েছে যে, তাদের বন্দীদেরকে তোমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়টি এখন তোমাদের মর্জির উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা যদি মনের খুশিতে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও, তবে দিতে পারো। তোমাদের উপর কোনরূপ জবরদস্তি নেই। এর পরিবর্তে সর্বপ্রথম যে খুমুস (গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ) হাসিল হবে, তা আমি তোমাদেরকে দান করবো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা সকলেই আপনার সুপারিশ মেনে নিলাম। এর বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা করি না। মুহাজিরগণ দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের অংশে যা আছে, তা সবই আমরা আপনার সামনে হাজির করে দিচ্ছি। আনসারগণও তাই করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাদের রাজী-অরাজী বুঝি না। তোমরা যাও এবং তোমাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা এসে এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করবে। সকলে স্থান ত্যাগ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের নেতৃস্থানীয়দেরকে ডেকে

নিয়ে এলেন। তাঁরা এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরা সকলেই রাজী আছে এবং সানন্দে তারা আপনার সুপারিশ কবুল করে নিচ্ছে।

এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তাঁর অংশ বনী হাশেম এবং অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণ আপন আপন অংশের দাবী উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু বনী তামীমের সরদার আকরা ইবনে হাবেস তামীমি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, আমি আমার এবং বনী তামীমের অংশ ছেড়ে দিতে রাজী নই। উয়ায়না ইবনে হাসীন ফারাযী বলতে লাগলো, আমি ও আমার কাওম এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নই। আব্বাস ইবনে মারদাস বললো, আমি এবং বনী সুলায়মও সন্তুষ্ট নই। কিন্তু বনী সুলায়ম তাৎক্ষণিকভাবে তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বললো, যা কিছু আমাদের কাছে আছে এ সবই রসূলুল্লাহ্‌র। রসুলেপাক স.ই একমাত্র মালিক। তিনি যাকে চান তাকেই এগুলো দান করতে পারেন। রসুলেপাক স. বললেন, যারা রাজী নয়, তারা আপন আপন বন্দীদেরকে ফিরিয়ে দিবে। আমি প্রত্যেক বন্দীর বিনিময়ে পরবর্তীতে যে গনিমত পাবো, তা থেকে দু'টি করে উট দান করবো। ওই লোকগুলো ছিলো কর্কশভাষী। কঠিন হৃদয়ের অধিকারী। মুআল্লাফাতুলকুলুব শ্রেণীর। তাদের অন্তর থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার ও কঠোরতা তখন পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি। তখন পর্যন্ত ভদ্রতা ও অভিজাত স্বভাব আগমন করেনি। বিশেষ করে উয়ায়না ইবনে হাসীন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলো। হাদিস শরীফে এরকমই বর্ণনা এসেছে। রসুলেপাক স. এর উক্ত সমাধানের পর তারাও ইসলামের সুন্দর গুণাবলীতে ভূষিত হলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যা হোক, লোকেরা যখন দেখলো যে, তাদের বন্দীদের ব্যাপারে রসুলেপাক স. খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, তখন হাওয়াযেন কবীলার সকল বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। রসুলেপাক স. তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ওই সকল বন্দীদেরকে কাপড় চোপড় ও বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করলেন। পরে হাওয়াযেন কবীলার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তাদের নেতা মালেক ইবনে আউফ, যে যুদ্ধের ময়দানকে উত্তপ্ত করেছিলো, সে কোথায়? তারা বললো, সে তায়েফে আছে। রসুলেপাক স. বললেন, সে যদি ফিরে এসে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাকে তার পরিবার পরিজন, পশুসমূহ এবং মালপত্র ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অধিকন্তু তাকে একশ উট দান করা হবে। মালেক এ সংবাদ জানার পর খুশি হলো এবং জিইররানায় এসে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলো। অঙ্গীকারানুসারে সে তার পরিবার-পরিজনকে ফিরে পেলো। অধিকন্তু একশ উট উপঢৌকন স্বরূপ লাভ করলো। সে রসুলেপাক স. এর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করলো। রসুলেপাক স. তাকে মুআল্লাফাতুল কুলুবদের মধ্যে শামিল করে নিলেন এবং তাঁর গোত্র ও অন্যান্য গোত্র, যারা মুসলমান হয়েছিলো, তাকে

তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। তিনি তখন ওই সকল গোত্রের সহযোগিতায় ছাকীফ গোত্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন এবং তারাও পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. যখন গনিমতের মালসমূহ বণ্টন ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করলেন। তখন মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। যিলকদ মাসের বারো দিন অবশিষ্ট থাকতে বুধবার দিন জিইররানা নামক জায়গা থেকে ওমরার এহরাম বাঁধলেন এবং মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হলেন। সেখানে ওমরা আদায় করার পর প্রত্যাবর্তন করলেন মদীনায়। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. সেদিন সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে এশার নামাজ আদায় করে যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে একস্থানে আদায় করলেন ফজরের নামাজ। বিষয়টি ছিলো এরকম যে, রাতারাতি ওমরা আদায় করে আবার জিইররানায় ফজরের সময় ফিরে এলেন। জিইররানা মক্কা মুকাররমা থেকে এক মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। সুতরাং দিবসের শেষ অংশে যাত্রা শুরু করে মক্কায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং রাতের শেষ দিকে ফিরে আসেন। সে দেশে সফরের নিয়ম ছিলো এরকমই। ওই পাহাড়ী স্থানে তশতরীর মতো ছোট একটি পানির কূপ ছিলো। লোকেরা ওই পানি দিয়ে আটা গুলতো। ওই কূপের পানি ছিলো অত্যন্ত শীতল ও মিষ্ট। হতে পারে ইসলামী বাহিনী তাদের অবস্থানের প্রয়োজনে কোনো সময় কূপটি খনন করেছিলো অথবা বৃষ্টির ঢলের কারণে গর্ত হয়ে গিয়ে কূপের সৃষ্টি হয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

কুদওয়াতুল আওলিয়া শায়েখ ইমাম আব্দুল ওহ্হাব মুত্তাকী কাদেরী র. বলেছেন, আমি জিইররানায় রোজা রেখে পায়ে হেঁটে কয়েকবার গিয়েছি। একবার এমন ঘটনা ঘটলো যে, আমি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে আমার দেখা হলো। নিদ্রা ভেঙে যাওয়ার পর আমি উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি কতোবার বলেছিলেন একথাটি আমার মনে নেই। এই গ্রন্থের লেখক (শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, আমিও তাঁর ওই কাজের পদাংক অনুসরণ করে একই উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলাম এবং স্বপ্নযোগে রসুলেপাক স. এর দীদারপ্রাপ্তির আশায় সেখানে নিদ্রাও গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মধ্যে সে কামালিয়াত বা যোগ্যতা কোথায় যে, ওই নেয়ামত পেয়ে ধন্য হবো? ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

মদীনাযাত্রার প্রাক্কালে তিনি স. মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন হজরত উত্তাব ইবনে উসায়দ উমুববী ইবনে আবুল আয়স ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসকে, যিনি মক্কাবিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি কুরাইশ সরদারদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। কোনো কোনো আসমাউর রিজাল (জীবনচরিতমূলক) গ্রন্থে পাওয়া যায়, মক্কা থেকে হুনাইনের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে

রসুলেপাক স. তাঁকে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর মহাপ্রয়ান পর্যন্ত তিনি মক্কার প্রশাসক ছিলেন। পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীকও তাঁকে ওই দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পরলোকগমনের দিন পঁচিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

রসুলেপাক স. হজরত উত্তাবের সঙ্গে হজরত আবু মুসা আশআরী এবং হজরত মুআয ইবনে জাবালকে মক্কা মুকাররমায় রেখে গেলেন। তাঁদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সেখানকার নতুন মুসলমানদেরকে কোরআনুল করীম এবং শরীয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং দ্বীন ও মিল্লাতের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত উত্তাবের জন্য বায়তুলমাল থেকে দৈনিক এক দিরহাম করে ভাতা ধার্য করা হলো। তিনি কখনো কখনো তাঁর খুতবায় বলতেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্তায়ালা ওই ব্যক্তির কলিজাকে অভুক্ত রাখবেন, যে দৈনিক এক দিরহাম রোজগারকে যথেষ্ট মনে না করে। রসুলুল্লাহ্ স. আমার জন্য প্রতিদিন এক দিরহাম ভাতা ধার্য করেছেন। আমি এই নির্ধারণের উপরেই সন্তুষ্ট। এর অধিক প্রয়োজন আমার নেই। তিনি নির্লিপ্ততা ও অল্পে তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যা বনী উমাইয়ার বংশভূতগণের মধ্যে খুব কম লোকের মধ্যে ছিলো। কেবল হজরত উত্তাব ছিলেন ব্যতিক্রম।

রসুলেপাক স. মক্কা মুকাররমা থেকে মাররুয্যাহরানে পৌঁছলেন। গনিমতের মাল তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিলো। তিনি স. সেখানে সেগুলোর সবই সঙ্গী সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অতঃপর যিলকদ মাসের শেষ তারিখে অথবা যিলহজ মাসের প্রথম তারিখে মদীনা তাইয়্যেবায় প্রবেশ করলেন। ওই বৎসরও লোকেরা মূর্খতার যুগে যেভাবে হজ্ব করতো, সেভাবেই হজ্ব সম্পন্ন করলো। হজরত উত্তাব ইবনে উসায়দ মুসলমানদের সাথে হজ্ব করলেন। তবে তাঁকে আমীরুল হজ্ব বানানো হয়নি। এক বর্ণনায় আছে, তাকে ওই বৎসর আমীরুল হজ্ব বানানো হয়েছিলো। জীবনালেখ্যরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, তালীফে কুলুব (মনোরঞ্জন) করার উদ্দেশ্যে হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে ইয়ামন প্রদেশের নাজরানের গর্ভনর নির্বাচন করা হয়েছিলো। তখনকার সময়ে সেখান থেকে মক্কায় যেতে লাগতো দু'মাস ষোলো দিন। এই বৎসরই রসুলেপাক স. উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা সাওদা বিনতে যামআ রা.কে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি নিবেদন করেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার অন্তরে কোনো কামনার আকর্ষণ নেই। তবে আমি চাই, কিয়ামতের দিন আমি যেনো আপনার স্ত্রীর পরিচয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে পারি। দয়া করে এই সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আমি আমার রাতের পালা আয়শাকে দিয়ে দিলাম। আমি শুধু আপনার মহব্বত প্রত্যাশী।

হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকাল

রসুলেপাক স. এর যে পুত্র হজরত ইব্রাহীম উম্মতজননী হজরত মরিয়া কিবতিয়া রা. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর জন্ম হয়েছিলো অষ্টম হিজরীতে। ওই বৎসরেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর বয়স হয়েছিলো ষোল মাস। এক বর্ণনায় আছে, আঠারো মাস। কোনো কোনো কিতাবে পাওয়া যায়, এক বৎসর দু'মাস দু'দিন। এটাই ঐকমত্যসম্মত। আবার কোনো কোনো বর্ণনানুসারে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিলো দশম হিজরীতে। আওলাদে কেরাম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

সাইয়্যেদা যয়নবের ইন্তেকাল

এই বৎসর ইন্তেকাল করেন রসুলুল্লাহ্ স. এর আদরের কন্যা সাইয়্যেদা যয়নব। তিনি প্রথমে ছিলেন আবুল আস ইবনে রবীর স্ত্রী। দুই সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি। এক পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্রসন্তান প্রাপ্তবয়স্কতার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, মক্কাবিজয়ের দিন রসুলেপাক স. তাঁকে রদীফ বানিয়েছিলেন। তাঁর কন্যার নাম ছিলো উমামা। সাইয়্যেদা ফাতেমাতুযযাহরা রা. এর ইন্তিকালের পর তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক হজরত আলী তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

এ বৎসর মদীনা মুনাওয়ারায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটেছিলো। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, বাজারে যখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো, তখন লোকেরা নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমাদের জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি স. বললেন— 'ইন্নাল্লাহা হুয়াস সি'রুল কাবিদুল বাসিতুর রাযিকু' (আল্লাহ্তায়লাই বাজার দর নিয়ন্ত্রণকারী)। তার কবযায়ে কুদরতেই বাজার দর বাড়ে ও কমে। তিনিই রাজ্জাক। আমি আশা রাখি, আমি যেনো আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে মিলিত হই এমন অবস্থায় যে, কোনো কিছু অতিরিক্ত করার প্রশ্ন আমাকে না করা হয়। না কোনো জানের বিষয়ে, না কোনো মালের বিষয়ে।

মিম্বর শরীফ নির্মাণ

এ বৎসর মিম্বর শরীফ নির্মাণ করা হয়। অন্য এক বর্ণনানুসারে মিম্বর নির্মিত হয় সপ্তম সালে। মসজিদে নববীর ওই মিম্বরে দাঁড়িয়ে রসুলেপাক স. ভাষণ প্রদান করতেন। মিম্বর কে নির্মাণ করেছিলো সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মিম্বর প্রস্তুত

করার পূর্বে রসুলেপাক স. একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুত্বা দিতেন। যখন মিম্বর বানানো হলো, অপর বর্ণনা মতে তিনি যখন প্রথম মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন, তখন সেই খুঁটিটি রসুলেপাক স. এর বিচ্ছেদে রোদন করেছিলো। হাদিসটি সুবিদিত। এমনকি সর্বজনবিদিত (মুতাওয়াতির)। হাদিস শাস্ত্রজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. মিম্বর শরীফ তৈরী হওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। যখন বক্তৃতা দীর্ঘায়িত হতো, তখন ক্লান্তি নিবারণার্থে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠদেশ মসজিদের খুঁটির সঙ্গে ঠেকাতেন।

মিম্বর বানানো হলো। এলো জুমার দিবস। তিনি স. মিম্বরের উপরে উপবেশন করলেন। খুঁটিটি সশব্দে কাঁদতে শুরু করলো। এক বর্ণনায় আছে, খুঁটিটি এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগলো, যেমন করে উট কাঁদে তার শাবককে হারিয়ে। এক বর্ণনায় আছে, বাচ্চা তার মাকে পাওয়ার জন্য যেরকম কাঁদতে থাকে, খুঁটিটি সেদিন সেরকমভাবে ক্রন্দন করেছিলো। তাছাড়া অপর এক বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি তার মাশুক ও মাহবুবের বিচ্ছেদে যেভাবে ক্রন্দন করে, খুঁটিটি ক্রন্দন করেছিলো সেভাবে। সেদিন উক্ত খুঁটির ক্রন্দনে মসজিদে উপস্থিত সকলের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাঁরাও তাঁদের ক্রন্দন রোধ করতে পারেননি। এক বর্ণনায় আছে, খুঁটিটি সেদিন এরকম আহাজারী করেছিলো যে, শোকাঘাতে ফেটে গিয়েছিলো। উপস্থিত জনতা মনে করছিলেন, খুঁটিটি হয়তো এই মুহূর্তে ভেঙে পড়ে যাবে। ভীতসন্ত্রস্তও হয়েছিলেন তাঁরা। কেউ কেউ তার জায়গা থেকেও দূরে সরে গিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে রসুলেপাক স. মিম্বর থেকে নেমে তার কাছে গেলেন এবং তার উপর হাত রাখলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যদি চাও বাগানে ফিরে যাবে, তাহলে আমি তোমাকে তোমার জন্মবাগানে লাগিয়ে দিয়ে আসি। সেখানে তুমি পুনরায় সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। ফল হবে। আর যদি চাও বেহেশতের মাটিতে রোপিত হবে, তাও আমি করবো। তুমি বেহেশতের ঝর্ণার পানিতে সিক্ত হয়ে সজীব হবে। আম্বিয়া, আউলিয়া ও সালেহগণ তোমার ফল আহরণ করবেন। রসুলেপাক স. খুঁটি জড়িয়ে ধরে বার বার বললেন— 'নাআ'ম ক্বদ ফাআ'লতু, না'আম ক্বদ ফাআ'লতু' (হাঁ আমি করেছি, হাঁ আমি করেছি)। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার এমতো উচ্চারণের অর্থ জানতে পারি কী? আপনি একি বলছেন? তিনি স. বললেন, আমি খুঁটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি দুনিয়াতে থাকতে চাও? না জান্নাতে? সে বললো, জান্নাতে। আমি তাই বললাম, ক্বাদ ফাআ'লতু (হাঁ আমি এটাই করেছি)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, 'ইন্না হাজা ক্বদ বাকা লিমা ফা ক্বদা মিনাজ্ জিকরি' (খুঁটিটি আল্লাহ্র জিকির থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে রোদন করেছিলো)।

হজরত ইমাম হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন মিম্বর শরীফের হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, হে মুসলমানগণ একটি কাষ্ঠখণ্ড যখন রসুলুল্লাহ্ স. এর বিচ্ছেদের কারণে রোনাজারী করে, তখন তো তোমাদের উচিত আরো অধিক রোনাজারী করা। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. সেই খুঁটিটিকে সেখানেই দাফন করে দিয়েছিলেন।

মিম্বর শরীফ তৈয়ার করা হয়েছিলো আছলে গাবা নামক এক প্রকার কাঠ দিয়ে। আছলে গাবা এক ধরনের বৃক্ষের নাম। আর গাবা একটি জঙ্গলের নাম। জঙ্গলটি মদীনা শরীফ থেকে ন'মাইল দূরে অবস্থিত। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে মিম্বর শরীফ দৈর্ঘ্যে ছিলো দু'গজ, আর প্রস্থে ছিলো এক গজ। প্রতিটি সিঁড়ির প্রস্থ ছিলো এক বিঘত। খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানা পর্যন্ত এটি তার পূর্বের আকৃতিতেই ছিলো। পরে মিম্বর শরীফে কালো কাপড়ের গিলাফ পরিয়েছিলেন হজরত ওছমান ইবনে আফফান রা.। তিনি খেলাফত লাভের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের ব্যবহৃত সিঁড়িদ্বয় বাদ দিয়ে মিম্বরের প্রথম সিঁড়ির উপর বসতেন। বলতেন যে, মনীব ও খাদেমের মধ্যে কখনো সমপর্যায়ভূতি হয় না। এক স্থানে সমবেত হলেও না। পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের সমপর্য়ায়ের আমি নই। তাই তাঁরা বসতেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত মুআবিয়ার শাসনামলে সর্বপ্রথম মিম্বর শরীফে গিলাফ পরানো হয়েছিলো যখন তিনি শাম (সিরিয়া) থেকে মদীনায় এসেছিলেন। তিনি তখন রসুলুল্লাহ্ স. এর মিম্বর মদীনা থেকে শামদেশে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এমতো অভিপ্রায় কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন ঘন অন্ধকার নেমে এলো যে, অন্ধকারে ঢেকে গেলো পুরো শহর। মনে হচ্ছিলো সূর্যগ্রহণ চলছে। অন্ধকার রাতের আকাশের মতো তারকারাজি দৃষ্ট হলো। এমন অবস্থায় হজরত আমীর মুআবিয়া তাঁর অভিপ্রায় থেকে নিবৃত্ত হলেন। অনুতপ্ত হলেন খুব। সাহাবা কেরামের কাছে মতামত প্রকাশও করলেন অকপটে। বললেন, মিম্বর শরীফ এখান থেকে স্থানান্তরিত করে তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। ঘুণে যাতে আক্রমণ না করে অথবা এই মহান নিদর্শনটির অনাদর যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি একাজ করতে চেয়েছিলাম। তিনি ওই মিম্বর শরীফে আরও দু'টি সিঁড়ি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং রসুলেপাক স. এর মিম্বরকে তার উপরে স্থাপন করেছিলেন। যাতে করে উঁচু হয় এবং মসজিদে উপস্থিত সকলেই খতিবকে (বক্তাকে) দেখতে পায়। 'তারিখে মদীনায়' এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

'রওযাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হজরত আমীর মুআবিয়া শামদেশ থেকে মদীনার শাসক মারওয়ানের কাছে পত্র লিখলেন, মিম্বর শরীফ মদীনা থেকে শামদেশে স্থানান্তরিত করা হোক। এমনও হতে পারে যে,

তিনি প্রথমে শামদেশ থেকে মারওয়ানের নিকট পত্রযোগে তাঁর এমতো অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং পরে নিজে মদীনায় এসে মিম্বর শরীফখানি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। অথবা এমনও হওয়া সম্ভব যে, প্রথমে মদীনায় এসে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন মাত্র। পরে সেখানকার শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্থানান্তরণের জন্য। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরবর্তীতে মাহদী যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি উক্ত মিম্বরে আরও কিছু নতুন সংযোজন ঘটাতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম মালেক র. তাঁকে নিষেধ করলেন। হজরত আমীর মুআবিয়া কর্তৃক তৈরী মিম্বরটি যখন পুরাতন হয়ে গেলো, তখন আব্বাসিয়া খলীফাদের মধ্যে কেউ কেউ মিম্বরখানির সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁরা নবী করীম স. এর মিম্বর শরীফের স্তরগুলোকে বরকত লাভের আশায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ৬৫৪ হিজরীতে যখন মসজিদে নববীতে আগুন লেগেছিলো, তখন রসুলেপাক স. এর মিম্বর শরীফখানি ছিলো অক্ষত ও অদগ্ধ। পুড়ে গিয়েছিলো কেবল হজরত আমীর মুআবিয়া কর্তৃক নির্মিত মিম্বরের বর্ধিতাংশ। তবে এ বিষয়ে বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে, আব্বাসিয়া খলীফাগণ যা বানিয়েছিলেন, আগুনে সেই অংশটুকুই পুড়ে গিয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

পরবর্তীকালের প্রত্যেক বাদশাহর শাসনামলেই মিম্বরের জায়গার কোনো না কোনো সংস্কার সাধন করা হয়েছিলো। মিম্বরের আকারও বার বার পরিবর্তিত হয়ে আসছিলো। পারস্য বাদশাহ মুরাদখান ইবনে সুলতান খান ৯৯৮ হিজরীতে রখাম কাঠ দিয়ে মিম্বার তৈয়ার করেছিলেন। তার উপর সাত পার্শ্ববিশিষ্ট খিলানও তৈয়ার করেছিলেন তিনি।

রিয়াদুল জান্নাত

সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'মা বাইনা কাবরী ওয়া মিম্বারী মির রিয়াদিল জান্নাতি' (আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থানে বেহেশতের বাগিচাসমূহের কোনো একটি বাগিচা আছে'। এক বর্ণনায় আছে, আমার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থানে বেহেশতের বাগান আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে বেহেশতের বাগান। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— আমার মিম্বরটি রয়েছে আমার হাউযে কাউছারের উপর। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, আমার মিম্বর আছে জান্নাতের কোনো একটি দরজার উপর। 'নাযআতুন' এর অর্থ কেউ কেউ বলেছেন, দরজা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত উদ্যান। উলামা কেরাম বিভিন্নভাবে হাদিসখানির ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, উক্ত ভূমিখণ্ডকে বেহেশতের বাগানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা ওই স্থানে বিরামহীনভাবে আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ

হয়। আর এই রহমত ওই সকল লোকই লাভ করে থাকেন, যারা সেখানে বসে যিকির আজকার করেন। যেমন মসজিদকে বলা হয়েছে বেহেশতের বাগান। হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা যখন বেহেশতের বাগানসমূহ অতিক্রম করবে, তখন সেখানকার ফল আহরণ করে নিয়ো। উপযুক্ত বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে এই হাদিসে। কেউ কেউ বলেছেন, 'রিয়াদুলজান্নাত' বলে বুঝানো হয়েছে ওই স্থানের মহামর্যাদার কথা। অর্থাৎ সেখানে বসে ইবাদত করলে পাওয়া যাবে সুপ্রচুর কল্যাণ। যার মাধ্যমে লাভ হবে মহান সমাধিধারীর সন্তোষ। হাদিস শরীফে এসেছে, বেহেশত তরবারীর ছায়ার নীচে অবস্থিত। আবার বলা হয়েছে, মায়ের পদতলে জান্নাত। এ জাতীয় ব্যাখ্যা আহলে জাহেরগণ করেছেন, যারা হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হননি। নতুবা তাদের বুঝা উচিত ছিলো যে, এমন মহান বাণী তার হাকীকতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রসুলুল্লাহ্ স. এর হুজরা মুবারক (পবিত্র প্রকোষ্ঠ) ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী জায়গা প্রকৃতার্থেই বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। কিয়ামতের দিন স্থানটি ফেরদাউসে আ'লায় স্থানান্তরিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের ন্যায় তা বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না, যেমন ইবনে ফারহুন ইমাম মালেক সূত্রে এরকমই বর্ণনা করেছেন। আর এ বিষয়ে উলামা কেরামের ঐকমত্যও সুপ্রতিষ্ঠিত। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মালেকী মাযহাবের বড় বড় আলেমদের অন্যতম ইবনে হামযা বলেছেন, এটা হওয়া সম্ভব যে, ভূখণ্ডটি হুবহু জান্নাতেরই অংশ এবং সেখান থেকে তাকে দুনিয়াতে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন বর্ণনায় এসেছে, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম সম্পর্কে। কিয়ামতের পর তাকে আবার তার আসল জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে। এ জায়গায় ইবাদত-বন্দেগী ও জিকির আজকারকারীদের জন্য বেহেশতপ্রাপ্তি ও রহমত লাভ এ জায়গার অধিক ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন হজরত ইব্রাহীমের খলীল হওয়ার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে মাকামে ইব্রাহীম নামক পাথরটি। আর সাইয়্যেদে আলম স. এর আল্লাহ্র হাবীব হওয়ার বিষয়টি খাস হয় উক্ত রওযা শরীফের বিশেষত্বের মাধ্যমে, যদিও বাহ্যিক চোখ দ্বারা দেখা যায় দুনিয়ার সকল মাটি এরকম। কিন্তু ওই মৃত্তিকা তো সংযুক্ত রয়েছে তাঁর মহামহিম অস্তিত্বের সঙ্গে। এর মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই। মানুষ যতোক্ষণ তার সৃষ্ট সত্তায় সৃষ্টিগত অবস্থার পর্দায় আচ্ছাদিত থাকে এবং মানবীয় স্বভাবের বিধানে বন্দী থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর হাকীকতের উন্মোচন তার কাছে হয় না এবং আখেরাতের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া তার পক্ষে হয় অসম্ভব। তবে এ বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে, শরীয়তপ্রণেতা নবী করীম স. কর্তৃক কোনো বাণীর বিষয়ে সন্দিহান হওয়া অনভিপ্রেত। এখন প্রশ্ন হলো— এ জায়গাকে যখন বেহেশতের

বাগিচাসমূহের অন্যতম আখ্যায়িত করা হলো, তখন তো এখানে ক্ষুৎপিপাসা থাকার কথা নয়— যা বেহেশতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেহেশতবাসীদের তো কোনো ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন 'ইন্নাকা লা তাজূউ' ফিহা ওয়ালা তা'দী ওয়া আন্নাকা লা তাজমাউ ফীহা ওয়ালা তাদহা' (নিশ্চয়ই তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গতাও তোমাকে পাবে না। আর নিশ্চয়ই তুমি সেখানে পিপাসিত হবে না এবং সেখানে তোমাকে কোনো চাশতের খানাও দেওয়া হবে না)। কিন্তু এরূপ অবস্থায় উত্থিত প্রশ্নটির উত্তরে এরূপ বলা যেতে পারে যে, এই অংশটিকে যখন বেহেশত থেকে পৃথক করে দুনিয়াতে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে, তখন তার বেহেশতের বৈশিষ্ট্যাবলীকেও নিশ্চয় করে দেওয়া হয়েছে পৃথক। ভূমিটুকুকে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এভাবেই।

বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে আরও কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন— যে ব্যক্তি এ স্থানে আসবে, লাভ করবে এর বরকত। এ জায়গায় উপস্থিত থেকে নেক আমলে যে মশগুল হবে আখেরাতে সে হবে নবী করীম স. এর হাউযে কাউছার লাভের যোগ্য। অথবা রসুলেপাক স. এর এই মিম্বর শরীফকে কিয়ামতের দিন অন্যান্য মাখলুকাতের ন্যায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রতিস্থাপন করা হবে হাওযে কাউছারের কিনারায়। আলেমগণ এরকমই বলেছেন।

আব্দুল কায়স ওয়াফদের আগমন

আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদলের মদীনায় আগমন এই বৎসরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোনো ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যারা হয়ে থাকে, তাদেরকে বলা হয় 'ওয়াফদ'। কোনো ব্যক্তি বা জাতির চিঠি বা কোনো সংবাদ নিয়ে দূত হিসেবে আগমন করে তারা। আব্দুল কায়সের পিতার নাম কুসাই। গোত্র আসাদ, যা রবীআর অন্যতম বংশশাখা। এই বৎসর তাদের প্রতিনিধিদল রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়েছিলো। প্রতিনিধিদলের লোকসংখ্যা ছিলো বিশজন। তাদের নেতা ছিলো আশাজ্জ। ওই প্রতিনিধিদল আসার একদিন পূর্বে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, শীঘ্রই পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক আগমন করবে। আনন্দচিত্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। তাদের নেতার আকৃতি প্রকৃতি হবে এরকম এরকম। একথা বলে রসুলেপাক স. তাদের জন্য দোয়া করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! আব্দুল কায়সের লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও। প্রতিনিধিদলের লোকেরা যখন রসুলেপাক স. দরবারে হাজির হলো, তখন তিনি স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রভূত? অথবা বলেছেন, তোমরা কোন দিক থেকে এসেছো? তারা বললো, আমরা রবীআর (রবীআ ইবনে সাআদ ইবনে আদনান) বংশধর। উল্লেখ্য, রবীআর বংশধারা ঊর্ধ্বস্তরে কুরাইশ

বংশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ স.ও ছিলেন কুরাইশ বংশের। নসব নামায় এরকমই পাওয়া যায়। রসুলেপাক স. বলেছেন, কাওম বা ওয়াফদের জন্য অভিনন্দন। কথাটি রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে একটি দোয়াও বটে। যা তিনি সাধারণতঃ প্রিয় আগন্তুকদেরকে বলতেন। তিনি স. আরও বললেন, তোমরা লজ্জিত ও অপদস্থ হবে না। আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদল বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে আসতে পারি না। হারাম মাসসমূহে আরব দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকতো। হারাম মাসসমূহ ছিলো যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব— এই চার মাস। কেননা আমাদের আগমন পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মুদার গোত্রের লোকেরা। মুদার ইবনে নেযার ছিলো রবীআ ইবনে নেযারের ভাই, মুদার ছিলো হজরত ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসারী। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা মুদারকে দোষারোপ কোরো না। কেননা সে দ্বীন ইসলামের উপর ছিলো। তিনি মুদ অর্থাৎ কটা দুধ পান করতে খুব পছন্দ করতেন তাই তাঁর নাম হয়েছিলো মুদার। তাঁর এমতো নামকরণের আরেকটি কারণ ছিলো এরকম— তিনি ছিলেন শুভ্র বর্ণের। তাঁর মুখও ছিলো শ্বেতশুভ্র। লোকেরা তাই তাঁকে মুদার আহমার বলে ডাকতো। তাছাড়া জীবনীলেখকগণ বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাল বর্ণের সম্পদ অর্থাৎ স্বর্ণ পেয়েছিলেন। আর রবীআ পেয়েছিলেন ঘোড়া বহর। অথবা তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে লাল রঙের পতাকা ব্যবহার করতেন।

আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দল নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে দ্বীনের বিধান সম্পর্কে অবহিত করুন, যাতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারি। কোনোরকম অস্পষ্টতার শিকার যেনো আমরা না হই। পশ্চাতে আমরা যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের কাছে যেনো আমরা সকল কিছুর স্পষ্ট বিবরণ দিতে পারি। আর আমাদের সামনে যারা পড়বে, তাদেরকেও যেনো আমরা এবিষয়ে অবহিত করতে পারি এবং আমরা ও তারা সকলেই যেনো এর উপর আমল করে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। রসুলেপাক স. তাদেরকে ইমান, নামাজ, রোজা, জাকাত এবং গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ আদায় করার হুকুম দিলেন। তারপর তারা যে পাত্রে নাবীয রাখে, বা পান করে তার ব্যবহার সম্পর্কে রসুলেপাক স. এর নিকট প্রশ্ন করলো। তাদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— যখন মদ্য পান নিষিদ্ধ ছিলো না তখন তারা যে সকল পাত্রে খেজুর বা আঙ্গুর ভিজিয়ে মদ্য প্রস্তুত করতো, এখন তো মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং ওই সকল পাত্র তারা ব্যবহার করতে পারবে কিনা। না কি পাত্রগুলোও এখন নিষিদ্ধ? রসুলেপাক স. এ ধরনের চার প্রকারের পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। যেমন– ১. খম বা সবুজ রঙের মটকা, যার মধ্যে শরাব

ও নাবীয ভিজানো হতো। ২. দুববা-কদুর শুকনো খোল, যাতে রঙ করে সুরাহীর মতো বানানো হতো এবং তাতে শরাব রাখা হতো। ৩. নাকীর গাছের মূল যা খোদাই করে থালা বানানো হতো এবং তাতে শরাব ভিজানো হতো। ৪. মুযাফ্ফাত— যে পাত্রে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তারপর তাতে শরাব রাখা হতো। রসুলেপাক স. আরও বললেন, তোমরা বিধানগুলোর কথা মনে রেখো এবং তোমাদের এলাকার যে সকল লোক আসতে পারেনি, তাদের কাছে গিয়ে এই বিধানগুলোর কথা জানিয়ে দিয়ো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শরাবের চিহ্ন যখন বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শরাব পান হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার পাত্রের ব্যবহার হারাম নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শরাব পান পরিত্যাগের পর পরই এরকম করা যাবে না। কেননা আমলটি তখন পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মনে হবে যেনো শরাব পানের কাজেই পাত্রগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ওই পাত্রগুলোর ব্যবহার হবে মাকরুহ। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদল যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলো তখন তারা তাঁর নুরানী সৌন্দর্য দেখে বাহন থেকে লাফিয়ে পাড়লো এবং তাঁর পবিত্র হাত ও পা চুম্বন করে মহব্বত প্রকাশ করলো। রসুলেপাক স. তাদের এহেন মহব্বতের আবেগকে প্রশ্রয় দিলেন। তাদেরকে এরকম করতে নিষেধ করলেন না। কিন্তু ওই সময় তাঁদের সরদার আশাজ্জ আব্দুল কায়সকে দেখা গেলো না। তিনি তাঁর বাহনসহ বিশ্রামাগারে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি গোছল করলেন। পবিত্র ও উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করলেন। তারপর ধীরস্থিরভাবে মসজিদে নববীতে এলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। দোয়া করলেন। তারপর রসুলেপাক স. এর পবিত্র সমাবেশে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. তাঁর এরূপ আচার-অনুষ্ঠান ও আদব প্রদর্শন পছন্দ করলেন। বললেন, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব আছে যা আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেন। তাহচ্ছে হেলেম বা ধীরস্থিরতা এবং এনাআত বা আত্মমর্যাদা। ত্বরাপ্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সুচিন্তিতভাবে কোনো বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নাম হেলেম। আর এনাআত এর অর্থ মহানুভবতা প্রদর্শনবিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। এই গুণটি সূচিত হয় আত্মমর্যাদাবোধ থেকে। এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল হেযামুওয়াল হাযা'। আবার অন্য এক রেওয়াতে আছে 'আল হিলমু ওয়ান্নাওতু'। শব্দগুলো প্রায় সমার্থক। 'রওযাতুল আহবাব' কিতাবে আশাজ্জ আব্দুল কায়স সরদারের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য সংকলিত হয়েছে। প্রতিনিধিদলটি যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাদের মধ্যে আশাজ্জ কে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি। রসুল স. এর জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, আশাজ্জ সুশ্রী ছিলেন না। রসুলেপাক স. বারবার তাকে দেখছিলেন।

তিনি যেনো বিস্মিত হচ্ছিলেন এই ভেবে যে, এরকম অসুন্দর একটি লোককে তার গোত্রের লোকেরা নেতা মনোনিত করলো কীভাবে? তিনি রসুল করীম স. এর মনোভাব বুঝে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মানুষের শরীরের চামড়া কিন্তু পানি পান করে না। একজন ব্যক্তির মূল অঙ্গ তার বচন, হৃদয় ও দেল। যার হৃদয় ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে তার বচন বিশুদ্ধ হয়। রসুলেপাক স. তাঁর কথা শুনে খুশি হলেন। তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর পার্শ্বে বসালেন। বললেন, তুমি তোমার নিজের ও কাওমের পক্ষ থেকে আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করো। অর্থাৎ তুমি নিজে বায়াত হয়ে যাও এবং তোমার কাওমের লোকদের ইমানের জামিন হয়ে যাও। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর হুকুম মান্য করলাম। আমি এ রকমই করবো। কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ খুবই কঠিন একটি বিষয়। তাই আমি চাই, প্রথমে আমি আমার ব্যক্তিগত বায়াত গ্রহণ করবো। আর আমার কাওমের লোকদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি কাউকে আমাদের কাছে পাঠাবেন, তিনি লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিবেন। যারা আমাদের অনুসরণ করবে তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে। আর যারা প্রত্যাখ্যান করবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টি সুন্দর স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ্‌তাআলা পছন্দ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হেলেম বা ধীর-স্থিরতা। আর অপরটি হচ্ছে, আত্মমর্যাদা। আশাজ্জ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বৈশিষ্ট্য দু'টো আমার জন্মগত। আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তাঁর কাছে পছন্দনীয়।

জীবনীকারগণ বলেছেন, এ প্রতিনিধি দলটি মদীনায় দশদিন অবস্থান করেছিলো। এই দশদিনে তারা কুরআন ও শরীয়তের হুকুম আহকাম শিখেছিলো। রসুলেপাক স. তাদের প্রত্যেককেই হাদিয়া তুহফা দিয়েছিলেন এবং সরদার আশাজ্জকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। দশদিন পর রসুলেপাক স. তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

নবম হিজরীর ঘটনাবলী

রসুলজীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরীর প্রারম্ভে মহররম মাসে রসুলেপাক স. মুসলমান এলাকায় বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁরা জাকাত আদায় করে নিয়ে আসতেন। প্রেরণকালে কর্মচারীগণকে নসিহত করতেন এভাবে— তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। ২. জাকাত আদায় কালে লোকদের কাছ থেকে উত্তম মাল অন্বেষণ করবে না। ৩. লোকদেরকে জাকাত আদায়কালে পুরোপুরিভাবে জাকাত আদায়ের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে

রাজী করিয়ে জাকাত আদায় করবে। ৪. আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে জাকাত আদায় করবে। ৫. জাকাত আদয়কালে ইনসাফ করলে তার ফল তোমরাই পাবে, আর যুলুম করলে তার ক্ষতি তোমাদের উপরই পতিত হবে। জাকাত দানকারীদের সন্তুষ্টির উপরই তোমাদের ফায়দা।

জাকাত আদায়কারীদের মধ্যে একজন ছিলেন বুশাইর ইবনে সুফিয়ান কা'বী, যাকে খাযাআর বনী কাআব গোত্রে প্রেরণ করা হয়েছিলো। বুশাইর যখন বনী কাআব গোত্রের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাদের সকল লোক বনী তামীম গোত্রের একটি কূপের পাশে একত্রিত হলো। বুশাইর চতুষ্পদ প্রাণীগুলো একত্রিত করে তা থেকে জাকাতের প্রাণীগুলোকে পৃথক করলেন। বনী তামীমের লোকেরা চুপচাপ সবকিছু দেখলো। বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হলো না। তারা বনী কাআবের লোকদেরকে বলতে লাগলো, তোমরা মোহাম্মদকে কেনো এতোকিছু দিতে যাচ্ছো? তারপর তারা তরবারী ও তীর ধনুক নিয়ে রসুলেপাক স. এর জাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণকে জাকাতের প্রাণী নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করলো। বনী কাআবের লোকেরা বললো, আমরা দ্বীনে মুস্তফা স. এর উপর ইমান এনেছি এবং রসুলেপাক স. এর আনুগত্য করবো বলে স্বীকৃতি দিয়েছি। জাকাত তো ইসলামের ফরজ ও ওয়াজেবসমূহের অন্যতম। বনী তামীমের লোকেরা বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমরা ছাড়বো না, মোহাম্মদের কর্মচারী একটি উঁটও এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এরূপ অবস্থা দেখে বুশাইর নিরস্ত হলেন। অতি দ্রুত ফিরে চললেন মদীনার দিকে। মদীনায় এসে নবী করীম স. কে সবকিছু খুলে বললেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে, বনী তামীমের ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ নিতে পারবে? উয়ায়না ইবনে হাসীন কাসারী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি বনী তামীমকে ধাওয়া করতে যাবো এবং তাদের সকল লোককে রসুলেপাক স. এর কাছে হাজির না করে ফিরবো না। রসুলেপাক স. পঞ্চাশ জন যোদ্ধাকে তাঁর সঙ্গে দিলেন। তাঁদের মধ্যে মুহাজির ও আনসারদের কেউই ছিলেন না। হাসীন কাসায়ী তাঁর ছোট্ট বাহিনী নিয়ে বনী তামীমের দিকে যাত্রা করলেন। উয়ায়না তাঁর সাথী-সঙ্গীদেরকে নিয়ে বিরোধীদের বস্তিতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাদের অধিকাংশ ঘর বাড়ি খালি পড়ে আছে। লোকালয়ে বনী তামীমের যে ক'জন লোক উপস্থিত ছিলো, মুসলিম বাহিনী তাদের উপর হামলা করলো। হামলা করে তাদের এগারো জন পুরুষ ও পনেরো জন নারীকে বন্দী করা হলো। অপর এক বর্ণনায় আছে, এগারো জন নারী ও তেইশ জন শিশুকে বন্দী করে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসা হলো। কয়েক দিন পর বনী তামীমের একদল লোক বন্দীদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলো। তারা আকরা ইবনে হারেছকে তাদের মুখপাত্র নিযুক্ত করলো। ইতোপূর্বে গনিমতের মাল বণ্টন অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

সে ছিলো একজন বিশুদ্ধভাষী বক্তা ও কবি। সে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। রসুলেপাক স. তখন উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার হুজরা শরীফে কায়লুলা (দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম) করছিলেন। আগন্তুক আবারা ইবনে হারেছ জানতো না রসুলেপাক স. কোন হুজরার মধ্যে অবস্থান করছেন। সে জন্য সে প্রত্যেক হুজরার সামনে গিয়েই সজোরে ডাকাডাকি করতে লাগলো, হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। আমাদের বাচ্চা ও নারীদেরকে কেনো কয়েদী বানিয়েছেন? আমরা কী অপরাধ করেছি? হযরত বেলাল ও মসজিদে উপস্থিত অন্যান্য সকল সাহাবীই তাকে বিরত রাখার ও শান্ত করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা তাকে এই বলে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, মসজিদের মধ্যে উচ্চ আওয়াজ করা উচিত নয়। এখানে আদব প্রদর্শন করতে হবে কিন্তু এ সব কথা তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। হজরত বেলাল বললেন, হে নির্বোধ! সামান্য সময় অপেক্ষা করো। রসুলেপাক স. একটু পরেই জোহরের নামাজের জন্য বেরিয়ে আসবেন। এমন সময় রসুলেপাক স. বেরিয়ে এলেন। বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আমাকে ঘুম থেকে জাগালে? তিনি দু'হাত দ্বারা চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছিলেন। তাঁর কথা শুনে কেউ কিছু বললেন না। তিনি স. সকলকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। আগন্তুকরা তখন নামাজ আদায় করেছিলো কি না, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. নামাজ শেষে তাঁর প্রকোষ্ঠের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আগন্তুকেরা তাঁকে ঘিরে ফেললো। তাদের পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুধু। কিছু বললেন না। সোজা তাঁর পবিত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। সেখানে জোহরের পরের সুন্নত নামাজ আদায় করার পর বাইরে এলেন এবং মসজিদের বরান্দায় বসলেন। বনী তামীমদের পক্ষ থেকে আকরা ইবনে হারেছ বললো, আমাকে বক্তব্য পেশ করার অনুমতি প্রদান করা হোক। রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে, বলো। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমরা এমন লোক যে, আমাদের প্রশংসা করাই সৌন্দর্য আর আমাদের নিন্দাবাদ করাই হচ্ছে অসুন্দর কাজ। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। এরকম বলা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে। কেননা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করা সুন্দর কাজ আর তার নিন্দা করা অসুন্দর ও অকল্যাণকর। তিনি স. আরও বললেন, তোমরা যে এরকম বললে, তার উদ্দেশ্য কী? তারা বললো, আমরা আমাদের কবি ও বক্তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি এ জন্য যে, তারা আপনাকে তাদের কাব্যের প্রতাপ প্রদর্শন করবে। রসুলেপাক স. বললেন, আমাকে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। আর প্রতাপ প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবু বলছি, তোমরা তোমাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করো। আতারেদ ইবনে হারেব ছিলো বিশুদ্ধভাষী বাগ্মী। সে

দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলো। তার ভাষণের ভিত্তি ছিলো বনী তামীম গোত্রের অহংকার ও গৌরব প্রকাশ। আতারেদ তার ভাষণ সমাপ্ত করলো। শ্রদ্ধাভাজন সাহাবী হজরত ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামাস আনসারী ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, রসুল স. এর অন্যতম মুখপাত্র। তিনি দাঁড়িয়ে প্রতিভাষণ দিলেন। তাঁর সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষণে প্রকাশিত হলো আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা, শাহাদাতাঈনের উচ্চারণ, নবী করীম স. এর উপর দরুদ, মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা এবং রসুল স. এর অনুসরণ ও তাঁকে সাহায্য করার সৌভাগ্য সম্পর্কীয় বিবরণ। তাঁর বক্তব্য শুনে তারা বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলো। এবার দণ্ডায়মান হলো বনী তামীমের কবি যবরকান ইবনে বদর। সেও বিভিন্নভাবে তাদের গোত্রের গৌরবগাঁথামূলক কবিতা পাঠ করলো। রসুলেপাক স. এবার ইঙ্গিত করলেন কবি সাহাবী হজরত হাসসান ইবনে ছাবেতের দিকে। তিনি আবৃত্তি করলেন কাসীদা গুররা। অতঃপর আকরা ইবনে হারেছ দাঁড়িয়ে অধিকতর দম্ভভরে কবিতা পাঠ করতে লাগলো। হজরত হাসসানও রসুল স. এর হুকুমে তার প্রত্যুত্তর দিলেন অধিক শিল্পসৌন্দর্যময় কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। আকরা ইবনে হারেছ বলতে লাগলো, আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদকে অদৃশ্য জগত থেকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। এমন কোনো সম্মান ও মর্যাদাই নেই যা তাঁকে দান করা হয়নি। তাঁর মুখপাত্র আমাদের মুখপাত্রের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী, সৌন্দর্যচেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর কবি আমাদের কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর সবকিছু আমাদের সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর সে ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি ধাবিত হলো এবং আনুগত্য গ্রহণ করলো। শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ইমান আনয়ন করলো। রসুলেপাক স. তাদের কয়েদীদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাদেরকে অনেক উপঢৌকনও প্রদান করলেন।

বনী তামীম গোত্রের ওই সকল লোকদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'ইন্নাল্লাজীনা উনাদূনাকা মিওঁ ওরাইল হুজূরাতি আকছারুহুম লা ই'কিলূন ওয়ালাও আন্নাহুম সবারূ হাত্তা তাখরুজা ইলাইহিম লাকানা খাইরাললাহুম ওয়াল্লাহু গফূরুর রহীম' (যাহারা ঘরের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ, তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু) (৪৯:৪-৫)। এই পবিত্র আয়াতে রহমত গুণের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কালামের পূর্বাপর ধারা ও তাদের বেআদবীর বিষয়টির প্রতি যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে এক ধরনের ভর্ৎসনার সুর রয়েছে। ক্ষমা ও দয়া গুণের উল্লেখ যদি না করা হতো, তবে তাদের পক্ষ থেকে যে বেআদবী ও অসদাচরণ প্রকাশ পেয়েছে, রসুল স. এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে চরম উদাসীনতা, তাতে তারা অবশ্যই শাস্তি

পাওয়ার যোগ্য হয়ে যেতো। আল্লাহ্‌তায়ালার বর্ণিত গুণদ্বয়ের কারণেই শেষ পর্যন্ত ভর্ৎসনাটি তাদের হয়ে গিয়েছে শাসনামূলক নমনীয় একটি উপদেশ। ইতোপূর্বেও নবী করীম স. এর সামনে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা ও তাঁকে সরাসরি নাম ও উপনাম ধরে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে এভাবে— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানূ লা তারফাঊ আসওয়াতাকুম ফাউকা সাওতিন নাবিয়্যি ওয়ালা তাজহারূলাহু বিল কাউলি কাজাহরি বা'দিকুম লিবা'দিন আন তাহবাতা আ'মালুকুম ওয়া আংতুম লা তাশউরূন' (হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে)(৪৯ঃ২)।

বনী তামীমের লোকজনও বর্ণিত আয়াতের হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। তবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বোখারী শরীফে বলা হয়েছে— অন্য কোনো এক সময় বনী তামীমের কতিপয় লোক রসুলুল্লাহ্‌ স. এর দরবারে হাজির হয়ে এইমর্মে আবেদন করলো, কাউকে আমাদের গোত্রের আমীর নির্বাচণ করা হোক। সেখানে উপস্থিত হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কা'কা ইবনে মাবাদ ইবনে যুরারাকে তাদের আমীর বানানো হোক। হজরত ওমর ফারুক রা. নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আকরা ইবনে হারেছকে আমীর নিযুক্ত করা হোক। হজরত ওমরের মন্তব্যটি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, আমার বিরোধিতা করাই দেখছি তোমার উদ্দেশ্য। হজরত ওমর ফারুক বললেন, না। তা নয়। ওদের কল্যাণ চিন্তা করেই আমি এরকম বললাম। দু'জনের মধ্যে বাক্যবিনিময় হতেই লাগলো। বলাবাহুল্য, তাদের এমতো মতোপৃথকতার উদ্দেশ্য প্রাধান্য বিস্তার বা প্রবৃত্তিরঞ্জন ছিলো না। অবশ্য এরকম শুভ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মতপার্থক্য সকল সাহাবীর মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তখন ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়ুহাল লাজীনা আমানূ লা তুকাদদিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রসূলীহী' (হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না) (৪৯ঃ১)। তাছাড়া তখন এই আয়াতও অবতীর্ণ হয় 'লা তারফাঊ আসওয়াতাকুম'। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর শপথ করে বললেন, এখন থেকে আমি গোপন পরামর্শের ক্ষেত্রে মানুষ যেরকম আস্তে কথা বলে, সেভাবেই কথা বলে যাবো। রসুল স. এর সামনে আর কখনো উচ্চকণ্ঠ হবো না। বায়যাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর ও হজরত আবু বকর উভয়েই যখন এভাবে শপথ করেছিলেন, তখন অবতীর্ণ হয়— 'ইন্নাল্লাজীনা ইয়াগুদ্‌দূনা আসওয়াতাহুম ইনদা

রসূলুল্লাহি উলাইকাল্লাজী নামতাহানাল্লাহু কুলূবাহুম লিত্তাক্ওয়া লাহুম মাগফিরাতুওঁ ওয়া আজরুন আজীম' (যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার")(৪৯ঃ৩)।

বর্ণিত হয়েছে, ওই ঘটনার পর থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন রসুলেপাক স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে বসতেন, তখন তিনি মুখে পাথর পুরে রাখতেন, যাতে জোরে কথা বলতে অসুবিধা হয়। আরও বর্ণিত হয়েছে, ওই পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর হজরত ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামাস যিনি স্বাভাবিকভাবেই জোরে কথা বলতেন, তিনি ঘর থেকে আর বের হতেন না। রসুল স. এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে জোরে কথা বললে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই ছিলো তার আশংকা। রসুলেপাক স. তাঁকে দেখতে না পেয়ে বললেন, ছাবেত ইবনে কায়স আসে না কেনো? এরকম কথা যখন তাঁর কানে গেলো তখন তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার উপর আয়াত নাযিল হয়েছে। আর আমার আওয়াজও উচ্চ। আশংকা করছি, না জানি আমার আমলসমূহ বাতিল হয়ে যায়। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ওই শাসনের অন্তর্ভূত নও। তুমি কল্যাণের সাথে জীবিত থাকবে, কল্যাণের সাথেই দুনিয়া থেকে প্রস্থান করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে।

বিঃ দ্রঃ বনী তামীম গোত্রের এহেন রূঢ়তা এবং মূর্খজনোচিত অহংকার ছিলো তাদের জন্মস্বভাব। সহীহ্ বোখারী শরীফে হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, বনী তামীমের একটি দল রসুলেপাক স.এর কাছে আগমন করেছিলো। তিনি তাদেরকে দেখে বললেন, হে বনী তামীম! তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। অতঃপর রসুলেপাক স. তাদেরকে আকায়েদ সংক্রান্ত মৌলিক শিক্ষা দিলেন। দিলেন দুনিয়ার ও পরবর্তী জগতের সংবাদ। বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো, সুসংবাদ তো আপনি দিয়েছেন। এখন আমাদেরকে কিছু সহায়-সম্পদ দিন। আমরা তো আপনার কাছে সুসংবাদ শোনার জন্য আসিনি। আমরা এসেছি আপনার কাছ থেকে সহায়-সম্পদ পাওয়ার আশায়। সুসংবাদ তো তার নিজ স্থানে থাকবেই। কিন্তু এখন আমাদের প্রয়োজন সম্পদ। তাদের এহেন কথা শুনে রসুলেপাক স. অতুষ্ট হলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলেও প্রতিফলিত হলো অতুষ্টির ছায়া। এমন সময় ইয়ামন থেকে আশআরীদের একটি দল রসুলেপাক স. এর নিকট আগমন করলেন। তাঁরা ছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরীর বংশের লোক। রসুলেপাক স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আশআরীগণ! তোমরা ওই সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা বনী তামীমের লোকেরা গ্রহণ করেনি। আশআরীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল!

আমরা গ্রহণ করলাম। হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি বনী তামীমদেরকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে পছন্দ করি, যেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রসুলেপাক স.। তিনি বলেছেন, ১. বনী তামীম দাজ্জালের প্রতি কঠোরতম হবে। ওই সময় তাদের ওই কঠোরতাই হবে উত্তম আমল। ২. উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে বনী তামীমের একজন বাঁদী ছিলো। ওই বাঁদীকে তিনি পেয়েছিলেন উয়ায়না ইবনে হুসায়নের অভিযান থেকে। রসুলেপাক স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.কে বলেছিলেন, ওকে আযাদ করে দাও। ও হচ্ছে নবী ইসমাইলের বংশধর। ৩. বনী তামীমের সদকা ও জাকাতের মাল যখন আনা হলো, তখন রসুলেপাক স. বললেন, এ সদকাসমূহ আমার কাওমের। একথা দ্বারা তিনি বনী তামীমকে তাঁর আপন জন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এভাবে তিনি তাদের মনোতুষ্টি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। কেননা তারা ছিলো ওই সম্প্রদায়, যারা বনী কাআবকে জাকাত আদায় করতে নিষেধ করেছিলো। অথচ তারাই পরে স্বেচ্ছায় তাদের নিজেদের জাকাত দিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে ইমান তাদের অন্তরে শিকড় গাড়তে শুরু করেছে। সভ্যতার ও ভদ্রতার প্রভাব তাদের আচরণে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে কিছুটা ধীরগতিতে। উয়ায়না ইবনে হুসায়ন নামক অভিযানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যার নামে এ অভিযানের নামকরণ হয়েছিলো সে ছিলো খুবই রুক্ষ স্বভাবের। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, একবার সে রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলো। রসুলেপাক স. অনুমতি দিলেন। সে ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির। সে যখন ভিতরে প্রবেশ করলো, তখন রসুলেপাক স. তাকে সহাস্যে স্বাগত জানালেন। তার চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, আপনি তো বলেছিলেন, লোকটা ভালো নয়। অথচ তার সাথে আপনজনের মতো আচরণ করলেন যে। রসুলেপাক স. বললেন, মানুষের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট, যাকে মানুষেরা অশ্লীল ও রূঢ় স্বভাবের জন্য বর্জন করে, অথবা এড়িয়ে চলে।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, উয়ায়না ইবনে হুসায়ন রূঢ়স্বভাবসম্পন্ন ছিলো ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। একবার উয়ায়না ইবনে হুসায়ন তার ভাতিজার মাধ্যমে হজরত ওমর ফারুকের কাছে এলো। তার ভাতিজার নাম ছিলো ইবনে কায়স ইবনে হুসায়ন। তিনি ছিলেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকটজন এবং একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। উয়ায়না বললো, হে ওমর! আপনি তো আমাকে কোনো মাল দেন না। আপনি আমার প্রতি ইনসাফ করেন না। একথা শুনে হজরত ওমর রাগান্বিত হলেন। তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। তখন হুর ইবনে কায়স পাঠ করলেন— 'খুজ্‌ইল আফওয়া ওয়া'মুর বিল মা'রূফ আ'রিদ আনিল জাহিলীন' (এ লোক মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত, একে ক্ষমা করুন)। এদের বাহ্যিক অবস্থা তো এরকম,

তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন। যদি তাদের ইমানদার হওয়ার প্রমাণ থাকে, তবে তাঁরা হবেন সাহাবীগণের পর্যায়ভূত। এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এ বৎসর হজরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা কুরাশী উমুব্বীকে বনিল মুস্তালিক গোত্রের কাছে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি ছিলেন হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানের অন্য মায়ের পক্ষের ভাই। তাঁর মাতা ছিলেন রসুলেপাক স. এর ফুফাতো বোন। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জাহেলী যুগ থেকেই ওয়ালীদ ও বনিল মুস্তালিক গোত্রের মধ্যে শত্রুতা ছিলো। তারা যখন শুনতে পেলো, হজরত ওয়ালীদ রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে জাকাত আদায়কারী হয়ে আসছেন, তখন পূর্বের শত্রুতা ভুলে গিয়ে রসুল স. এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের বিশজন লোক তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে এলো। হজরত ওয়ালীদ দূর থেকে তাদেরকে দেখতে পেলেন। শয়তান তাঁকে পুরনো শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। তাঁর মনে হলো, লোকগুলো তাকে কতল করার জন্য এগিয়ে আসছে। তিনি সেখান থেকেই ফিরে রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করলেন, তারা সৈন্য-বাহিনী সাজিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছে। এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তারা মুর্তাদ হয়ে গিয়েছে এবং সৈন্য সংগ্রহ করছে। একথা শুনে রসুলেপাক স. সেনাসমাবেশ ঘটালেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন। ইতোমধ্যে তারা মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. এর সামনে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে একটি জামাতের সাথে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন, তাঁরা যেনো সাবধানতার সাথে তাদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন, তারা আজান দিয়ে নামাজ আদায় করছে, মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং ইসলামের অন্যান্য শেআরসমূহের উপর আমল করছে। এসব দেখে তিনি ফিরে এলেন এবং সবকিছু রসুলেপাক স. এর নিকট বর্ণনা করলেন। প্রমাণিত হলো, হজরত ওয়ালীদ ভুল সংবাদ দিয়েছেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত—'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানূ ইন জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইম ফাতাবায়্যানূ আনতুসীবু কাওমাম বিজাহালাতিন ফাতুসবিহু আলা মা ফাআলতুম নাদিমীন' (হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়)(৪৯:৬)। রসুলেপাক স. বললেন— 'আত্তানী মিনাল্লাহী ওয়াল উজলাতু মিনাশ শাইত্বানি' (ধীরস্থিরতা আল্লাহ্তায়ালার তরফ

থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের তরফ থেকে)। অপর বর্ণনায় আছে— 'আত্তানী মিনার রহমানী ওয়াল উজলাতু মিনাশ শাইত্বান' (ধীরস্থিরতা রহমানের পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে)। ওয়ালীদ ইবনে উকবা যে মিথ্যা বলেছিলেন, তাই তাঁর ফিসক ছিলো। আর বুহতাল ছিলো ক্ষতি ও ফাসাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা যেনো একটি গায়েবী খবরের দিকে ইশারা করছে। সেটি হচ্ছে ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান কুফার গভর্নর বানিয়েছিলেন। এক সময় তিনি শরাব পান করে ফেললেন। অতঃপর তাঁকে শরীয়তের বিচারের সম্মুখীন হতে হলো। সহীহ বোখারী শরীফে এসেছে, আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলী তাঁর উপর হদ জারী করেছিলেন।

উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুলেপাক স. উক্ত কাওমের প্রতি মনযোগ দিলেন এবং হজরত উব্বাদ ইবনে বিশর আনসারীকে তাদের জন্য নিযুক্ত করলেন। তিনি বনী তামীম কাওমের নিকট থেকে জাকাত আদায় করলেন এবং তাদেরকে কোরআন ও শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিলেন।

এ বৎসর রসুলেপাক স. কুতবা ইবনে আমের ইবনে হাদীদাকে বিশ ব্যক্তি সহকারে খাশআম কবীলার দিকে প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি সেখানে গেলেন। প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হলো। উভয় পক্ষেই বেশ হতাহত হলো। অবশেষে তাদের উট, বকরী ও নারীদেরকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হলো। এসমস্ত গনিমতের মধ্যে এক পঞ্চমাংশের বিধান জারী করার পর মাল বণ্টন করা হলো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি চারটি করে উট লাভ করলেন। তার সাথে পেলেন দশটি করে বকরী।

তারপর যাহহাক ইবনে সুফিয়ান ইবনে আওফ কেলাবী আমেরীকে প্রস্তুত করা হলো। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর। তাঁর সহযাত্রী হিসাবে একশ'জন আরোহীর ব্যবস্থা করা হলো। আরোহীরা ছিলেন ওই সকল বীর যোদ্ধা, যারা যুদ্ধকালীন অবস্থায় তরবারী নিয়ে রসুলেপাক স. এর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাদেরকে বনী কেলাব গোত্রের সকল লোকের কাছে পাঠানো হলো, যারা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাঁরা সেখানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল করলো না। ফলে তাঁরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে পরাজিত করলেন। সেখান থেকে অনেক গনিমত লাভ করে তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বৎসর রবিউস্সানী মাসে আলকামা ইবনে মুজদিয ইবনে সুবরা মুদলাজীকে তিনশ' লোকের আমীর বানিয়ে হাবশাবাসীদের ওই সকল লোকের বিরুদ্ধে পাঠানো হলো, যারা জেদ্দায় পৌঁছে ফাসাদ সৃষ্টি করে চলেছিলো। হজরত আলকামা ওই জাযিরায় এসে থামলেন, যেখানে তারা অবস্থান করছিলো। তারা

হজরত আলকামাকে দেখা মাত্রই সেখান থেকে পলায়ন করলো। তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ খুব তাড়াহুড়া করে আপন পরিবার-পরিজনের কাছে চলে গেলেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী ছিলেন তাদের একজন। হজরত আলকামা তাড়াহুড়া করে প্রত্যাবর্তনকারীদের আমীর নিযুক্ত করলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাকে। তিনি ছিলেন রসিকতাপ্রিয়। এক রাতে তিনি আপন মঞ্জিলে তাঁবু খাটালেন এবং শীত থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালালেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন হুযাফা রসিকতা করে তাঁর সাথীদেরকে হুকুম দিলেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তারা যখন আপন আমীরের হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি তাদেরকে বারণ করে বললেন, থামো। আমি তো তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছিলাম। তাঁরা মদীনায় ফিরে এসে রসুলেপাক স. এর কাছে এই ঘটনার কথা জানালেন। তিনি স. বললেন, তোমাদেরকে যদি কেউ গোনাহ্ ও নাফরমানি কাজের হুকুম দেয়, তাহলে তার আনুগত্য কোরো না। 'রওযাতুল আহবাব' ও 'মাওয়াহেব' কিতাবে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাওয়াহেব' কিতাবে বলা হয়েছে, ঘটনাটি হাকেম ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হেব্বান হজরত আবু সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণনাটিকে সহীহ্ বলেছেন। অতঃপর তিনি তা হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যোদ্ধাদেরকে হুকুম করেন, সেনাপতির হুকুম অবশ্যই পালন করতে হবে। এই বলে রসুলেপাক স. বাহিনীটি প্রেরণ করলেন। পরে কোনো এক অবস্থায় সেনাপতি অন্যান্য যোদ্ধাদের উপর কোনো এক কারণে রাগান্বিত হলেন এবং তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা লাকড়ি জমা করো। যোদ্ধাগণ লাকড়ি জমা করলেন। সেনাপতি বললেন, আগুন জ্বালাও। তাঁরা লাকড়িগুলোতে আগুন লাগালেন। সেনাপতি বললেন, এখন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। আবার কেউ কেউ প্রকাশ করলেন অনীহা। বললেন, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রসুলেপাক স. এর কাছে আশ্রয় নিয়েছি। এখন আমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বো কেনো। অর্থাৎ আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ইমান গ্রহণ করেছি। এখন আমরা আগুনকে আমন্ত্রণ জানাবো কেনো? বাদানুবাদ চলতেই লাগলো। ইতোমধ্যে আগুন গেলো নিভে। ততোক্ষণে সেনাপতির রাগও হয়ে গেলো ঠাণ্ডা। এই সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি স. বললেন, তারা যদি আগুনে প্রবেশ করতো, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সে আগুন থেকে বের হতে পারতো না। আমীরের আনুগত্য করতে হবে বন্দেগীর ক্ষেত্রে, নাফরমানীর ক্ষেত্রে নয়।

বোখারীর বর্ণনা ও জীবনীলেখকগণের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। জীবনীলেখকগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে হজরত আলকামাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিলে। আর তিনি তাড়াহুড়াকারী লোকগুলোর দলপতি নিযুক্ত করেছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাকে। কিন্তু বোখারীর বর্ণনাতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়কেই অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন রসুলেপাক স. স্বয়ং। এমতো মতভেদের সমাধান অবশ্য খুবই সহজ। কেননা এক্ষেত্রে এরূপ বলা যায়, হজরত আলকামাকে আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন রসুলেপাক স.। আর তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন পরে। সুতরাং সাব্যস্ত হয় যে, পরোক্ষভাবে রসুলেপাক স.উভয়কে নিয়োজিত করেছেন। উভয়ই তাঁর মারফত প্রেরিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আরেকটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে ইমাম বোখারীর 'সারিয়ায়ে আনসার' বা 'সারিয়ায়ে আনসারী' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার থেকে। তিনি আনসারী বা আনসারদের অভিযান বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। কেননা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা আনসারী ছিলেন না। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতি থেকে উল্লেখ করেছেন, বোখারী বলেছেন, আনসারী অভিযানের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে অবশ্য একথার দ্বারা ওই অভিযানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা বর্ণনার বাচনভঙ্গি ও 'আমীর' শব্দের উল্লেখের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পলিক্ষিত হয়। আর ও দু'টোর মধ্যে ভাবার্থ করাটাও কঠিন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী কুরাশী ছিলেন মুহাজির। অথচ তাঁকে বলা হয়েছে আনসার। দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানেই। দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে এরকম বলারও সুযোগ রয়েছে যে, রসুলেপাক স. এর সাহায্যকারী হিসেবে হয়তো তাঁকে 'আনসার' বলা হয়ে থাকতে পারে। ইবনে কাইয়্যিমের মতে, এখানে ঘটেছে বিভিন্ন ঘটনার সংমিশ্রণ। ইবনে জওযী বলেছেন, হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখিত 'মিনাল আনসার' কথাটি কোনো না কোনো বর্ণনাকারীর নিজস্ব সংযোজন। 'ফাতহুলবারী' কিতাবে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা যে আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ তায়ালা বলেন 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানূ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম' (হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রসুলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী)(৪ঃ৫৯)। এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আদী সম্পর্কে, যাঁকে রসুলেপাক স. তাঁর লশকরের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এ বৎসর রবিউস্সানী মাসে রসুলেপাক স. হজরত আলীকে বনী তাঈ কবীলার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে একটি বড়

মূর্তিমণ্ডপ ছিলো। হজরত আলী'র সাথে দেড়শ' উষ্ট্রারোহী আনসারী যোদ্ধা ছিলেন। আর আবু সা'আদের সঙ্গে আরও দু'শ জন। হজরত আলী সেখানে পৌঁছে সেখানকার মূর্তিটি ভেঙে ফেললেন এবং সেটির পূজকদের লোকালয় ধ্বংস করে দিলেন। উৎখাত করলেন। বহুসংখ্যক উট বকরী গনিমত হিসেবে লাভ করলেন এবং তা থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে যোদ্ধাগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করলেন। হাতেমের বংশধরদেরকেও গোলাম হিসেবে বণ্টন করা হলো। অতঃপর হজরত আলী মদীনায় ফিরলেন। আদী ইবনে হাতেম ছিলো বনী তাঈ গোত্রের সরদার। সে পালিয়ে শামদেশে চলে গেলো। তার ভগ্নি সুকানা বিনতে হাতেম বন্দিনী হলো। একদিন রসুলেপাক স. ঐ বন্দীশালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতেমের বংশধরেরাও সেখানে আবদ্ধ ছিলো। হাতেমের কন্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। বিশুদ্ধভাষিণীও ছিলেন তিনি। রসুলেপাক স.কে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং আমার ভাই নিখোঁজ। আমার উপর দয়া করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার উপর করুণা করবেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায়কারী কে হবে? হাতেম তনয়া বললেন, আমার ভাই আদী ইবনে হাতেম। রসুলেপাক স. বললেন, সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এ কথা বলে রসুলেপাক স. সেখান থেকে চলে গেলেন। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, দ্বিতীয় দিনও তিনি স. সেখান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সুকানা বলেন, দ্বিতীয়দিনেও রসুলুল্লাহ্ স.কে আমার কথাগুলো বললাম। সেদিনও আমি উত্তর পেলাম পূর্বের মতো। তৃতীয় দিন রসুলেপাক স. আমার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হলেন এবং ছওয়ারী ও সফরের খরচ দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর আমি শামদেশে চলে গেলাম এবং আমার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলাম। রসুলেপাক স. তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে। কথাটি আমি তাঁকে জানালাম। রসুলেপাক স. এর এরকম কথা শুনে তাঁর অন্তরে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন, সত্যিই তো! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছ থেকে পালিয়ে আমি যাবো কোথায়? তিনি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তাঁর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ দশম হিজরীর ঘটনাবলীতে। নবম হিজরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর তায়েফ থেকে ফিরে আসা এবং তবুকের যুদ্ধের মধ্যবর্তী কাআব ইবনে যুহায়ের ইবনে কাআবের ঘটনা। রসুলেপাক স. এর নামে নিন্দা রটনা করার অপরাধে যাদের রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে শামিল ছিলো ইবনে যাবআরী এবং হুবায়রা ইবনে আবী ওয়াহাব। ওই একই অপরাধে কাআব ইবনে যুহায়েরের রক্তপাতও বৈধ করা হয়েছিলো। সে কারণে

এরকম অনেক লোক পালিয়ে গিয়েছিলো। কাআব ইবনে যুহায়েরও পালিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে গত্যন্তর না দেখে তিনি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি চাইলেন তাঁর ভাই বুহায়ের ইবনে সুহায়েরের সঙ্গে দেখা করে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাদিয়া দিতে। বুহায়েরও ছিলেন কবি। তবে তিনি উক্ত অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। কাআব ইবনে যুহায়েরের বাসনা শুনে তাঁর ভাই বুহায়ের বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। আমি রসুলুল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে আগে তাঁর কথা শুনি এবং তাঁর মনোভাব সম্পর্কে আন্দাজ করে নেই। বুহায়ের রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সৌন্দর্য অবলোকন করলেন। তাঁর কথাবার্তা শুনলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, কবি কাআবের পিতা যুহায়ের আহলে কিতাবদের কাছে বসতো এবং তাদের কাছ থেকে এইমর্মে বর্ণনা শুনতো যে, শেষ জামানার নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলো আকাশ থেকে একটি লম্বা রশি নেমে এসেছে। ওই ঝুলন্ত রশিটিকে ধরবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু নাগালে পেলো না। পরে সে তার পুত্রকে এই মর্মে অসিয়ত করে গেলো যে, শেষ জামানার নবীর দেখা পেলে তুমি অবশ্যই তাঁর উপর ইমান আনয়ন কোরো।

রসুলেপাক স. তায়েফ থেকে ফিরে এসে চিঠি লিখলেন বুহায়ের কাআব ইবনে যুহায়েরের নিকট। পত্রের বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— কাআব এখন কী করতে চান? তাঁর অন্তরের অভিপ্রায় কী? রসুলুল্লাহ্‌র দরবারে এসে হাজির হয়ে তওবা করলে, মাফ চাইলে, তিনি তার তওবা কবুল করবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে নিরাশ করেন না। আরো জানালেন, এখন তোমার ইচ্ছা। তুমি যদি এরকম করতে না চাও, তাহলে তোমার ভালো তোমাকেই দেখতে হবে। ওদিকে বুহায়েরের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে কাআব ইবনে যুহায়েরের নিকট কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখে জানালেন, মোহাম্মদের নাগালে এলে তুমি কতল হয়ে যাবে, এরকম যদি কেউ বলে তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী মনে কোরো। এরকম ভয়ভীতির কারণেই কাআব তওবা করতে বিলম্ব করছিলেন। বুহায়েরের পত্র পাওয়ার পর কাআব ইবনে যুহায়েরের নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলো। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করলেন। যার মাধ্যমে তিনি তার মনের বাসনা, ভয়-ভীতি এবং দুশমনদের অকল্যাণ কামনার বিষয়গুলো ফুটিয়ে তুললেন। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করলেন এবং কবীলা জুহায়নায় তাঁর এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিলেন। তাঁর সেই বন্ধুটিই তাঁকে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিয়ে গেলো। পরিচয় করিয়ে

দিয়ে বললো, ইনিই আল্লাহ্‌র রসুল। অগ্রসর হও। তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কাআব রসুলুল্লাহ্ স. এর সামনে এগিয়ে গেলেন। হস্তদ্বয় বাড়িয়ে রসুলেপাক স. এর পবিত্র হস্তে স্থাপন করলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। হজরত কাআব বললেন, সুহায়েরের পুত্র কাআব তওবা করে মুসলমান হয়ে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিরাপত্তাপ্রত্যাশী হয়ে এসেছে। তার তওবা ও ইসলাম দয়া করে কি গ্রহণ করা হবে? রসুলেপাক স. বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমিই কাআব। রসুলেপাক স. বললেন, তুমিই কাআব ইবনে যুহায়ের? এমন সময় সেখানে উপস্থিত জনৈক আনসার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে অনুমতি দিন আল্লাহ্‌র এই দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসুলেপাক স. বললেন, তাকে কিছু বোলো না। সে তো তওবা করার উদ্দেশ্যে এসেছে। যেহেতু মুহাজিরদের মধ্য থেকে তাঁর ভাই বুহায়ের ব্যতীত অন্য কেউই তাঁকে কিছু বলেননি, তাই কাআব ওই আনসারী ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হলেন। তারপর রসুলেপাক স. এর প্রশংসায় একটি কাসীদা পাঠ করলেন। এভাবে—

“নাবাআত আন্না রসূলাল্লাহি আও আদনী
ওয়ালআ’ফুউ ইনদা রসূলুল্লাহি মা’মূলি
লা তা’খুজুনী বিআকওয়ালিল ওয়াছাক
ওয়ালাম আজনাব ওয়ালাও কাছরাত ফীল আকাইল
আন্নার রসূলা নূরুল লিইয়াসতাদাউ বিহি
মুহান্নাদ মিন সূয়ূফিল্লাহি মাসলূল”

অর্থঃ আমাকে এই মর্মে সংবাদ জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে শাসিয়েছেন। অথচ রসুলুল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাই কাম্য। বাচালদের কথায় আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমি কোনো গোনাহ্ করিনি, যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়। নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ্ এমন এক আলো, যার দ্বারা আলোকিত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্‌র কোষমুক্ত ভারতীয় তরবারী।

কাআব ইবনে যুহায়েরের মুখ থেকে কবিতা আবৃত্তি শুনে রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, শোনো ও কী বলে। রসুলেপাক স. উত্তম কবিতা পছন্দ করতেন, যদিও তিনি নিজে কবিতা আবৃত্তি করতেন না। তিনি তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা পছন্দ করতেন। কেননা নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যের প্রতিভূ। কাআব ইবনে যুহায়েরের কবিতা আবৃত্তি শুনে তিনি স. আনন্দিত হলেন। তাঁর নিজের শরীরে জড়িত চাদরখানা খুলে কাআব ইবনে যুহায়েরকে দান করলেন।

জীবনীকারগণ বলেছেন, হজরত আমীর মুআবিয়া রা. কাআব ইবনে যুহায়ের রা.কে ওই পবিত্র চাদরের বিনিময়ে দশহাজার দেরহাম দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাআব রাজী হননি। বলেছিলেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র উত্তরীয় কাউকেই দিতে পারি না। হজরত কাআবের মৃত্যুর পর হজরত আমীর মুআবিয়া তাঁর ওয়ারিশদের কাছ থেকে বিশহাজার দেরহামের বিনিময়ে ওই চাদরখানি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনীকারগণ বলেন, ওই চাদরখানা এখন পর্যন্ত (কিতাব রচনাকালে) বিভিন্ন বাদশাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত আছে।

ইলার ঘটনা

এ বৎসর রসুলেপাক স. আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের (রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের) সঙ্গে এক মাস পর্যন্ত ইলা করেছিলেন। অর্থাৎ পৃথক থেকে ছিলেন। 'ইলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ শপথ করা। ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের নিকট ইলার সংজ্ঞা এরকম— কোনো স্বামীর চারমাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়ার কসম করাকে ইলা বলে। বিধান হচ্ছে— এরূপ কসম করার পর চার মাস পর্যন্ত উক্ত স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। বিরত থাকবে সহবাস-সঙ্গম থেকে। যেমন কালামে পাকে এসেছে— 'ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু লিমা তুহাররিমু মাআহাল্লাল্লাহু লাকা তাবতাগী মারদাতা আযওয়াযিকা' (হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন, তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ) (৬৬:১)। যারা আপন স্ত্রীর সঙ্গে ইলা ও কসম করে, তারা চার মাস পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে, তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আর এ কাফ্‌ফারা হচ্ছে স্বামী যা নিজের উপর আবশ্যক করলো, তার বদলা। যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো, আমি যদি চার মাসের মধ্যে তোমার নিকটবর্তী হই তাহলে আমার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। এখন চার মাস যদি অতিবাহিত হয়ে যায়, আর সে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয়, তাহলে ইমাম আযম ও তাঁর সাথীগণের নিকট বাইন তালাক পতিত হয়ে যাবে। হজরত সুফিয়ান সওরী ও অন্যান্য উলামা কেরামের মাযহাবও অনুরূপ। ইমাম আযম ছাড়া অন্য তিন ইমামের মতে চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তালাক পতিত হবে না। বরং তখন স্বামীটিকে আবদ্ধ করে তাকে বাধ্য করতে হবে। হয় সে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, না হয় কাফ্‌ফারা আদায় করবে। অন্যথায় তালাক দিয়ে দিবে। সে যদি তালাক না দেয়, তাহলে বলপ্রয়োগ করে তার কাছ থেকে এক তালাক নিয়ে নিতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। তবে রসুলেপাক স. এর ইলাটি ছিলো ভিন্নধর্মী। তিনি এক মাস স্ত্রীগণের নিকটবর্তী

হবেন না বলে শপথ করেছিলেন। আর তার কারণ ছিলো এইরূপ— রসুলেপাক স. আপন স্ত্রীগণের কাছ থেকে কিছু অসুন্দর আচরণ লক্ষ্য করলেন, যা তাঁকে চিন্তিত করলো। তখন তিনি স. কসম করলেন, এক মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকটবর্তী হবেন না। রসুলেপাক স. এরকম আমলের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীগণকে মানসিক শাস্তি দিতে চাইলেন, যাতে করে তাঁরা আপন আপন কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হন। ইলার ঘটনাটি বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'রওযাতুল আহবাব' কিতাবে। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তার কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হলো। ১. আযওয়াজে মুতাহ্হারাত রসুলেপাক স. এর নিকট অধিক খোরপোষ দাবী করলেন। তাছাড়া তাঁরা এমন কিছুর দাবী করলেন যা তাঁর কাছে তখন ছিলো না। তাই তিনি স. চিন্তান্বিত হলেন এবং কসম করলেন। ২. কোনো একজন স্ত্রীর গৃহে রসুলেপাক স. মধুপান করলেন। এর ফলে অন্যান্য স্ত্রীগণের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হলো। তাঁরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মাগাফীর এক প্রকারের গন্ধযুক্ত আটা। তাঁদের কথা শুনে তিনি স. নিজের জন্য মধুপান করা হারাম করে দিলেন। ৩. হজরত হাফসাকে একবার তাঁর প্রকোষ্ঠে অনুপস্থিত পেয়ে রসুলেপাক স. গেলেন হজরত মারিয়া কিবতিয়ার কাছে। তাঁর সঙ্গে রসুলুল্লাহ্‌র একান্ত বাসের কথা শুনে হজরত হাফসা ঈর্ষান্বিতা হলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। রসুলেপাক স. তখন মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এবং হজরত হাফসাকে বললেন, একথা তিনি যেনো কারো কাছে প্রকাশ না করেন। কিন্তু হজরত হাফসা একথা হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে জানালেন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'ইয়া আইয়্যুন নাবীয়্যু লিমা তুহাররিমু মা আহাল্লাল্লাহু লাকা তাবতাগী মারদাতা আজওয়াজিকা ওয়াল্লাহু গফূরুর রহীম' (হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)(৬৬ঃ১)। ইলার কারণ সম্পর্কিত উপরোক্ত বর্ণনার বিভিন্নতা প্রসঙ্গে উলামা কেরাম বলেছেন, বর্ণিত সকল ঘটনা ইলার কারণ হতে পারে। তার সামঞ্জস্যের বিষয়টি এভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, উপরোক্ত ঘটনার সব কয়টিই হয়তো রসুলেপাক স. এর বেলায় সংঘটিত হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার কারণে তিনি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। তবে তিনি সে সবগুলোর ক্ষেত্রেই ক্ষমাগুণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যখন তা সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন তিনি ইলা করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনাদৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যখনই তিনি স. মনোকষ্ট পেয়েছেন তখনই ইলা করেছেন। এতে করে মনে হতে পারে, বহুবার ইলা সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু

প্রকৃত অবস্থা এরকম নয়। ইলা একবারই সংঘটিত হয়েছিলো। কেননা ইলার অর্থ কসম করা। কোনো ব্যক্তি যদি একই কারণে একাধিক কসম করে, তাহলে সে কসম ভঙ্গ করার কারণে একটি কাফ্ফারাই কার্যকর হবে।

যা হোক, রসুলেপাক স. ইলার কসম করার পর আপন স্ত্রীগণ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে নিজেকে পৃথক করে রাখলেন। রেবাহ্ নামক একজন হাবশী গোলামকে দরজায় মোতায়েন করে দিলেন। তাকে বললেন, বিনা অনুমতিতে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। এদিকে সারা শহর জুড়ে রটনা হয়ে গেলো, নবী করীম স. তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। সাহাবীগণের মধ্য থেকে যারা এ সংবাদ শুনতে পেলেন, তাঁরা এসে জড়ো হলেন মসজিদে। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, আমি যখন সংবাদটি শুনলাম তখন আমিও উপস্থিত হলাম মসজিদে নববীতে। দেখলাম সেখানে সাহাবীগণের একটি দল রসুলুল্লাহ্র প্রকোষ্ঠের সামনে বসে ক্রন্দন করছে। আমি রেবাহ্কে বললাম, আমার জন্য রসুলেপাক স. এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করো। সে ভিতরে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, আমি আপনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। হজরত ওমর বলেন, কয়েকবার আমি এরকম করেছি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে রেবাহ্কে উচ্চকণ্ঠে বললাম, হে রেবাহ্! যাও এবং আমার জন্য রসুলেপাক স. এর নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি চাও। রসুলেপাক স. সম্ভবতঃ এ ধারণা করেছিলেন যে, আমি এসেছি আমার কন্যা হাফসার ব্যাপারে সুপারিশ করতে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমার মনোভাব ছিলো রসুলেপাক স. যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। তাঁর হুকুম পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হবে না। আমি কথাগুলো বলে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রেবাহ্'র কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছে, হে ওমর! আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। তারপর আমি মসজিদে ফিরে এলাম এবং সাহাবীগণকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের ধারণা ভুল। আমি তখন রসুলেপাক স. এর সামনে নারীদের সম্পর্কে কিছু কথা বললাম। তিনি তা শুনে খুঁশি হলেন। এক পর্যায়ে হেসে ফেললেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক একদিন রসুলুল্লাহ্ স. এর ঘরের দরজায় এসে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি দেখতে পেলেন সেখানে আগে থেকেই অনেক সাহাবী সমবেত হয়েছেন। কিন্তু কেউই ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি পাচ্ছেন না। আলহামদুলিল্লাহ্। হজরত আবু বকর সিদ্দীক অনুমতি পেলেন।

হাজির হলেন হজরত ওমর ফারুক। তিনিও অনুমতি পেলেন। তিনি গৃহভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন রসুলেপাক স. অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় বসে আছেন। তিনি রসুলেপাক স. এর মনোকষ্টের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এই— যারা আমার পাশে বসে আছে, একথা বলে তাঁর স্ত্রীগণের দিকে ইশারা করলেন। বললেন, তারা আমার কাছে অনেক দাবী দাওয়া পেশ করেছে। তারা এমন কিছু চায়, যা আমার কাছে নেই। হজরত ওমর ফারুক নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্ত্রী খারেজার কন্যা আমার সঙ্গে এরকম করলে আপনি দেখতেন, আমি তার কণ্ঠনালী চেপে ধরতাম। তাঁর কথা শুনে রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কন্যা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাঁধে দু'টি চপেটাঘাত করলেন। হজরত ওমরও তাঁর কন্যা হজরত হাফসার কাঁধে দু'টি চপেটাঘাত করলেন। রসুলেপাক স. এবারও মৃদু হাসলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা যখন মক্কায় ছিলাম তখন আমরা আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলতাম। কিন্তু মদীনায় দেখছি, এখানকার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলে। এদের দেখাদেখি আমাদের স্ত্রীদের স্বভাবও এরকম হয়ে গিয়েছে। তারা মদীনার মেয়েদের স্বভাব গ্রহণ করেছে। হজরত ওমর ফারুক আরও বললেন, একদিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা বললাম। সেও আমার সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলো। আমি তার এরকম ব্যবহারে অতুষ্ট হলাম। বললাম, তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলছো কেনো? সে বললো, কেনো বলবো না? এখন আরও দেখছি রসুলুল্লাহ্ স. এর স্ত্রীগণও তাঁর সঙ্গে এরূপ আচরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ্ স. তখন বললেন, তোমার কন্যা হাফসাও তো এরকম করে। কখনো কখনো তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। সারারাত রাগ করে থাকে। আমি বললাম, হাফসা যদি এরকম করে, তবে সে নিরাশ ও বঞ্চিত হবে। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে মনে হয় রসুলেপাক স. তখন ইলা করে স্ত্রীগণ থেকে পৃথক হয়ে পৃথক গৃহে অবস্থান করেছিলেন তাঁর স্ত্রীগণ কর্তৃক উত্যক্ত হওয়ার কারণে।

হজরত ওমর ফারুক থেকে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি রসুলেপাক স. এর কাছে অনুমতি নিয়ে তাঁর পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি মোটা কাপড়ের লুঙ্গি পরিধান করে খালি গায়ে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর পবিত্র শরীরে দৃষ্ট হচ্ছে চাটাইয়ের দাগ। শিয়রে আছে একটি চামড়ার বালিশ, যার ভিতরে রয়েছে খেজুর গাছের ছাল। পায়ের দিকে ছলম গাছের পাতা বিছানো আছে। ঘরে রয়েছে কেবল এক সা যব আর গরম পানির একটি কলসী। দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে কয়েক টুকরা অপরিপক্ক চামড়া। আমি তাঁর এরকম অবস্থা দেখে প্রথমে নির্বাক হয়ে গেলাম। তারপর

কাঁদতে লাগলাম। রসুলেপাক স. বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! কাঁদছো কেনো? আমি নিবেদন করলাম, কাঁদবো না কেনো? আপনার দুঃখ আমি যে সহ্য করতে পারছি না। রোম ও পারস্যের বাদশাহ্রা সত্যপ্রত্যাখানকারী ও সীমালংঘনকারী হওয়া সত্ত্বেও বাগ-বাগিচা ও নহরের মধ্যে কতো আরাম আয়েশে জীবন যাপন করে যাচ্ছে। আর আপনি আল্লাহ্র রসুল হওয়া সত্ত্বেও এতো কাঠিন্য ও কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করে চলছেন। দোয়া করুন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো আপনার ও আপনার উম্মতের জীবনযাপনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! খেয়াল করো, তুমি কোথায় আছো, আর কোথাকার কাদের কথা বলে যাচ্ছো? ওরা তো ওই সকল লোক যাদেরকে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে আখেরাতে। আমি বললাম, আল্লাহ্কে প্রভুপালক, ইসলামকে ধর্ম এবং মোহাম্মদকে রসুল হিসেবে পেয়ে আমি পরিতুষ্ট।

রসুলেপাক স. পূর্ণ একমাস তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে পৃথক বাস করেছিলেন। মাসটি ছিলো ঊনত্রিশ দিনের। অতঃপর ইলা সাঙ্গ করে তিনি সর্বপ্রথম গেলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো পণ করেছিলেন, এক মাস পর্যন্ত আমাদের নিকটবর্তী হবেন না। তখন থেকে আমি দিন গুণে যাচ্ছি। আজ তো ঊনত্রিশ দিন হলো। তিনি স. বললেন, জানো না কোনো কোনো মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। যেমন এই মাসটি হলো।

হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদিসখানি দৃষ্টে বোঝা যায় যে, ওই সময় অভাব অনটন ছিলো প্রবল। তাই স্বামীগণ তাঁদের স্ত্রীগণের সকল চাহিদা সব সময় পূরণ করতে পারতেন না। সে কারণে স্বামীরা দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়তেন। ইলার সূত্রপাতও ঘটেছিলো সেকারণেই। এরপর এখতিয়ার সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এভাবে— 'ইয়া আইয়্যুন নাবীয়্যু কুল লিআযওয়াযিকা ইন কুনতুম তুরিদ্না হাইয়াতাদ দুন্ইয়া ওয়া যীনাতাহা ফাতাআ'লাইনা উমাত্তি'কুন্না ওয়া উসারিহ্কুন্না সিরাযান জ্বামীলা ওয়া ইন কুন্না তুরিদনাল্লাহা ওয়া রসূলাহু ওয়াদ্ দারাল আখিরাতা ফাইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিল্‌মুহ্‌সিনাতি মিনকুন্না আজ্বরান আজীমা' (হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্ তাঁহার রাসুল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন)(৩৩ঃ২৮,২৯)।

ঘটনার সারকথা এই যে, সাইয়্যেদে আলম স. এর পুতঃপবিত্রা স্ত্রীগণ তাঁর কাছে পার্থিব সরঞ্জামাদি ও অধিক সুযোগ-সুবিধার আবেদন জানিয়েছিলেন; কিন্তু এরকম করা তাঁদের জন্য বৈধ ছিলো না। কারণ তাঁরা ছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর

সহধর্মিণী। তিনি স. কষ্ট পেয়েছিলেন তাঁদের ওই সাময়িক পৃথিবী প্রসক্তির কারণেই। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের ওরকম আচরণ পছন্দ করেননি। তাই তাঁদেরকে দিয়েছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর স্ত্রী হিসাবে থাকা না থাকার স্বেচ্ছাধিকার। যখন ইলার ঘটনা ঘটে তখন, রসুলেপাক স. এর স্ত্রী ছিলেন নয়জন। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিলেন কুরাইশী। তাঁরা হচ্ছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর রা, হজরত হাফসা বিনতে ওমর ফারুক রা, হজরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান, হজরত উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া এবং হজরত সাওদা বিনতে যামআ। আর চারজন ছিলেন অকুরাইশী। তাঁরা হচ্ছেন, হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ, হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব ও হজরত জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা। রসুলেপাক স. সর্বপ্রথম এই আয়াত শোনালেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে। বললেন, এ বিষয়ে কোনো তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে যা করতে চাও কোরো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, এ সম্পর্কে পরামর্শের কী আছে? আমি আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং আখেরাতকেই চাই। তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণও একই কথা বললেন।

যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স.কে গ্রহণ করলো, সে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রইলো। আর যে দুনিয়াকে চাইলো, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলো। তার দ্বীন ও দুনিয়া কোনোটি ঠিক রইলো না। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, এক মহিলা দুনিয়ার জীবনকে গ্রহণ করেছিলো। হয়েছিলো সত্যপথচ্যুত। একবার এক লোক তাকে খাদ্য সংগ্রহণার্থে রাস্তায় খেজুরের বিচি কুড়াতে দেখলো। জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? তোমার এহেন দুরাবস্থার কারণই বা কী? মেয়েটি উত্তর দিলো, 'আমি তো ওই রমণী, যে দুনিয়াকে পছন্দ করেছি'।

এখতিয়ার সংক্রান্ত আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন রসুলেপাক স. হজরত আয়েশার বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আয়েশা যদি দুনিয়াকেই গ্রহণ করে। তিনি স. হজরত আয়েশাকে ডেকে বললেন, আয়েশা! আমার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার এরকম হুকুমই হয়েছে। তবে আমি বলি, তুমি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। প্রথমে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ বিষয়ে পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করার কী আছে? আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকেই গ্রহণ করলাম। তবে একটি অনুরোধ, আমার এই সিদ্ধান্তের কথা আপনার অন্য স্ত্রীগণকে জানাবেন না। বলা বাহুল্য তাঁর এমতো কথার উদ্দেশ্য ছিলো, অন্য স্ত্রীগণ যেনো স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর কথায় প্রভাবান্বিত না হন। চিন্তাটি নারীজাতির স্বভাবজ মহব্বত ও আত্মমর্যাদাবোধজাত, অসত্য চিন্তাপ্রসূত নয়। আর 'তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা তোমার ভাইয়ের জন্যও

পছন্দ কোরো' হাদিসখানির পরিপন্থীও নয়। বিষয়টি স্বভাবজাত বলেই নারীগণ এ ব্যাপারে অক্ষম। তাই ক্ষমাপ্রাপ্ত। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. মনে করেছিলেন রসুলেপাক স. তাঁকে যেহেতু অধিক ভালোবাসেন, তাই তিনি হয়তো তাঁর অনুরোধটি রাখবেন। রসুলেপাক স. বললেন, আয়েশা! এ কেমন কথা? যদি তারা প্রশ্ন করে আয়েশা কী বলেছে? তখন আমাকে তো সত্য কথাই বলতে হবে। একথাটির মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে হজরত আয়েশার প্রতি রসুলেপাক স. এর বিশেষ আর্কষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর কথার অর্থ হচ্ছে— কেউ যদি তোমার বিষয়ে জানতে না চায়, তবে আমি কিছুই বলবো না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করে, তাহলে তো আমাকে বলতেই হবে। তিনি স. আরও বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাকে কারও উপর কঠোরতা করতে, কাউকে দুরাবস্থায় ফেলতে এবং কারও দোষ অন্বেষণ করতে প্রেরণ করেননি। কিন্তু তিনি আমাকে শিক্ষক ও সহজ সমাধানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

ছঙ্গেছারের একটি ঘটনা

এ বৎসর গামেদিয়া সুবায়ইরা নাম্নী এক মহিলার ছঙ্গেছারের ঘটনা সংঘটিত হয়। গামেদিয়া বলে এখানে গামেদ জনপদের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। গামেদ ছিলো ওই জনপদের লোকদের পূর্বপুরুষ। মহিলাটি রসুলেপাক স. এর কাছে এসে তাঁর যেনা করার কথা স্বীকার করলেন এবং তাঁর উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করার আবেদন জানালেন। রসুলেপাক স. তাঁর কথা শুনেও যেনো শুনলেন না। এটা ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাব। কারো দোষ প্রকাশিত হোক, তা তিনি চাইতেনই না। কিন্তু ওই মহিলা ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি চাই পাপমুক্ত হতে। দয়া করে আমাকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করে দিন। রসুলেপাক স. তবুও ইতস্ততঃ করলেন। ওই মহিলা তখন ছিলেন যেনার কারণে গর্ভবতী। তাই তাঁকে বললেন, গর্ভমুক্ত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। তোমার গর্ভে যে রয়েছে, সে তো নিষ্পাপ। মহিলা ফিরে গেলেন। পুনরায় এসে নিবেদন করলেন, আমি প্রস্তুত। রসুলেপাক স. বললেন, এখন তোমাকে ছঙ্গেছার করলে তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুর দেখাশোনা করবে কে? সেখানে উপস্থিত একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমি শিশুটির দুধ পান করানোর জিম্মাদার হলাম। রসুলেপাক স. তাঁর কথা শুনলেন না। ওই মহিলাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন। শিশুটির দুধপান বন্ধের বয়স যখন পেরিয়ে গেলো, তখন ওই মহিলা তাঁর সন্তানের হাতে রুটির টুকরো দিয়ে রসুলেপাক স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে আবার উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার সন্তান এখন আমার দুধ পান করে না। সে এখন রুটি খায়। সুতরাং এখন আমাকে দয়া করে বঞ্চিত

করবেন না। রসুলেপাক স. তাঁর উপর ছঙ্গেছার করার হুকুম দিলেন। তাঁকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হলো। প্রস্তরাঘাত করা হলো মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত।

জীবনীলেখকগণ বলেছেন, হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ তাঁর মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। রক্তের কিছু ছিটা লাগলো তাঁর গায়ে। ওই মহিলা সম্পর্কে কটুক্তি করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, ছিঃ! কটুক্তি কোরো না। যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র আল্লাহ্‌র শপথ! ও এমন তওবা করেছে, খেরাজ ও উশর আদায়কারী যারা জুলুম ও অতিরঞ্জিত করে খাজনা আদায় করে, তারাও যদি এরকম তওবা করে, তবুও তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তাদের গোনাহ্ এর চেয়েও বৃহৎ ও জঘন্য। ছঙ্গেছার শেষে রসুলেপাক স. তাঁর মৃতদেহকে মাটি থেকে বের করে আনার নির্দেশ দিলেন। জানাযার নামাজ পড়লেন। তারপর তাঁকে সসম্মানে দাফন করা হলো।

হাদিস শরীফে বাক্যটি এসেছে এভাবে— 'ছুম্মা আমারা ফাসল্লি আ'লাইহা' (অতঃপর হুকুম দিলেন ও তার জানাযার নামাজ পড়লেন)। 'সল্লা' শব্দটি কর্তৃকারক এবং কর্মকারক সাল্লা, সুল্লিয়া উভয়ভাবে পড়া যায়। সুল্লিয়া পড়লে কথাটির অর্থ হবে রসুলেপাক স. লোকদেরকে হুকুম দিয়েছেন, তার লাশ যেনো মাটি থেকে বের করে এনে জানাযার নামাজ পড়া হয়। তিনি স. স্বয়ং তাঁর জানাযা পড়াননি। আর যদি 'সল্লা' কর্তৃকারকের ক্রিয়া হয়, তখন অর্থ হবে, রসুলেপাক স. নিজেই জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন। কাযী আয়ায মালেকী বলেছেন, জমহুরের নিকট বিশুদ্ধ মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি, যা কর্তৃকারকের ক্রিয়ায় সল্লা পড়া হয়েছে। তাবারী ইবনে আবী শায়বা এবং আবু দাউদের নিকট শব্দটি হচ্ছে সুল্লিয়া, যার অর্থ জানাযার নামায পড়া হয়েছিলো। 'মাহদুদ' অর্থাৎ যার উপর শরীয়তের হদ কায়েম করা হয়েছে, তার জানাযার নামাজ পড়ার বিষয়ে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যিনি ঋণ শোধ না করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, রসুলেপাক স. স্বয়ং তাঁর জানাযার নামাজ পড়াননি। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্মহনন করেছিলো এবং যে গনিমতের মাল খেয়ানত করেছিলো, রসুলেপাক স. তাদের জানাযার নামাজও পড়েননি। আত্মহত্যাকারীর বিষয়ে অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মূলতঃ কোনো জানাযার নামাজই নেই। তবে উত্তম মত হচ্ছে, যে ব্যক্তিই আহলে কেবলা হবে, তার জানাযার নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, কোনো বাদশাহ বা শাসক আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়বেন না। অন্যের দ্বারা পড়িয়ে নিবেন। 'রওযাতুল আহবাব' কিতাবে গামেদিয়া মহিলাটির ছঙ্গেছারের ঘটনা ঘটেছে নবম হিজরীতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই

যে, হজরত মায়েয এর ছঙ্গেছারের ঘটনাটি সেখানে এই বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ঘটনাটি সুবিদিত। হতে পারে সুবিদিত হওয়ার কারণেই হয়তো ঘটনাটির উল্লেখ সেখানে করা হয়নি। তবে এরূপ যুক্তি নিতান্তই দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম। মেশকাত শরীফের প্রকাশ্য বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত মায়েযের ছঙ্গেছারের ঘটনাও এই বৎসরেই সংঘটিত হয়েছিলো।

হযরত মায়েয রা. এর সঙ্গেছারের ঘটনা

রসুলজীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত মায়েয ইবনে মালেক আসলামী রা. এক ব্যক্তির ঘরে ছিলেন। তার নাম ছিলো হাযাল। তিনিও আসলামী ছিলেন। মায়েয ইবনে মালেক আসলামী তাঁর এক বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং পরে তার সঙ্গে যেনা করেছিলেন। হাযাল ঘটনাটি দেখে ফেললেন। বললেন, তোমাকে রসুলেপাক স. এর কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা জানানো উচিত। হজরত মায়েয রসুলুল্লাহ্ স. এর দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করে দিন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! যাও। আল্লাহ্তায়ালার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং তওবা করো। তিনি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করে দিন। রসুলেপাক স. বললেন, কোন্ বিষয় থেকে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তাঁর স. একথা থেকে বুঝা যায়, তিনি স. মোটামুটিভাবে এতোটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হয়তো কোনো গোনাহ্ খাতা করে ফেলেছেন। বিশেষ করে তিনি যেনা করেছেন, তা তাঁর জানা ছিলো না। হজরত মায়েয রা. জবাবে বললেন, যেনার নাপাকি থেকে। একথা শোনার পর রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। হজরত মায়েয সেই দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি স. আবার তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, এই লোকটি পাগল নাকি। পাগলের মতো কথা বলছে যে? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ তো পাগল নয়। তিনি বললেন, সে কি তাহলে শরাব পান করেছে, যার কারণে মাতাল হয়ে এ সব কথা বলছে? একথা শোনার পর জনৈক সাহাবী উঠে গিয়ে তাঁর মুখের গন্ধ শুঁকে নিয়ে বললেন, শরাব পান করেছে বলে তো মনে হয় না। তবে এ হয়তো কোনো নারীকে চুম্বন করেছে বা তাকে চিমটি কেটেছে অথবা তার সঙ্গে শয়ন করেছে, কিংবা রসিকতা করেছে। আর এগুলো যেনার কাজে ভূমিকা রাখে বলেই হয়তো সে এগুলোকে যেনা হিসেবেই ধরে নিয়েছে। হজরত মায়েয বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! না। আমি যেনাই করেছি। রসুলেপাক স. তখন যার ঘরে যেনা সংঘটিত হয়েছিলো, তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদি মায়েযের ঘটনাটি গোপন করতে, তাহলে সেটাই তোমার জন্য মঙ্গল হতো। যা হোক হজরত মায়েয যখন চার বার বিষয়টির

স্বীকৃতি প্রদান করলেন, তখন রসুলেপাক স. তাঁকে ছঙ্গেছার করার হুকুম দিলেন। তাঁকে মদীনা শরীফের কংকরময় প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হলো পাথর। উপর্যুপরি প্রাস্তরাঘাতে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পলায়নের উদ্দেশ্যে দৌড় দিলেন। দৌড়ে পালানোর সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে হাতের কাছে একটি উটের চোয়াল পেয়ে তা দিয়ে আঘাত করে হজরত মায়েযকে ধরাশায়ী করে ফেললেন এবং তাঁর উপর এমন ভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হলো যে, তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। অতঃপর এ কাজের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পরে রসুলেপাক স. এর কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ যখন জানালেন, তখন তিনি স. বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেনো? সে আল্লাহ্র কাছে তওবা করতো, আর আল্লাহ্তায়ালা তওবা কবুল করতেন। তিনি স. হজরত মায়েয ইবনে মালেকের জন্য এস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করলেন। বললেন, নিশ্চয়ই সে এমন তওবা করেছে, যে তওবাকে সকল উম্মতের মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা হবে সকলের জন্য যথেষ্ট। রসুলেপাক স. এখানে হদ কায়েম করার নাম দিলেন তওবা। কেননা এই হদ কায়েমের মাধ্যমে গোনাহ্ থেকে পবিত্রতা ও নাজাত লাভ হয়, যেমন লাভ হয় তওবা দ্বারা। মূলতঃ তওবা নফসকে ধ্বংস করে। আর এ ক্ষেত্রে হজরত মায়েয নিজ সত্তাকেই যেনো নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার বিধানের প্রতি যথাসম্মানপ্রদর্শন করে জীবন দিয়ে দিলেন। একেই বলে মহৎ তওবা। নবীজীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, বিখ্যাত সুফী রুবিস কু. একজন তালেবে হককে বিদায় জানানোর সময় বলেছিলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় চলার মানে হচ্ছে জীবন উৎসর্গ করা। সুফীগণের কথায় গর্বিত হওয়া নয়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, হজরত মায়েয রা. এহেন তওবার কারণে যদি মাগফুরই (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য রসুলেপাক স. এর এস্তেগফার করার মানে কি? এমতো প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এই এস্তেগফার তাঁর মাগফেরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে নিশ্চয়, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

তবুকের যুদ্ধ

এই বৎসর সংঘটিত হয় তবুকের যুদ্ধ। তবুক মদীনা তাইয়্যেবা এবং শামদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মদীনা থেকে তবুক চৌদ্দ মনজিল দূরে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, তবুক একটি দূর্গের নাম। অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মদীনা ও শামদেশের মধ্যবর্তী এক ভূখণ্ডের নাম তবুক। কেউ কেউ বলেছেন, তবুক এ স্থানের এক পানির কূপের নাম। মুসলিমবাহিনী ওই কূপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো বলেই এই অভিযানের নাম তবুকের অভিযান। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, রসুল স. সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, অবশেষে

তোমাদেরকে পৌঁছতে হবে তবুকের কূপ পর্যন্ত। 'বুক' শব্দের অর্থ কাঠ ইত্যাদি দ্বারা এমন গভীর কূপ খনন করা, যাতে পানি দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর রসুলেপাক স. দেখলেন, অনেক সাহাবী তাঁদের পেয়ালাসমূহ ফেলে তাতে নাড়াচাড়া করছেন যাতে পানি বেরিয়ে আসে। রসুলেপাক স.ও একথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা সেখানে অবতরণ করবে এবং নাড়াচাড়া করে কূপ থেকে পানি বের করে নিবে। হাদিসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে এরকমই বলা হয়েছে। এই যুদ্ধকে 'গাযওয়ায়ে ফাসেহা'ও বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে মুনাফিকদেরকে অনেক লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা ভোগ করতে হয়েছিলো। এ যুদ্ধের আরও নাম আছে। যেমন 'গযওয়ায়ে উসরত' এবং 'জায়শে উসরত'। কেননা এ যুদ্ধে সৈনিকদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো। সম্মুখীন হতে হয়েছিলো প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসার। পথের দূরত্ব ছিলো অধিক। আর আবহাওয়াও ছিলো অত্যন্ত তপ্ত। শত্রুসেনাদের লশকর ছিলো খুবই শক্তিশালী। আবার বছরটি ছিলো দুর্ভিক্ষের বছর। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো অনেক, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছিলো অপ্রতুল। মুসলিমবাহিনীর দৈন্যদশা ছিলো এরকম যে, দরিদ্র সাহাবীদের প্রতি আঠারোজন যোদ্ধার জন্য একটি উটের অধিক বাহন ছিলো না। উটগুলোর উপর তাঁরা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। পোকায় খাওয়া খেজুর, ঘুণে ধরা জওয়ার এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘি ছিলো তাঁদের সফরের খাদ্যসামগ্রী। পানীয় জলের অভাবও ছিলো প্রকট। বাহনের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাঁরা উট যবেহ্ করতেন এবং যবেহকৃত উটের সিক্ত নাড়ীভুড়ি ঠোঁটে লাগিয়ে ঠোঁটের শুষ্কতা দূর করতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভক্ষণ করতেন গাছের পাতা। ফলে তাঁদের দাঁতের মাড়িসমূহ ফুলে গিয়েছিলো এবং ঠোঁটগুলি হয়ে গিয়েছিলো উটের ঠোঁটের মতো। স্বচ্ছল সাহাবীগণের জন্যও এই অভিযান ছিলো অস্বস্তিকর। কেননা তখন ছিলো ফসল পাকার সময়। এমন মুহূর্তে ফলদার গাছের নীচে বসে পেকে যাওয়া ফলের সুঘ্রাণ গ্রহণ ছিলো আরববাসীগণের নিকট বড়ই লোভনীয়। পুরো সেনাবাহিনীর যখন এরকম অবস্থা, তখন অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানূ মালাকুম ইযা ক্বীলা লাকুমুন ফির ফী সাবিলিল্লাহিছ ছাক্বালতুম ইলাল আরদ্বি আরাদ্বীতুম বিল হায়াতিদ দুইয়া ফিল আখিরাতি ইল্লাকালীল' (হে মু'মিনগণ তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর)(৯ঃ৩৮)। দুনিয়ার সম্পদ আখেরাতের সামনে খুবই কম। এমনিভাবে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যপ্রত্যাশী, আরাম আয়েশ অন্বেষী ও স্বচ্ছল জিন্দেগী কামনাকারীদেরকে তিরস্কারের চাবুক মারা হয়েছে এই আয়াতে।

মদীনা শরীফ থেকে এই অভিযানে যে দিন যাত্রা শুরু করা হয়েছিলো ঐকমত্যসম্মতভাবে সে দিনটি ছিলো রজব মাসের বৃহস্পতিবার, নবম হিজরী।

অভিযানের কারণ

শামদেশ থেকে মদীনায় এসে উপস্থিত হলো একটি কাফেলা। তারা এই সংবাদটি রটিয়ে দিলো যে, রোমের বাদশাহ বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করেছে। লাহাম, জুযাম, আমেলা ও গাসসান প্রভৃতি গোত্রের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা রোম সাম্রাজ্যের প্রশাসক হারকালকে খুবই পছন্দ করে। তারা সকলেই খৃষ্টান ধর্মের বিজয়ের আশায় মিলিত হয়েছে ওই বাহিনীর সঙ্গে। মদীনা জয় করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, ওই সকল গোত্রের খৃষ্টানেরা হারকালকে এই মর্মে মিথ্যা সংবাদ জানিয়েছিলো যে, ওই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি নবুওয়াতের দাবী করেছিলেন, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সাথীদের এখন চরম দুর্দিন। তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত। তাদের ধন-সম্পদ সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এই মুহূর্তেই তাদের রাজত্ব দখল করা সহজ হবে। বাদশাহ রোম দেশের কুববাদ নামক এক ব্যক্তিকে চল্লিশ হাজার লোক সহকারে মদীনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করতে বলেছেন। সংবাদটি রসুলেপাক স. এর নিকট পৌঁছলো। উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হারকাল খৃষ্টধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সুতরাং যখন রসুলেপাক স. তার নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তখন সে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো— কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। তা যদি হয়েও থাকে বুঝতে হবে, ওটা ছিলো তার দুনিয়ার মহব্বত ও রাজত্ব রক্ষার কুটকৌশল মাত্র। অথবা তার প্রজাগণ তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধা প্রদান করেছিলো। তাই সে আর ইসলাম গ্রহণ করেনি।

রসুলেপাক স. শামদেশের দিকে সৈন্য প্রেরণের দৃঢ়সংকল্প করলেন। সাহাবা কেরামকে বিভিন্ন গোত্রপদের দিকে সৈন্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দান করলেন। সেই মর্মে নির্দেশ প্রচার করা হলো। নির্দেশ পালিত হলো। শুরু হলো যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ। বাহিনী প্রস্তুত হলো। রসুল স. বার বার আল্লাহ্র রাস্তায় সাহায্যকারী হতে এবং জেহাদের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। বললেন, প্রত্যেকে যেনো আপন সাহস, শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে বাহিনী প্রস্তুত করার কাজে নিয়োজিত হয় এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর সমুদয় সম্পদ জেহাদের জন্য জমা দিলেন। হজরত ওমর ফারুক দান করলেন তাঁর সম্পদের অর্ধেক। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. যখন তবুকের যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এবার আমি আবু বকরের উপর অগ্রগামী হয়ে যাবো। আমার

এখন সম্পদও রয়েছে বেশী। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো? আমি বললাম, এই পরিমাণ মাল আমি তাদের জন্য রেখে এসেছি। আবু বকর উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে। রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের দু'জনের কথার মধ্যে যে রকম পার্থক্য তেমনি পার্থক্য রয়েছে তোমাদের দু'জনের মর্যাদার মধ্যে। হজরত ওমর রা. বললেন, অতঃপর আমি আবু বকর সিদ্দীককে লক্ষ্য করে বললাম, আমি কোনো দিক দিয়েই আপনার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারলাম না। বর্ণিত হয়েছে, একদিন হজরত আবু বকর সিদ্দীক সদ্কার মাল গোপনে নিয়ে এলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই আমার সদ্কা। আর আল্লাহ্তায়ালা আমার আশ্রয়স্থল। তারপর হজরত ওমর ফারুক এলেন। তিনি সদ্কা পেশ করলেন প্রকাশ্যে। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই সদ্কা আমার এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে, যা আমার আশ্রয়স্থল। রসুলেপাক স. বললেন, ওমর! তুমি ছিলা ছাড়াই ধনুককে তাক করেছো। তোমাদের দু'জনের কথার মধ্যে যেরকম পার্থক্য, তোমাদের দু'জনের দানের মধ্যেও সেরকম পার্থক্য। বর্ণনাটি তবুকের যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। অথবা হতে পারে অন্য কোনো স্বতন্ত্র ঘটনা। 'রওযাতুল আহবাব' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি স্বতন্ত্র ঘটনা।

উম্মতজননী আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, এক জ্যোৎস্না রাতে রসুলেপাক স. আমার কোলে তাঁর পবিত্র মস্তক রেখে বিশ্রাম করছিলেন। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এমন কোনো লোক কি আছে, যার নেকী আসমানের তারকারাজির সমান? রসুলেপাক স. বললেন, সে হচ্ছে ওমর। তার নেকীর পরিমাণ আকাশের তারকারাজির সমান। উম্মতজননী আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমার পিতার (আবু বকর সিদ্দীকের) নেকী কতো হবে? রসুলেপাক স. বললেন, ওমরের সমস্ত নেকী আবু বকরের একটি নেকীর সমান। তাঁর স. একথার অর্থ সংখ্যার দিক দিয়ে হজরত ওমরের নেকী বেশী হলেও অবস্থার দিক দিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নেকী উন্নত। যেমন অন্যান্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। নামাজ-রোজার আধিক্যের দিক দিয়ে হজরত আবু বকরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, বরং তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যে খায়ের (কল্যাণ) রয়েছে, উক্তি করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং বুঝতে হবে সিদক্, ইখলাস ও মারেফতের ভিত্তিতে মর্যাদা দান করা হয়।

বান্দা মিসকীন (শায়খে মুহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে 'জ্যোৎস্না রাত'— এতে কেউ যেনো এরকম মনে না করেন যে, জ্যোৎস্না রাতে আকাশে তারকার সংখ্যা কম

পরিলক্ষিত হয়। জ্যোৎস্না রাতে আকাশে তারকা কম দেখা যাক আর বেশী দেখা যাক, তা মূল বিষয়বস্তু নয়। আকাশের তারার সংখ্যা যে অধিক তাই এখানে বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

এ যুদ্ধে হজরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফান অনেক দান করেছিলেন। জায়শুল উসরত বা তবুকের যুদ্ধের ছামান প্রস্তুতকারী হিসেবে বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁর প্রশংসাও বর্ণিত হয়েছে অনেক। বর্ণিত হয়েছে হজরত ওছমান যুন্নুরাইন শামদেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে একটি তেজারতী কাফেলা সুসজ্জিত করছিলেন। তবুকের অভিযানের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই যে দু'শ উট এগুলোর উপর খাটানো হয়েছে পালান, যিনপুশ ও চাদর। এই দু'শ উট, দু'শ আওকিয়া রৌপ্যসহকারে আপনার খেদমতে পেশ করলাম। দয়া করে এগুলোকে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করবেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনশ' উট চার বস্তা করে মাল বোঝাই করে এবং এক মেছকাল স্বর্ণ এনে রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির করলেন। রসুলুল্লাহ্ স. খুশি হয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। আমি তো তার প্রতি সন্তুষ্ট। নবীজীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, তবুকের অভিযানে তিরিশ হাজার মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিলো। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সৈন্যের মাল ছামানের ব্যবস্থা করেছিলেন হজরত ওছমান। তিনি রসুলেপাক স. এর বাণী— 'মান জাহ্‌হাযা জাইশাল উসরাতি ফালাহুল জান্নাতু' (যে জায়শুল উসরাত বা তবুকের যুদ্ধের ছামান প্রস্তুত করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত) এই সুসংবাদের যোগ্য অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, হে আল্লাহ্! কিয়ামতের দিন ওছমানের হিসাব নিকাশ উঠিয়ে দিও। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওছমান জায়শুল উসরাতের অভিযানে এক হাজার উট এবং সাতশ' ঘোড়া দান করেছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওছমান এক হাজার দীনার তাঁর জামার আস্তিনে রেখেছিলেন। জায়শুল উসরাত অভিযানের প্রস্তুতি যখন নেওয়া হয়েছিলো তখন তিনি সে সব রসুলেপাক স. এর সামনে ঢেলে দিলেন। রসুলেপাক স. দীনারগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। বললেন, আজ থেকে ওছমান যা করবে, তাতে তার কোনো লোকসান হবে না। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন বললেন, তুমি যা গোপনে করো অথবা করো প্রকাশ্যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, হজরত ওছমানের দানের প্রতি গভীরভাবে রসুলেপাক স. এর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে— তাঁকে একথা বুঝানো যে, তিনি অনেক দান করেছেন। আর তাঁর দান গৃহীতও হয়েছে। সুতরাং তিনি যেনো আনন্দিত হন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি দশ হাজার দীনার দান করেছিলেন। আর রসুল স. এর এই বাণী

'আজ থেকে ওছমান যা কিছুই করবে, তাতে তার কোনো লোকসান হবে না' এর মধ্যে রয়েছে হজরত ওছমানের ক্ষমাপ্রাপ্তির ইঙ্গিত। অর্থাৎ হজরত ওছমানের দ্বারা কোনো গোনাহ্ বা অন্যায় সংঘটিত হলেও তাতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। তাঁর জন্য সব কিছুই মাফ। এ কথাটি রসুলেপাক স. বদরী সাহাবীদের সম্পর্কেও বলেছিলেন। বলেছিলেন— 'ইন্নাল্লাহা ইত্তালাআ' আ'লা আহলি বাদরিন ফাকালা ই'মালূ মাশি'তুম ফাকাদ গফারতু লাকুম' (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা জেনে নিয়েছেন। সুতরাং তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছে আমল করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি)। একথার অর্থ এই নয় যে, তাঁদেরকে দায়দায়িত্বহীন করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যা ইচ্ছে তাই তাঁরা করতে পারবেন। আবার এমনও অর্থ হবে না যে, কোনো গোনাহ্ তাদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া অপরিহার্য। বরং একথা দ্বারা তাদেরকে যে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়টিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে সসম্মানে।

আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান যুন্নুরাইন সম্পর্কে কোনো কোনো সাহাবী অভিযোগ উত্থাপিত করেছিলেন। অবতারণা করেছিলেন কিছু প্রশ্নেরও। উলামা কেরাম অবশ্য সে সব প্রশ্নের জবাবও উপস্থাপন করেছেন। তৎসত্ত্বেও রসুলেপাক স. এর উপরোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, হজরত ওছমানের জন্য কবুলিয়াতের দরজাটি ছিলো খোলা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টি হাসিল হয়েছিলো তাঁর। তাই তাঁর ব্যাপারে ক্ষমা ও মাগফেরাতের পুরাপুরি আশা করা যায়। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত আছে, ওছমান চল্লিশ হাজার দেরহাম নিয়ে উপস্থিত হলেন। নিবেদন করলেন, আমার নিকট আশি হাজার দেরহাম ছিলো। তন্মধ্যে অর্ধেক আমার পরিবার পরিজনের জন্য রেখে দিয়েছি, বাকী অর্ধেক নিয়ে এসেছি পুণ্য অর্জনের জন্য। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সবগুলোর মধ্যে বরকত দান করুন— যা নিয়ে এসেছো এবং যা রেখে এসেছো। রসুলেপাক স. এর দোয়ার বরকতে হজরত ওছমানের ধন-সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো। সমস্ত সম্মানিত ও ধনী মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ তাঁর দানে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেপরোয়াভাবে প্রশস্ত হস্তে দান করতে শুরু করেছিলেন। কোনো কোনো সাহাবীর স্ত্রীগণ তাদের হাতে পায়ে ব্যবহৃত অলংকারাদি এবং গলা ও কানের অলংকার খুলে রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির করেছিলেন। আসেম ইবনে আদী কয়েক ওসাক খেজুর নিয়ে এলেন। হজরত আবু আকীল আনসারী রা. আনলেন এক সা খেজুর। বললেন, আজ সারা রাত আমি পানি টানার মজুরী করেছি। তাতে পারিশ্রমিক যা পেয়েছি, তা থেকে এক সা নিজের পরিবার পরিজনের খরচের জন্য দিয়েছি। আর এক সা খেজুর রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়ে এসেছি। রসুলেপাক স. এই এক সা খেজুর সমস্ত মালের উপরে রাখলেন।

মুসলমানদের এরূপ দানের প্রবণতা দেখে মুনাফিকরা আড়ালে সমালোচনা, নিন্দা ও বিদ্রূপ করতে লাগলো। আল্লাহ্তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন 'আল্লাজীনা ইয়াল মিযুনাল মুতাববিঈনা মিনাল মু'মিনীনা ফী সাদাক্বাতি ওয়াল্লাজীনা লা ইয়াজ্বিদূনা ইল্লা জুহদাহুম ফা ইয়াসখারূনা মিনহুম সাখিরাল্লাহু মিনহুম ওয়ালাহুম আ'জাবুন আলীম' (মু'মিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদের যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি)(৯ঃ৭৯)।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত উৎবা ইবনে যায়েদ রসুলেপাক স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার এমন কোনো সম্পদ নেই, যা আল্লাহ্র রাস্তায় পেশ করতে পারি। তাই আমি আমার ব্যক্তি সত্তাকে সকলের জন্য বিসর্জন দিলাম। তাঁরা যেভাবে চাইবেন, আমার থেকে খেদমত গ্রহণ করতে পারবেন। যে কোনো মদদ চাইবেন, তা করতে বাধ্য থাকবো। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার এই সদকা কবুল করে নিয়েছেন। এভাবে ধনী সাহাবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা অভাবী যোদ্ধাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো। এভাবে গ্রহণ করা হলো যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা অনেক বেশী করে পাদুকা সঙ্গে নিয়ে নাও। কেননা পাদুকা পরিধান করা হবে বাহনে আরোহণের বিকল্প।

বর্ণিত আছে, কতিপয় সাহাবী রসুলেপাক স. এর কাছে হাজির হলেন— যাদের নাম সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। তাঁরা নিবেদন করলেন, আমাদের কোনো বাহন নেই। দয়া করে আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করা হোক। রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের জন্য কোনো বাহন তো দেখছি না। আর এ মুহূর্তে এমন কোনো সদ্কার মালও নেই যদ্দারা তোমাদের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। একথা শুনে অভাবগ্রস্ত সাহাবীগণ ব্যথিত হলেন। কাঁদতে কাঁদতে মজলিশ ত্যাগ করলেন। সাহাবীগণের দলটির নাম বাক্কাইন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক তাঁর কালামে উল্লেখ করেছেন 'ওয়ালা আ'লাল্লাজীনা ইজা মা আতূকা লি তাহ্মিলাহুম কুলতা লা আজ্বিদু মা আহমিলুকুম আ'লাইহি তাওয়াল্লাও ওয়া আ'ইউনুহুম তাপীদ্বু মিনাদ দাম'ই হাযানা আল্লা ইয়াজ্বিদু মা ইউনফিকূন' (উহাদের কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না; উহারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্য জনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল)(৯ঃ৯২)। রসুলেপাক স. এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে এটি একটি অন্যতম গুণ হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি কখনও 'না' শব্দটির উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু কঠোর বাস্তবতার কারণে

কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটতো। এ প্রসঙ্গে উলামা কেরাম বলেছেন 'লা উ'তী' আর 'লা আজিদু' এই দুই শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রসঙ্গটি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে 'আখলাক শরীফ' শিরোনামে। বর্ণিত আছে, ওই দরিদ্র সাহাবীগণের মধ্য থেকে দু'জনকে একটি উট দান করেছিলেন ইবনে ইয়ামীন ইবনে ওমর। অপর দু'জনকে একটি উট দিয়েছিলেন হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। হজরত ওছমান ইবনে আফফান তাঁদের তিনজনকে একটি উট দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, আমার সাথীগণ (আশআরী সম্প্রদায়ের লোকেরা) আমাকে রসুলুল্লাহ্ স. এর খেদমতে প্রেরণ করলো। উদ্দেশ্য, আমি যেনো তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দেই। আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমাকে আপনার খেদমতে পাঠানো হয়েছে যাতে আমি আমার কওমের লোকদের জন্য আপনার কাছ থেকে ছওয়ারীর ব্যবস্থা করে দেই। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাদের জন্য ছওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবো না। আমি বিষণ্ন মনে ফিরে এলাম। আমার মনে এরকম ভয়ও বিরাজ করছিলো যে, না জানি রসুলেপাক স.আমার এমতো যাচ্ঞার কারণে অতুষ্ট হলেন কিনা। আমি আমার সাথীদের কাছে গিয়ে সকল কিছু খুলে বললাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুনতে পেলাম বেলালের আওয়াজ। তিনি ডেকে বলছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স কোথায়? ওটা ছিলো আমার মূল নাম। আমি জবাব দিলাম, এই যে এখানে। তিনি বললেন, রসুলেপাক স. তোমাকে ডাকছেন। এক্ষুণি চলো। তৎক্ষণাৎ আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি স. আমাকে বললেন, এই নাও, ছ'টি উট। তোমাদের সাথীদের দিয়ে দাও। রসুলেপাক স. উটগুলো হজরত সাআদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, আমি ওই উটগুলো আমার সাথীদেরকে দেওয়ার পর স্বস্থানে চিন্তিত ও লজ্জিত অবস্থায় বসে পড়লাম এই মনে করে যে, আমি তো যাচ্ঞাকারী হয়ে নবী করীম স.কে চিন্তিত করে দিয়েছি। তিনি তো আমাকে না দেওয়ার জন্য শপথ করেছিলেন। এখন তিনি আমাকে ছওয়ারী দান করলেন। কাজেই তিনি তো শপথ ভঙ্গ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো আমাকে ছওয়ারী না দেওয়ার বিষয়ে শপথ করেছিলেন। অথচ এখন দান করলেন। আপনার শপথ ভঙ্গ হয়ে গেলো তো। তখন রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের ছওয়ারী দিয়েছেন। আর আল্লাহ্তায়ালা আমাকে হুকুম দিয়েছেন, যখনই আমি কোনো বিষয়ে শপথ করি, আর পরবর্তীতে যখন দেখি অন্যটির মধ্যে রয়েছে কল্যাণ, তখন শপথ ভঙ্গ করে কল্যাণকর কাজটির উপরই আমল করি এবং শপথ ভঙ্গ করার কারণে কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

মুনাফিকদের একটি দল যাদেরকে 'মুযুরীন' বলা হয়, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে যথেষ্ট ওজর আপত্তি পেশ করলো। আরেকটি দল কোনো রকম ওজর প্রকাশ না করেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হলো। এরা নিজেরা এমন করলো তা নয়, বরং আবহাওয়া উত্তপ্ত এবং নিশ্চিত কঠিন দূরাবস্থায় পড়বে ইত্যাদি বলে অন্যদেরকেও যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখলো। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা সুরা তওবার মধ্যে। ওই মুনাফিকদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিলো জাদ ইবনে কায়স। সে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমাকে মদীনায় থাকার অনুমতি দিন। সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য একটি অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য ওজর পেশ করে বললো, আমি মেয়েদের প্রতি খুব আসক্ত। বনী আসফার মেয়েদেরকে দেখলে আমি সবর করতে পারবো না। ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবো। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। একথা বলেই তিনি স. তাঁর চেহারা মুবারক তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন। তখন নাযিল হলো পবিত্র আয়াত 'ওয়া মিনহুম মাইঁ ইয়াকূলু'যান লী ওয়ালা তাফতিন্নী আলা ফিল ফিতনাতি সাকাতূ ওয়া ইন্না জাহান্নামা লামুহীতাতুম বিল কাফিরীন' (এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলিও না। সাবধান উহারাই ফিত্নাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদের বেষ্টন করিয়াই আছে)(৯:৪৯)।

রোমের অপর নাম বনী আসফার। রোমীয়দের আদি পিতার নাম ছিলো রোম ইবনে আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম। সেই আদী পিতার গায়ের রঙ ছিলো আসফার বা হলুদ বর্ণের। কেউ কেউ বলেন, সেই রোম ইবনে আয়স হাবশার বাদশাহ্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলো, যার থেকে শাদা ও কালো রঙের সংমিশ্রণ ঘটে। পরবর্তী বংশাধারায় জন্ম নিতে থাকে হলুদ বর্ণের সন্তান-সন্তুতি। কথিত আছে, কোনো এক সময় হাবশীরা রোমীয়দের উপর বিজয়ী হয়েছিলো। সে সময় তারা রোমীয় নারীদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সহবাস করেছিলো। যার ফলে তাদের পরবর্তীদের গায়ের রঙ যায় বদলে। আবার এরকমও কথিত আছে যে, আসফার রোম ইবনে আয়স এরই অপর নাম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মুনাফিকদের একদল লোক গনিমতপ্রাপ্তির লোভে এবং দুনিয়াবী মালমাত্তা প্রাপ্তির আশায় মুসলিমবাহিনীর সঙ্গী হয়েছিলো। যাত্রাকাল থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মন্দ আচরণ ও অপতৎপরতা তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো। মুসলিমবাহিনী যখন প্রস্তুত হয়ে গেলো, তখন নির্দেশ দেওয়া হলো, সকলকে মদীনার বাইরে ছানিয়াতুল ওয়াদাতে একত্রিত হতে হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাদের নেতৃত্ব দিবেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সলুল মুনাফিক তার সহযোগী ও সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বাইরে গেলো এবং যুবাব নামের এক স্থানের ঠিক বিপরীতে একটি জায়গায় পৃথকভাবে তাঁবু খাটালো। সেখানে পৌঁছে

সে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ বনী আসফারদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছে। তারা মনে করছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা খুব সহজ ব্যাপার। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দেখতে পাচ্ছি, মোহাম্মদের সঙ্গীসাথীরা পায়ে বেড়ি, হাতে শিকল লাগানো অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধশেষে ওই সকল মুনাফিকদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ যখন রসুলেপাক স. পেলেন, তখন বললেন, কিছু যদি হতো তাহলে এরা আমাদের পিছনে থাকতো না। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করো যে, আমরা দুষ্টদের অনিষ্ট থেকে নাজাত পেয়ে গেছি। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন মদীনা শরীফ থেকে তবুকের দিকে যাত্রার ইচ্ছা করলেন, পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে হজরত আলী ইবনে আবী তালেবকে বানালেন মদীনার খলিফা। হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কোনো যুদ্ধ থেকে পিছপা হইনি। এমন কি কারণ হলো যে, এই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন? রসুলেপাক স. বললেন, হে আলী! তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ওই রকম যেরকম সম্পর্ক নবী মুসার সঙ্গে নবী হারুনের। একথায় তুমি কী খুশি নও? তবে পার্থক্য এটুকু যে, হারুন নবী ছিলেন, কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। উল্লেখ্য, হজরত মুসা মীকাতে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই হজরত হারুনকে আপন কাওমের জন্য খলিফা বানিয়েছিলেন। যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে 'ওয়া ক্বালা মূসা লিআখীহি হারূনাখ্ লুফনী ফী কাওমী' (এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে) (৭ঃ১৪২)।

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন হজরত আলীকে মদীনায় রেখে গেলেন, তখন মুনাফিক ও হিংসুকেরা বলতে লাগলো, রসুলুল্লাহ্ স. আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট। এরকম কথা শুনে হজরত আলী রসুলেপাক স.এর পিছনে পিছনে গিয়ে হরবে বাদ নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। হজরত আলীর কাছ থেকে সব কথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। আমি তোমাকে মদীনায় রেখে এসেছি এ কারণে যে, তুমি তোমার আহলে বাইত আর আমার আহলে বাইত অর্থাৎ ফাতেমাকে দেখাশোনা করবে। এই হাদিসের আলোকে শিয়া ও রাফেযীরা দলিল পেশ করে যে, রসুলুল্লাহ্ স. এর পর খেলাফতের হকদার হজরত আলী। আর এটি রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে হজরত আলী রা. এর প্রতি ওসিয়তস্বরূপ। শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায়ের এহেন ভ্রান্ত মতবাদের বিরোধিতা করে আহলে সুন্নাতওয়াল জামায়াতের উলামা কেরাম বলেন, এই হাদিসে তাদের দাবীর সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। কেননা হাদিসখানি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, রসুলেপাক স. এর তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার

কারণে যে সময়সীমা পর্যন্ত তিনি স. মদীনায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, হজরত আলীকে তাঁর প্রতিনিধি বানানো হয়েছিলো কেবলমাত্র সেই সময়ের জন্য। এখানে আহলে বায়তের দেখাশোনার জন্য তাঁকে খলীফা বানানো দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়ে যায় না যে, তিনি উম্মতের খলীফা হবেন। যেমন হজরত মুসা হজরত হারুনকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কাওমের লোকদের দেখাশোনা করার জন্য মোনাজাতের মাধ্যমে খলীফা বানিয়েছিলেন। কিন্তু হারুন হজরত মুসার পর খলীফা হননি। উল্লেখ্য, হজরত মুসার ইন্তেকালের চল্লিশ বৎসর পূর্বেই হজরত হারুনের ইন্তেকাল হয়েছিলো। রসুলেপাক স. হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজের ইমামতী করার জন্য খলীফা বানিয়েছিলেন। হজরত আলী রা. আহলে বাইতের দেখাশোনা করতেন। আর হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম নামাজের ইমামতী করতেন। এই হাদিস দ্বারা যদি প্রমাণ করা হয় যে, হজরত আলী খলীফা হবেন, তাহলে তো রসুলেপাক স. তবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ইবনে উম্মে মাকতুমের ইমামতীও ঠিক থাকতো। উসুলে হাদিসের একজন বিশিষ্ট আলেম আযদী হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তাঁর এরকম আপত্তির অবশ্য কোনো ভিত্তি নেই। কারণ সকল আলেম হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত। আর মোহাদ্দেছগণের কথাই নির্ভরযোগ্য। হাদিসখানি সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই হাদিসে 'আলা ইন্নাহু লা নাবিয়্যা বা'দী' (ওহে, আমার পর আর কোনো নবী নেই) কথাটির উল্লেখ নেই। একথাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ছেকা রাবীর (সত্যনিষ্ঠ বর্ণনাকারীর) জন্য হাদিসের মূল ভাষ্যে অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি মেনে নেওয়া যায়। আর উল্লেখ না থাকলেও ওই হাদিস দ্বারা হজরত আলীর খেলাফতকে নির্ধারণ করা যায় না। আর একথাও বুঝা যায় না যে, রসুলেপাক স. এর পর হজরত আলী রা. বেওয়াসেতা (বিনা মাধ্যমে) খলীফা হবেন। হজরত আলীকে তখন আহলে বাইত বা নবীজীর পরিবারবর্গের উপর খলীফা বানানো হয়েছিলো। এ বিষয়ের উপর আবার কেউ কেউ মতানৈক্য করে বলেছেন, তাহলে মদীনা শরীফের খলীফা বানানো হয়েছিলো কাকে। এ কথার উত্তরে কেউ কেউ বলে থাকেন, তখন মদীনার খলীফা বানানো হয়েছিলো হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে এবং তাঁরা বলেছেন যে, এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা। এক বর্ণনায় আছে, তখন খলীফা বানানো হয়েছিলো সেবা ইবনে উরফুতাকে। আবার অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু দহম গেফারীকে। মদীনার খলীফাও বানানো হয়েছিলো হজরত আলীকে— ইবনে আব্দুল বার এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রসুলেপাক স. ছানিয়াতুল ওয়াদায় পৌঁছে পতাকা অর্পণের কাজে মশগুল হলেন। সর্ববৃহৎ পতাকাটি হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দিলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে বড় পতাকাটি দিয়েছিলেন। তার পর

আনসারদের প্রত্যেক শাখাগোত্রকে নিজ নিজ গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন পতাকা প্রস্তুত করতে বললেন। আনসারী সাহাবী হজরত আম্মার ইবনে হাযামকে প্রথমে পতাকা দান করলেন। পরে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে দিলেন। হজরত আম্মারা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি কি আমার প্রতি অতুষ্ট? তিনি স. বললেন, না। তবে আল্লাহ্‌র শপথ! কোরআনওয়ালার হক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তাই এরকম করেছি। যায়েদ তোমাদের মধ্যে অধিক কোরআন বক্ষে ধারণকারী। আর কোরআনই মানুষকে অগ্রগামী বানিয়ে দেয়। যদিও সে হয় কান কাটা কালো মুখওয়ালা গোলাম।

তবুকের যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যখন গণনা করা হলো, তখন দেখা গেলো এক মতানুসারে তার সংখ্যা ছিলো তিরিশ হাজার। কেউ কেউ বলেছেন, সত্তুর হাজার। এই বর্ণনাটি সর্বাধিক বিখ্যাত। একদল তো বর্ণনা করেছেন, এক লাখ। এক বর্ণনায় এসেছে, চল্লিশ হাজার। এ বাহিনীতে দশহাজার ছিলো অশ্বারোহী আর বারো হাজার উষ্ট্রারোহী। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে অগ্রগামী বাহিনীর, হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌কে ডান দলের ও হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে বাম দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। ছানিয়াতুল ওয়াদা থেকে যখন মুসলিম বাহিনী যাত্রা শুরু করলো, তখন এ স্থানেও মুনাফিকদের মধ্য হতে এক দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। মুসলিম বাহিনী এ স্থান থেকে যাত্রা করে যখন জারফ নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল মুনাফিক তার সাথী-অনুগতদেরকে সঙ্গে নিয়ে দল ত্যাগ করলো। মুসলিমবাহিনী বহু মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে তবুকের প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে দু'মাস অবস্থান করে। এক বর্ণনায় বারো দিন, আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে বিশদিন অবস্থান করার কথা। দিন-রাত্রি রাস্তা অতিক্রম করার পর ক্লান্তি দূরকরণার্থে তাঁরা প্রথমে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

রোমের বাদশাহ ও নাসারা বাহিনী মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের ধর্মের মর্যাদা ও সাইয়্যেদে আলম স. এর অলৌকিকতার শক্তি সম্পর্কে যখন ধারণা করতে পারলো, তখন তাদের অন্তঃকরণে ভীতির সঞ্চার হলো। ফলে তাদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হলো না। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রোমসম্রাট হারকাল যখন শুনতে পেলো, রসুল স. শামদেশের সীমানায় প্রবেশ করে তবুক নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তখন সে বনী গাসসান গোত্রের এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করলো। সে যেনো মুসলিমবাহিনীতে প্রবেশ করে তাদের সুরত-সীরাত, অভ্যাস-গুণাবলী এবং রসুলেপাক স. এর বিষয়ে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সমস্ত আলামত, বৈশিষ্ট্য ও চালচলন সম্পর্কে অবহিত হয়। সে ব্যক্তি হারকালের নির্দেশ মতো তবুকে পৌঁছলো এবং পরিপূর্ণভাবে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে অবহিত

করলো। হারকাল রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করলো। নাসারা ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলো। লোকেরা তার কথা শুনে রাগান্বিত হলো। রাজ্যময় শুরু হলো অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। মহাহাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলো সবখানে। এমন কি তার রাজক্ষমতা চলে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে সে এই কাজ থেকে বিরত হলো। হারকালের নিকট পত্র প্রেরণ কালেও এ ধরনের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো তা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। এখানেও আমরা জানতে পারলাম যে, রোমের বাদশাহ তার বাহিনীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলো। কিন্তু তারা যখন এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তখন সে নিজেও এ কাজ থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিলো। 'মাওয়াহেব গ্রন্থে' সহীহ্ ইবনে হেববান থেকে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তবুকের অভিযানকালেও হারকালের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং ওই পত্রের মাধ্যমে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করার নিকটবর্তী হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবুল করেননি। মসনদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হারকাল লিখেছিলো, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সে আল্লাহ্‌র দুশমন। সে তার খৃষ্টধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তবুকে অবস্থানকালে রসুলেপাক স. শামদেশে যাওয়ার এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোক এবং শাসনকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার বিষয়ে আনসার ও মুহাজিরদের বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁদের মধ্যে হজরত ওমরও ছিলেন। রসুলেপাক স. এর এই পরামর্শটি ছিলো আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ 'শাবিরহুম ফিল আমর' এর পরিপ্রেক্ষিতে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি আল্লাহ্‌র হুকুমে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে সকলেই আপনার হুকুম অবনত মস্তকে পালন করবে। আপনি সেদিকেই মনোনিবেশ করবেন এবং অগ্রসর হওয়ার মনস্থ করবেন, আমরা সকলে যেদিকেই আপনার সঙ্গী হবো। রসুলেপাক স. বললেন, আমি যদি আদিষ্ট হয়েই থাকি, তবে তোমাদের কাছে পরামর্শ করবো কেনো? হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! রোমের বাদশাহর সৈন্যসামন্ত অনেক বেশী। আর মুসলিমবাহিনীর অবস্থা তো আপনি অবগতই আছেন। রোম অধিপতি তার কৃতকর্ম ও বক্তব্যের জন্য অনুতপ্তও হয়েছে। আপনার শান-শওকত ও শৌর্য-বীর্যের কথা রোমের বিভিন্ন শহরে প্রচারিত হয়েছে। এখন আপনার সম্পর্কে তাদের অন্তরে ভয়ভীতি অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এ বৎসর আপনার ফিরে যাওয়াই মনে হয় ভালো। আগামী বৎসর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসা যেতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় আপনার হুকুমই শিরোধার্য। যেহেতু হজরত ওমর ফারুকের মতামত সঠিক ছিলো, তাই রসুলেপাক স. তার

পরামর্শ মঞ্জুর করলেন এবং তবুকেই অবস্থান করতে লাগলেন। বর্ণিত আছে, তবুক প্রান্তরে অবস্থান কালে ইলার বাদশাহ বুহায়র ইবনে রবিয়া রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির হয়ে জিযিয়া দানে সম্মত হলো। দু'পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হলো। চুক্তিনামায় লেখা হলো এই আহলে হাবার ও আহলে আওরাহ এসেছে এবং তারা মুসলমানদের সঙ্গে এইমর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মুসলমানদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। তাদের সেই চুক্তিনামার দলিল এখন পর্যন্ত ওই কাওমের পরবর্তী বংশধরদের কাছে আছে। 'রওযাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

তবুক অভিযানের মাহাত্ম্য

তবুকের অভিযানের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে— ১. দরিদ্র সাহাবীগণের দারিদ্য দূরিকরণে সহায়তা দান। ২. ধনবান সাহাবীগণের ছওয়াব হাসিল এবং তাঁদের সম্পদ খরচ করার একটি সুযোগ। ৩. মুনাফিকদের অন্তরের গভীরে যে মুনাফেকী লুক্কায়িত ছিলো, তার প্রকাশ। তাদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হলো, যা তাদের প্রতি ধমক ও কঠোরতার বিধান বহন করে। ৪. মুসলমানদের সম্মান লাভ ও ইসলামী বাহিনীর শান-শওকত প্রকাশ ইত্যাদি। রোম সম্রাট এবং আশপাশের অঞ্চলের অন্যান্য বাদশাহ ও শাসক যারা ছিলো, এ অভিযানের ফলে তাদের অন্তরেও ভয়ের সঞ্চার হলো। রসুলেপাক স. স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেননি। এ দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও সম্মান বৃদ্ধি পেলো। কেননা নাসারারা রসুলেপাক স. এর মর্যাদা তাদের সমপর্যায়ের বলে মনে করতো। সে কারণে সাধারণের মধ্যে এহেন সমমর্যাদাবোধটি জাগরিত হয়ে উঠেছিলো। অথবা তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধ করেননি। কারণ আলমে আছবাব বা উপকরণ জগতের দৃষ্টি থেকে মানুষ মনে করতো রসুলেপাক স. এর বদৌলতেই কেবলমাত্র এ অভিযান সফল হয়েছে। যেহেতু তিনি নিজে এই যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। আর যখন তিনি এ জগতে অবস্থান করবেন না, তখন মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হবে না। এহেন ধারণার মূলোৎপাটন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'ইন্নাহুম লাহুমুল মানসূরূনা ওয়া ইন্না জুনদানা লাহুমুল গলিবূন' (নিশ্চয়ই মুমিনরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে আর আমার বাহিনী অবশ্য অবশ্যই বিজয়ী হবে)। এই আয়াতের প্রতি মুসলমানদের আকীদা যেনো সুদৃঢ় হয়, মুসলমানগণ যেনো এরকম মনে করেন যে, আল্লাহ্র সাহায্যের যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা রসুলেপাক স. এর বদৌলতেই হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, হেকমতে এলাহির চাহিদাই এরকম ছিলো যে, তিনি কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবেন না। বরং পরামর্শ ও ইজতেহাদ পর্যন্তই হবে তাঁর গমনাগমনের সীমানা। মদীনা তাইয়্যেবা থেকে বের হওয়া, তবুক প্রান্তর পর্যন্ত পৌঁছা ও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা, সেখান থেকে

প্রত্যাবর্তন করা ও মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত যে সকল মোজেযা, আলামত ও ঘটনাসমূহ প্রকাশ পেয়েছিলো, সে সবও এ অভিযানের ফায়দাসমূহের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত আব্দুল্লাহ বাজারাইনের ঘটনা

দরিদ্র সাহাবীগণের মধ্য হতে একজন সাহাবীর ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। সেই সাহাবীর বন্ধুদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো আব্দুল্লাহ্ যুল বাজারাইন। এই সফরে তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তবুক প্রান্তরে তাঁর ওফাত হয়। জীবনীগ্রন্থবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ছিলেন মুযায়না কবীলার লোক। তিনি ছিলেন এতিমদের পালক-পৃষ্ঠপোষক। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর সহায়-সম্পদ কিছুই ছিলো না। তাঁর চাচা তাঁকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যুবক বয়সে তিনি কয়েকটি উট, বকরী ও গোলামের মালিক হলেন। তিনি আসক্ত হলেন ইসলাম ধর্মের প্রতি। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠলো। চাচার ভয়ে অগ্রসর হতে পারলেন না। রসুলেপাক স. যখন মক্কাবিজয় সম্পন্ন করে মদীনায় ফিরে এলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ তাঁর চাচাকে বললেন, চাচাজান! আমি সারা জীবন ধরে আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে মোহাম্মদের আনুগত্য করার কোনো আগ্রহ ও প্রেরণা দেখতে পাইনি। এখন আমি আমার জীবনের উপর বেশী ভরসা পাচ্ছি না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তাঁর চাচা বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি মোহাম্মদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাঁর আনুগত্য করো, তবে জেনে রেখো, যা কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি সবই ছিনিয়ে নেবো। এমনকি তোমার শরীরে যে পোশাকটি রয়েছে, তাও খুলে নিবো। হজরত আব্দুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। শিরিক ও মূর্তিপূজা বর্জন করছি। আমার কাছে যত মাল আছে, তা সবই আপনি নিয়ে নিন। এ সব কিছু থেকে আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। একদিন তো এসব কিছু ছেড়ে যেতেই হবে। সুতরাং এ সকল নশ্বর সম্পদের কারণে সত্যধর্ম থেকে আমি দূরে সরে থাকতে পারি না। একথা বলে তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এমনকি নিজের শরীরের পোশাকটি খুলে রেখে দিয়ে তাঁর মায়ের কাছে চলে গেলেন। তাঁর মা তাঁর এহেন অবস্থা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। এরকম হবার কারণ কী, তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি এখন মূর্তিপূজা ও দুনিয়া অন্বেষণ থেকে মুক্ত। আমার ইচ্ছা আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবো। এখন ছতর ঢাকতে পারি, এরকম একটি বস্ত্রখণ্ড আমাকে দিন। তাঁর মা তাঁকে একটি চাদর দান করলেন। তিনি তা দু'টুকরো করে একটি দিয়ে লুঙ্গি ও অপরটি দিয়ে চাদর বানালেন। একারণেই

তাঁর উপাধী হয়েছিলো যুলবাজারাইন। বাজার শব্দের অর্থ মোটা খসখসে চাদর। এভাবে বস্ত্রাবৃত হয়ে তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে আশ্রয় নিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ মদীনায় পৌঁছলেন সেহেরীর সময়। প্রবেশ করলেন মসজিদে নববীতে। রসুলেপাক স. নামাজের জন্য যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর দৃষ্টি পড়লো হজরত আব্দুল্লাহ্র উপর। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি এক ফকীর ও মুছাফির। আমি আপনার সৌন্দর্য্যের নগণ্য এক আশেক। আমার নাম আব্দুল্লাহ্ আল উয্যা। রসুলেপাক স. বললেন, আজ থেকে তোমার নাম আব্দুল্লাহ্। আর উপাধি যুলবাজারাইন। এখন থেকে তুমি আমার ঘরের কাছেই থাকবে। এরপর থেকে হজরত আব্দুল্লাহ্ আসহাবে সুফ্ফাগণের দলভুক্ত হলেন। নিজেকে নিয়োজিত করলেন কোরআন মজীদ মুখস্থ করার কাজে। সাহাবীগণ যখন তবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি মসজিদে বসে অত্যন্ত শওকের সাথে উচ্চ আওয়াজে কোরআন মজীদ পড়তে লাগলেন। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! লক্ষ্য করুন, বেদুঈন লোকটি কীভাবে উচ্চ আওয়াজে কোরআন মজীদ পাঠ করছে। মানুষের নামাজ ও ক্বেরাতে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। রসুলেপাক স. বললেন, হে ওমর! তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা সে সংসার ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছে হিজরত করে এসেছে। এ থেকে বুঝা যায়, কোনো হালধারী ব্যক্তি থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা আদব ও উৎকৃষ্টতার পরিপন্থী নয়। একথাও প্রমাণিত হয় যে, চূড়ান্ত সীমার আদব রক্ষার্থে কোনো কোনো সাহাবী মাযুর ছিলেন। এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হয় যে, হিজরতের বিধান এখনও কার্যকর আছে। 'লা হিজরাতা বা'দাল ফাতহে' (অর্থাৎ ফতহে মক্কার পর আর কোনো হিজরত নেই) একথাটিও খণ্ডন হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদিসের আলোকে একথাও সাব্যস্ত হয় যে, হিজরত শুধু মক্কা থেকে মদীনার জন্য খাস— এমন নয়। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে মুহাজির প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে হিজরত (পরিত্যাগ) করে এমন কাজ থেকে আল্লাহ্তায়ালা যার বিরোধিতা করেছেন।

মুসলিমবাহিনী যাত্রা শুরু করলো। হজরত আব্দুল্লাহ্ রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্র পথে আমি যেনো শহীদ হতে পারি। রসুলেপাক স. বললেন, গাছের একটি ছাল নিয়ে এসো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ফিকর গাছের এক টুকরো ছাল আনলেন। রসুলেপাক স. ছালখণ্ডটি তাঁর বাহুতে বেঁধে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি এর রক্ত কাফেরদের জন্য হারাম করলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মকসুদ তো শহীদ হওয়া। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি যখন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছো, এখন যদি তোমার জ্বর হয় আর সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তোমার মৃত্যু হয়, তবুও তুমি শহীদ। এরপর হজরত

আব্দুল্লাহ্ রসুলেপাক স. এর খেদমত করতে করতে তবুক পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁর জ্বর হলো। ওই জ্বরেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। হজরত বেলাল ইবনে হারেছ মযনী বর্ণনা করেন তাঁকে দাফন করার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হলো, তখন ছিলো রাত। আমি দেখলাম, মুয়াজ্জিন (বেলাল) হাতে একটি কুপি প্রদীপ নিয়ে আসছেন। তখন সাইয়্যেদে আলম স. তাঁর কবরের কাছে উপস্থিত। হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারুক দু'জনে মিলে তাঁকে কবরে নামাচ্ছেন। রসুলেপাক স. তখন বলছিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে ইজ্জতের সাথে মাটিতে রাখো। তিনি স. কবরের ভিতরে কাঁচা ইট কুড়িয়ে নিলেন। অতঃপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এ দিন রাত আমার খেদমতে নিয়োজিত ছিলো। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আফসোছ! আমি যদি এই কবরবাসীর স্থলবর্তী হতাম।

উকায়দরের বিরুদ্ধে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ

তবুকের অভিযানের অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে দওমাতুল জন্দলের শাসনকর্তা উকায়দরের বিরুদ্ধে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তবুক থেকে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে চারশ' আরোহী যোদ্ধার প্রধান বানিয়ে উকায়দর ইবনে আব্দুল মালিক নাসরানীকে উৎখাত করার জন্য প্রেরণ করলেন। সে ছিলো দওমাতুল জন্দলের শাসক। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে বনী কেলাবদের রাজ্যে প্রেরণ করছেন খুব ছোট একটি বাহিনী দিয়ে। রসুলেপাক স. বললেন, সে সময় খুবই নিকটবর্তী, যখন তুমি সেখানে যাবে এবং তাদেরকে পাহাড়ে ও জঙ্গলে শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে। যুদ্ধের ঝামেলা পোহানো ব্যতিরেকেই তুমি তাদেরকে পর্যুদস্তু করতে পারবে। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ আর দ্বিরুক্তি করলেন না। যাত্রা শুরু করলেন। এক সময় পৌঁছে গেলেন দওমাতুল জন্দলের কিল্লার নিকটে। উকায়দর ছিলো কিল্লার অভ্যন্তরে। তখন রাত। চাঁদের আলোয় ভরা ছিলো পুরো আকাশ। উকায়দর অট্টালিকার উপরতলায় তার স্ত্রীর সঙ্গে শরাব পানে মশগুল ছিলো। হঠাৎ করে একটি পাহাড়ী গাভী এসে কিল্লার দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলো। তার স্ত্রী উপর থেকে সেটিকে দেখে বললো, তুমি কি কখনও এরূপ চাঁদনী রাত দেখেছো? এরকম শিকার কি কখনও হাতের কাছে পেয়েছো? সে বললো, না। উকায়দর পাহাড়ী বকরী শিকার করতে খুব পছন্দ করতো। শিকার করার উদ্দেশ্যে উপর তলা থেকে নেমে এলো সে। আরোহণ করলো একটি অশ্বে। সাথে সাথে

তার ভাই হাममान ও কয়েকজন খাদেমও অশ্বারোহণ করলো এবং শিকারের উদ্দেশ্যে একসাথে বেরিয়ে পড়লো। হজরত খালেদ তাদেরকে দেখলেন। গাভীটি পলায়ন করতে উদ্যত হলো। উকায়দর তাকে ধাওয়া করলো। এভাবে নিজেই হজরত খালেদের শিকারে পরিণত হলো। হজরত খালেদের সাথী-সঙ্গীগণ তাকে গ্রেফতার করলেন। উকায়দরের ভাই হাসসান মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু তাকে জীবন দিতে হলো। তার গোলাম ও খাদেমেরা পালিয়ে গিয়ে কিল্লাভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। উকায়দর বন্দী হলো। রসুলেপাক স. হজরত খালেদকে বলে দিয়েছিলেন, উকায়দরকে হত্যা কোরো না। বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে এসো। আসতে যদি সে অস্বীকৃত হয়, তবে তাকে হত্যা করে ফেলো। হজরত খালেদ উকায়দরকে বললেন, তুমি যদি চাও, তবে আমরা তোমাকে জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারি। তোমাকে রসুলেপাক স. এর কাছে যেতে হবে। কিল্লার চাবিসমূহ আমাদের হাতে দিয়ে দিতে হবে। আর উন্মুক্ত করে দিতে হবে কিল্লার সকল ফটক। উকায়দর প্রস্তাব মেনে নিলো। তার এক ভাইয়ের নাম ছিলো মুসাদ। সে কিল্লার হেফাজতে নিয়োজিত ছিলো। প্রথমে সে কিল্লা খুলে দিতে চাইলো না। কিন্তু বাধ্য হলো। হজরত খালেদ উকায়দরের সঙ্গে এইমর্মে চুক্তি করলেন যে, সে দু'হাজার উট ও ছ'শ বন্দী দান করবে। অপর বর্ণনায় আছে আটশ' ঘোড়া, চারশ' বর্ম ও চার হাজার বল্লমের কথা। একথাও সাব্যস্ত হলো যে, কিল্লার দায়দায়িত্ব তাঁকেই প্রদান করা হবে। তারপর উকায়দর ও তার ভাই মুসাদ হজরত খালেদের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলো। হজরত খালেদ আমর ইবনে উমাইয়া যমরীকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি দওমাতুল জন্দলে গিয়ে রসুলেপাক স.কে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, উকায়দরকে বন্দী করা হয়েছে এবং তার ভাই হাসসান নিহত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ পাঠানো হলো সোনা রূপা খচিত চাদর, যা ছিলো হাসসানের অধিকারে। আমর ইবনে উমাইয়া যমরী ওই চাদর সহকারে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলেন। কেউ কেউ চাদরটি হাতে নিয়ে বিস্ময়ের সাথে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, চাদরটি কী সুন্দর! কতো মোলায়েম! রসুলেপাক স. বললেন, সাআদ ইবনে মুআয আনসারীর ওই চাদর, যা তাকে জান্নাতে দেওয়া হয়েছে, এই চাদরটি দেখছি তার চেয়েও উত্তম ও মোলায়েম। হজরত সাআদ ইবনে মুআয শহীদ হয়েছিলেন খন্দক যুদ্ধের সময়। তখন অনারব দেশের জনৈক বাদশাহ একটি রেশমী জামা রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়েছিলো। আরববাসীরা জামাটি স্পর্শ করে বিস্মিত হয়ে বলতো, এটা রসুলেপাক স. এর জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন, বেহেশতে সাআদকে যে রুমাল দেওয়া হয়েছে তা এর চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ও নরম।

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. উকায়দর ও মুসাদের রক্তপাত ক্ষমা করে দিলেন। তদস্থলে তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করে দিলেন এবং তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন। কোনো কোনো সীরাতবিশেষজ্ঞ বলেছেন, যখন সে মদীনায় এসেছিলো তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। রসুলেপাক স. তাদের জন্য যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন তার মূল বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই নিরাপত্তানামা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'র পক্ষ থেকে উকায়দরের জন্য। সে ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং মূর্তিপূজা বর্জন করেছে'। নিরাপত্তানামার শেষে লেখা ছিলো— তারা যথাসময়ে নামাজ আদায় করবে এবং জাকাত আদায় করবে।

মসজিদে যেরার

রসুলেপাক স. তবুক থেকে যখন মদীনায় ফিরে আসছিলেন, তখন মদীনার পথে পথে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছিলো মসজিদ। যেমন মক্কা থেকে মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে যে সকল স্থানে রসুলেপাক স. অবস্থান করেছিলেন বা নামাজ পড়েছিলেন, সে সকল স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিলো। রসুলেপাক স. ফেরার পথে যি আদান নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। স্থানটি ছিলো মদীনা থেকে এক ঘন্টার পথের দূরত্বে। সেখানে পৌঁছার পর তিনি মসজিদে যেরার নির্মিত হওয়ার সংবাদ পেলেন। মুনাফিকেরা এটি নির্মাণ করেছিলো মসজিদে কুবার সমান্তরালে। রসুলেপাক স. মসজিদটিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। ওই মসজিদ নির্মাণের নেপথ্যের ঘটনা ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. হিজরত করে মদীনায় আগমনের পূর্বে ওই স্থানে বনী খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের মধ্য হতে আবু আমের নামের এক ধর্মযাজক ছিলো। সে ছিলো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের জ্ঞান রাখতো সে। ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযতের মধ্যেই মশগুল থাকতো সে। কিন্তু হৃদয়ে লালন করতো নেতৃত্বের বাসনা। প্রথম দিকে সে সব সময় মদীনাবাসীর কাছে আখেরী জামানার নবীর গুণাবলী ও আলামতসমূহ বর্ণনা করতো। বলতো, তাঁর গুণাবলীর কথা আমি জ্বিন ও ফেরেশতাদের কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন রসুলেপাক স. মদীনায় তশরীফ আনলেন এবং এই পবিত্র শহরের লোকজন তাঁর সৌন্দর্য ও কামালিয়াতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো, তখন তার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হলো হিংসার আগুন। এই সুযোগে শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করলো। সে লোকদেরকে উৎসাহিত করতে লাগলো রসুলেপাক স. এর অনুসরণ করা থেকে। লোকেরা বললো, তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যে রসুলেপাক স. এর গুণাবলী আমাদের কাছে বর্ণনা করতো? এখন আবার উল্টো কথা বলছো কেনো? সে বললো, আরে এতো ওই নবী নয়, যার গুণাবলী আমি বর্ণনা করতাম। এই লোকটির সঙ্গে শেষ নবীর

কিছুটা মিল অবশ্য রয়েছে। কিন্তু আসল যিনি, তিনি আবির্ভূত হবেন আরো পরে। রসুল স. তাকে ডেকে এনে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে দাওয়াত গ্রহণ করলো না। গ্রহণ করলো অবাধ্যতা ও বিরোধিতার পথ। বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের শান-শওকত বৃদ্ধি পেলো, তখন সে ভীত হয়ে মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় আশ্রয় নিলো এবং কুরাইশ কাফেরদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে। উহুদের যুদ্ধে সর্বপ্রথম কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমান বাহিনীর উপর তীর নিক্ষেপ করেছিলো সে। সেদিন থেকে মুসলমানগণ তার উপাধী দিয়েছিলো ফাসেক। রসুলেপাক স. তার জন্য বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! একে তুমি সাথী-সঙ্গী ও সাহায্যকারীবিহীন অবস্থায় হালাক করে দাও। তাই হয়েছিলো। উহুদ যুদ্ধের পর সে পালিয়ে রোম দেশে চলে গেলো। অপর এক বর্ণনায় আছে, সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সে চলে গেলো হুনায়নে। পরে আবার পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো রোম সম্রাট হেরাকালের কাছে। হলো তার কর্মচারী। তার ইচ্ছা ছিলো হেরাকালের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তার সে কামনা পূর্ণ হয়নি। পরে সে সেখান থেকে মদীনার মুনাফিকদের কাছে পত্র লিখে জানালো, তোমরা তোমাদের মহল্লায় মসজিদে কুবার বরাবর আমার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করো। আমি যখন মদীনায় আসবো তখন যেনো আমি সেখানে অবস্থান করতে পারি। সেখানে আমি জ্ঞানসাধনায় মশগুল থাকবো। সেখানেই আমরা মিলিত হয়ে আমাদের পরবর্তী কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে শলাপরামর্শ করতে পারবো।

তার কথা মতো মদীনার মুনাফিকেরা নির্মাণ করলো মসজিদে যেরার। রসুলেপাক স. এর প্রত্যাবর্তনের সময় মসজিদ নির্মাণ শেষ হলো। তবুক যাত্রার প্রাক্কালে মুনাফিকেরা তাঁর কাছে সরলতার ভান করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে যারা রোগী ও দুর্বল তাদেরকে বৃষ্টি ও শীত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটি জায়গা বানিয়েছি। আপনি যদি দয়া করে সেখানে গিয়ে একবার নামাজ আদায় করতেন, তবে আমরা কৃতার্থ হতাম। রসুলেপাক স. বললেন, এখন তো আমরা জেহাদে ব্যস্ত। ফেরার পথে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হলে সেখানে নামাজ পড়বো। যুদ্ধশেষে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করে যিআওয়ান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তারা আবার এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এমন সময় জিবরাইল আ. অবতীর্ণ হলেন এই আয়াত নিয়ে— 'ওয়াল্লাজীনাত্ তাখাযূ মাসজিদান দিরারাওঁ ওয়া কুফরাওঁ ওয়াতাফরীকাম বাইনাল মু'মিনীনা' (এবং যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে)(১০৭ঃ৯)। রসুলেপাক স. মালেক ইবনে দাখশাম, মাআন ইবনে আদী এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে বললেন, তোমরা জালেমদের ওই ঘরটি নিশ্চিহ্ন করে দাও।

তাঁরা নির্দেশ বাস্তবায়িত করলেন। স্থানটি আস্তে আস্তে ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে পরিণত হলো। সকল প্রকারের ময়লা আবর্জনা ও নাপাকী সেখানে ফেলা হতে লাগলো। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ঘরটি সেখান থেকে উৎপাটিত করার পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেখান থেকে ধোঁয়া নির্গত হয়েছিলো।

রসুলেপাক স. মদীনার নিকটবর্তী হলেন। মদীনাবাসীরা তাঁকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন শহরের উপকণ্ঠে। নারী ও শিশুরা স্বাগতসঙ্গীত গেয়ে উঠলো–

তালায়াল বাদরু আ'লাইনা,
মিন ছানিইয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা
মাদা'আ লিল্লাহি দায়ী।

কেউ কেউ বলেছেন, এই সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিলো তখন, যখন রসুলেপাক স. হিজরত করে মদীনায় আগমন করেছিলেন। তবে 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, কথাটি ভুল। কেননা ছানিয়াতুল ওয়াদা স্থানটি শামদেশের পথের দিকে, মক্কার পথের দিকে নয়। রসুলেপাক স. বলেছেন, মদীনায় এমন একটি কাওম আছে, যারা কোনো উপত্যকা পরিভ্রমণ করে না। তৎসত্ত্বেও তারা সব সময় তোমাদের সঙ্গেই থাকে। এটি হয়তো তিনি একথার পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছেন— 'নিয়্যাতুল মু'মিনীনা খাইরুম মিন আমালিহী' (মুমিনদের নিয়ত তাদের আমলের চেয়ে উত্তম)। আবার মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে এমন লোকও আছে, যারা তোমাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের থেকে আলাদা।

রসুলেপাক স. ফেরার পথে মদীনার কাছাকাছি একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলেন। বললেন, এই শহরটি পবিত্র। আর এই উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে। আমরাও তাকে ভালোবাসি। তিনি স. মদীনায় প্রবেশ করলেন। হজরত আব্বাস তাঁর প্রশস্তিমূলক কিছু কবিতা পাঠ করলেন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে কবিতাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

তবুকের অভিযান থেকে পশ্চাদপদতা অবলম্বনকারীদের অবস্থা

বহুসংখ্যক মুনাফিক তবুকের অভিযান থেকে বিরত ছিলো। বিভিন্ন ওজর আপত্তি দেখিয়েছিলো তারা। কারো কারো ওজর অবশ্য গ্রহণযোগ্য ছিলো। এতো গেলো মুনাফিকদের অবস্থা। কিন্তু সাহাবীগণের মধ্যে পাঁচজন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন তখন। তাঁরা হচ্ছেন— ১. আবু যর গেফারী ২. আবু খায়ছামা ছালেমী ৩. কাআব ইবনে মালেক ৪. মুবারা ইবনে রবী এবং ৫. হেলাল ইবনে উমাইয়া। তাঁদের অবস্থা ছিলো এরকম— হজরত আবু যর গিফারীঃ তিনি

রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মদীনা শরীফ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর উট থেমে যায়। তাই তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় ছামানপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে পায়ে হেঁটে তবুকের প্রান্তরে দেরীতে পৌঁছলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কে যেনো পায়ে হেঁটে এদিকেই আসছে। রসুলেপাক স. বললেন, আবু যর। তিনি রসুলেপাক স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে অভিবাদন জানালেন। বললেন, 'রাহিমাল্লাহু আবা যারিন তামশী ওয়াহ্দাহু ওয়া তামূতু ওয়া তুবআতু ওয়াহ্দাহু' (আল্লাহ্তায়ালা আবু যরকে রহম করুন। সে একা একা চলে। একা একাই পৃথিবী পরিত্যাগ করবে। পুনরুত্থিতও হবে একাকী)। এরপর হজরত আবু যরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এরকম অবস্থা হলো কেনো বলতো। তিনি তাঁর উটের থেমে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমার আপনজনদের মধ্যে তুমি আমার কাছে অত্যধিক প্রিয়। তুমি আমার কাছে আসতে যতগুলো কদম উঠিয়েছো, আল্লাহ্তায়ালা তার প্রতিটি কদমের বদলায় একটি করে গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।

হজরত আবু খয়ছামাঃ তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বের না হয়ে কয়েকদিন পর তবুক প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। কারণ এরকম— একদিন তিনি গৃহে ফিরলেন। দিনটি ছিলো অত্যন্ত উত্তপ্ত। তাঁর দু'জন স্ত্রী তাদের আপন আপন ঘরে পানি ছিটিয়ে দিয়ে শুরাহির মধ্যে ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করে উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত করে তাঁর প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। আবু খায়ছামা ঘরের দরজার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা দেখলেন। বললেন, রসুলুল্লাহ্ স. এখন ধূধূ মরুভূমিতে পথ চলছেন সূর্যের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে। আর আমি শীতল ছায়ায়। ঠাণ্ডা পানি ও উত্তম আহার্য নিয়ে আমার স্ত্রীরা অপেক্ষমাণ। এতো আরাম আয়েশের মধ্যে আমি থাকি কী করে। এ তো ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ্র শপথ! আমি এ গৃহে প্রবেশ করবো না। আল্লাহ্র নবীর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পথ চলতে থাকবো। তিনি সামান্য পাথেয় সঙ্গে নিলেন। তাঁর উটকে টেনে আনলেন। তারপর তার পিঠে উঠে দ্রুত যাত্রা শুরু করলেন। স্ত্রীগণ তার সঙ্গে নানাভাবে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। অবশেষে তবুকের ময়দানে গিয়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। সমস্ত অবস্থার বর্ণনা দিলেন তাঁর কাছে। রসুলেপাক স. তার জন্য দোয়া খায়ের করলেন। বাকী তিনজন সাহাবী কাআব ইবনে মালেক, সুরারা ইবনে রবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনাও সুবিখ্যাত। তন্মধ্যে কাআব ইবনে মালেকের কাহিনী এবং তাঁর তওবা করার ঘটনাটিই সর্বোত্তম। এই আয়াত ওই ত্রয়ী সাহাবী সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে— 'ওয়া আলাছ ছালাছাতিল লাজীনা

খুল্‌লিফ হাত্তা ইয়া দাকাত্‌ আ'লাইহিমুল আরদু বিমা রাহুবাত ওয়া দয়াকাত' (এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও, যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল)(১১৮ঃ৯)।

হজরত কাআব ইবনে মালেকের ঘটনা সবচেয়ে বিস্ময়কর। তবে তাঁর সাথে বাকী দু'জনের কথাও উল্লেখযোগ্য। কাআব ইবনে মালেক আনসারী খাযরাজী বায়াতে আকাবার সময় উপস্থিত ছিলেন। আর দ্বিতীয় আকাবার সময় তিনি ছিলেন সত্তুর জনের অন্যতম। এক বর্ণনানুসারে তিনি ছিলেন তখনকার তিপ্পান্ন জনের একজন। তাঁর তওবার কাহিনীটি দীর্ঘ। তিনি নিজেই বলেছেন, তবুকের অভিযানে অংশ গ্রহণ না করাটা ছিলো আমার জন্য এক চরম পরীক্ষা। পশ্চাদ্‌পদ অবলম্বন করার মধ্যে আমার প্রকাশ্যত কোনো ইচ্ছাও ছিলো না। এমন কোনো দায়িত্বও আমার উপরে ছিলো না, যে কারণে অংশগ্রহণ না করা আমার জন্য সমীচীন হতে পারে। যুদ্ধযাত্রার সাজসরঞ্জামও ছিলো, প্রস্তুত ছিলো উত্তম ছওয়ারী। ইতোপূর্বে কোনো যুদ্ধেই আমার কখনও দু'টি উট ছিলো না। কিন্তু তবুক সফরের জন্য আমি দু'টি উট ক্রয় করেছিলাম। বের হওয়ার সময় আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত ছিলো। মদীনা শরীফের খেজুরও পেকে গিয়েছিলো। সফরটি ছিলো সুদীর্ঘ। স্বভাবগতভাবেই যে কোনো মানুষ সূর্যের খরতাপে বের হতে চায় না। আমার সফরের সকল আসবাব-সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিলো, যেদিন বাহিনী যাত্রা শুরু করবে, সেদিন আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু যে দিন বাহিনী যাত্রা শুরু করলো সেদিন আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আজ যেহেতু কিছু কাজ বাকী আছে, কাজেই আগামী কাল বেরিয়ে পড়বো। এরকম ভাবতে ভাবতেই দু'তিন দিন বিলম্ব হয়ে গেলো। এরমধ্যে ইসলামী বাহিনী চলে গেলো অনেক দূরে। সময় নষ্ট হলো অনেক। আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঘর থেকে যখন বের হলাম, তখন পিপাসা ও চিন্তায় আরও কাতর হয়ে পড়লাম। এ বিষয়টিও আমাকে অধিক পেরেশান করে তুললো যে, এ সময় মদীনায় রয়েছে কেবল ওই সকল মুনাফিক যারা মিথ্যা ওজর পেশ করে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত আছে, আর আছে অসহায় ও দুর্বল লোকেরা। কারো ওজর ছিলো যথার্থ। আমি অনুশোচনার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলাম। কেননা আমি এ যুদ্ধে রসুলেপাক স. এর সঙ্গী হইনি। তিনি আমার ব্যাপারে হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উনায়স আনসারীর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কাআবকে তাঁর দু'টি কাপড় যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। কাপড় দু'টিকে সে খুবই পছন্দ করে। এ কথা শুনে হজরত মুআয ইবনে জাবাল বললেন, তুমি যা বলছো, তা খুবই খারাপ কথা। হে আল্লার রসুল! আমি তো তার ব্যাপারে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই জানি না। রসুলুল্লাহ্‌ স. কিছুই

বলেননি। হজরত কাআব বলেন, এর মধ্যেই আমি রসুলেপাক স. এর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেলাম। আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এমনকি তিনি স. মদীনায় এসে পৌঁছলেন। আমি এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম যে, কাল আমি কী ওজর পেশ করবো। আর কীভাবেই বা আমি পরিত্রাণ পাবো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের রোষ থেকে। আমার প্রিয়জনেরা আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিতে লাগলো। বললো, আমি যেনো এরকম ওরকমভাবে বাহানা পেশ করি। ঐদিন আমি তাদের কারো পারামর্শই নিলাম না। সকল দ্বিধা-সংশয় ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, যা সত্য তাই বলবো। এ ছাড়া নাজাত পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। আমি জানি যে, এ ক্ষেত্রে মুনাফিকেরা মিথ্যা শপথ খাবে এবং মিথ্যা ওজর পেশ করবে। রসুল স. প্রকাশ্যতঃ তাদের ওজর মেনে নিবেন। অন্তরের বিষয় আল্লাহ্তায়ালার উপর সোপর্দ করবেন।

আমি রসুলেপাক স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলাম। সালাম আরয করলাম। তিনি আমার প্রতি তাকিয়ে রাগত ভঙ্গিতে হাসলেন। তা দেখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বললেন, হে কাআব! তুমি কেনো পিছনে রয়ে গিয়েছিলে? তোমার কি সফরের সামগ্রী প্রস্তুত ছিলো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! নিঃসন্দেহে আমার সকল সামগ্রী প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে গাফেল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শয়তান আমাকে পথ বিচ্যুত করে বঞ্চিত ও অপদস্থ করে দিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, ওঠো এবং চলে যাও। আল্লাহ্তায়ালা তোমার জন্য যে ফয়সালা প্রদান করবেন, তার অপেক্ষায় থাকো। আমার প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়রা আমাকে তিরস্কার করতে লাগলো। বললো, তুমি অন্যদের মতো কোনো একটি ওজর পেশ করলে না কেনো? আমি বললাম, ওহী নাযিল হয়ে যাওয়াকে আমি ভয় করি। আশংকা করি ওহীর মাধ্যমে আমার মিথ্যাচারিতা ধরা পরে যাবে। আমার ব্যাপারটি যদি কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তির সঙ্গে হতো তা হলে আমি মিথ্যাই বলতাম। কিন্তু এখানে তো সত্যনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, আমার মতো এরকম পরিস্থিতি আর কারও বেলায় কি ঘটেছে? লোকেরা বললো, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবীর অবস্থাও তোমার মতো। তারা দু'জনও একই মসিবতে আক্রান্ত। তাঁদের কথা শুনে আমি আমার মনে কিছুটা সাহস পেলাম। ভাবলাম, ওরা দু'জনই পুণ্যবান, দেখা যাক কী হয়।

রসুলুল্লাহ্ স. সাহাবা কেরামকে নিষেধ করলেন, আমার সঙ্গে কেউ ওঠাবসা, মেলামেশা ও কথাবার্তা বলতে পারবে না। সকল সাহাবীই আমাকে পরিহার করলেন। এভাবে অতিবাহিত হলো সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন। আমি আমার জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরলাম। সংকুচিত হয়ে গেলো আমার পৃথিবী। মুরারা ইবনে রবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়াও পঞ্চাশ দিন ঘরে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। বার্ধক্যে

উপনীত হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আমি ছিলাম যুবক। তাই আমি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলাম। নামাজের জন্য আমি বেরিয়ে পড়তাম। কখনও কখনও রসুলেপাক স. এর কোনো পবিত্র মজলিশের এক কোণে বসেও যেতাম। রসুলেপাক স. কখনও কখনও আদরের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেন এবং আমার দুরাবস্থা অবলোকন করতেন। আমি যখন রসুলেপাক স. এর দিকে তাকাতাম তখন তিনি তাঁর দৃষ্টি আমার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন। কখনো কোনো কাজের জন্য আমি বাইরে বেরুতাম। কিন্তু কোনো মুসলমান আমার সঙ্গে কথা বলতো না। কেউ আমাকে সালাম দিতো না। সালামের জবাবও দিতো না। একদিন আমি মদীনা থেকে বাইরে গেলাম। আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদা আমাকে খুবই পছন্দ করতো। আমি তার কাছে গেলাম। মদীনার বাইরে তার একটি বাগান ছিলো। সে সেখানে নির্মাণকাজ করছিলো। আমি তার কাছে গেলাম এবং সালাম করলাম। কিন্তু সে কোনো জবাব দিলো না। বরং আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! তোমরা তো জানো যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি। আমার অন্তরে কোনো নেফাক ও শিরিক (অপবিত্রতা ও অংশীবাদিতা) নেই। তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেনো? সালামের জবাব দিচ্ছো না কেনো? একথা আমি তাকে তিন বার বললাম। অবশেষে সে শুধু বললো, আল্লাহু ওয়া রাসুলুহু আ'লামু (আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন)। আমার কান্না এলো। খুব করে কাঁদলাম আমি। ফিরে এলাম স্বগৃহের দিকে। পথিমধ্যে হাঠাৎ করে এক নাসারার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সে শামদেশ থেকে আসছিলো। সে আমার অবস্থা সম্পর্কে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে করে আসছিলো। লোকেরা যখন আমাকে দেখলো, তখন তারা সে লোকটিকে বললো, এই সেই ব্যক্তি তুমি যার অন্বেষণ করছো। সে ছিলো গাস্‌সানের বাদশাহর দূত। সে বাদশাহর কাছ থেকে আমার কাছে পত্র নিয়ে এসেছিলো। সে পত্রের বক্তব্য ছিলো এরকম— হে কাআব! জেনে রেখো, আমরা শুনেছি তোমার প্রভু অর্থাৎ মোহাম্মদের দিল তোমার প্রতি রুষ্ট এবং তিনি তোমাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তার সাহাবীগণ তোমার উপর জুলুম অত্যাচার করছে। তুমি তো মজলুম (অত্যাচারিত) পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত। তুমি এই পত্রের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝতে পারছো। সুতরাং কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে চলে এসো। আমাদের মেহেরবানী ও আতিথেয়তার নমুনা দেখে যাও। পত্রটি পাঠ করে আমি বুঝলাম, আমার উপর নুতন আরেকটি বিপদ আপতিত হয়েছে। এর চেয়ে বিপদ আর কি হতে পারে? আমার উপর এবং আমার দ্বীনের উপর কাফেরদের লোভ পতিত হয়েছে। তারা আমাকে কুফুরীর দিকে আহ্বান করছে। এতে আমার দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেলো। আমি পত্রটি আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম এবং পত্রবাহককে আমার সামনে থেকে চলে

যেতে বললাম। আরও বললাম, যাও। তোমার বাদশাহর কাছে গিয়ে বলো, আমার উপর আমার মনিবের যে আচরণ হচ্ছে, তা আমার প্রতি তোমাদের গুরুত্ব প্রদানের চেয়ে লক্ষগুণ শ্রেয়। আমার মনিবের পরিত্যাগ তোমাদের নৈকট্য লাভের চেয়ে উত্তম। আমি আমার গৃহে ফিরে এলাম। ঘরে পৌঁছে শুনলাম, রসুলেপাক স. কাউকে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছেন এ বিধান জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, আমি যেনো আমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে থাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি তাকে তালাক দিয়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে? লোকটি বললো, না। বরং নির্দেশ হচ্ছে, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলাম। অপর দু'জন অর্থাৎ হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবীকেও একই নির্দেশ দেওয়া হলো। তারাও যথারীতি নির্দেশ পালন করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সে সময় তাঁদের স্ত্রীগণই বলেছিলেন, তোমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকো। আমাদের কাছ থেকে তোমরা কোনো খেদমত গ্রহণ করতে পারবে না। একত্রাহারও এখন থেকে বন্ধ। যাহোক, উপরোক্ত বিধান জারী হওয়ার পর হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসুলুল্লাহ্ স. এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সাথী বয়োঃবৃদ্ধ এবং দুর্বল। কোনো সেবকও নেই। কাজেই আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেনো তার খেদমত করতে পারি। রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ, খেদমত করতে পারো। তবে অবশ্যই সহবাস থেকে বিরত থাকবে। তার স্ত্রী বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো চূড়ান্ত সীমার দুঃশ্চিন্তা ও আহাজারীর মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। সহবাস করার অবকাশ আর কোথায়?

হজরত কাআব বলেন, আমার পরিবারের কোন একজন আমাকে বললো, তোমার কী ধারণা? তুমিও যদি অনুমতি প্রার্থনা করতে। যাতে তোমার স্ত্রী তোমার খেদমত করতে পারে। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও তা করবো না। কেননা আমি জানি না অনুমতি দেওয়া হবে কি না। আমি যুবক। কাজেই অন্য কারও খেদমত গ্রহণ করার প্রয়োজন আমার নেই। হজরত কাআব বলেন, এভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হলো। রাতে অসহনীয় দুঃখ-যাতনা নিয়ে ঘরের ছাদের উপর উঠে পড়লাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনলাম। খুব খেয়াল করে শুনলাম। কেউ যেনো পাহাড়ের উপর থেকে বলছে, হে কাআব ইবনে মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ! মোবারকবাদ! তোমার তওবা কবুল হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীককে কাআব ইবনে মালেকের বাড়ির নিকটবর্তী মেলা পাহাড়ের উপর এসে ঘোষণা দিলেন, 'আল্লাহ্তায়ালা কাআব ইবনে মালেকের তওবা কবুল করে নিয়েছেন'। কাআব ইবনে মালেক বললেন, তারপর আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আসতে লাগলো এবং তারা আমাকে এই সুসংবাদ পৌঁছাতে লাগলো। মানুষের মধ্যে এইমর্মে শোরগোল হতে

লাগলো যে, মুখলিসদের (পরিশুদ্ধদের) তওবা কবুল হয়েছে। আমি যমীনের উপর মাথা রেখে শুকরিয়ার সেজদা আদায় করলাম। তারপর রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। মুহাজির সাহাবীগণ আমাকে মোবারকবাদ জানালেন। কিন্তু আনসারগণ চুপ রইলেন। অতঃপর আমি যখন সালাম দিলাম, তখন রসুলেপাক স. এর চেহারা মোবারক দেখলাম। যেনো পূর্ণিমার চাঁদ। শুভ্র ও উজ্জ্বল। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি স. আনন্দিত হলে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে উঠতো সুউজ্জ্বল। আমাকে দেখে তিনি স. বললেন, হে কাআব! তোমার জন্য মোবারকবাদ ওই দিনের, যেদিন তুমি তোমার মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। ওই দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিন তোমার উপর আসেনি। আর আজকের দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিনও তোমার উপর দিয়ে কখনও অতিবাহিত হয়নি। আজ তোমার তওবা রব্বুল ইজ্জতের দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা। হজরত কাআব বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তওবা কবুল হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ্র রাস্তায় পেশ করে দিচ্ছি। রসুলেপাক স. বললেন, এমন কোরো না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল। তিনি স. বললেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি স. বললেন, এক তৃতীয়াংশই ভালো, এক তৃতীয়াংশই অনেক।

হজরত সাঈদ বর্ণনা করেছেন, আমি হেলাল ইবনে উমাইয়ার কাছে গেলাম এবং তাকে সুসংবাদ দিলাম। তখন তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আমি মনে করলাম, তিনি হয়তো দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথাই উঠাবেন না। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই দু'জনের মধ্যে হেলাল ইবনে উমাইয়া পানাহার খুব কম করতেন। অধিকাংশ সময় বিরতিহীন রোজা রাখতেন। সবসময় আহাজারী ও কান্নাকাটির মধ্যে কাটাতেন।

মহান শায়েখগণের মধ্যে হজরত আবু বকর ওয়াররাককে লোকেরা প্রশ্ন করেছিলো, তওবা নসুহার আলামত কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তওবাকারীর নিকট তা হয়ে যাবে সংকীর্ণ। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসও তার কাছে মনে হবে কঠিন। যেমন হয়েছিলো হজরত কাআব এবং তাঁর দু'জন সাথীর বেলায়। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মায়াস্সাদেক্বীন' (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো আর সাদেকগণের সঙ্গী হয়ে যাও)। এই আয়াতে 'সাদেক্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই তিন সাহাবীকে। যারা যুদ্ধ থেকে পশ্চাদ্পদ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফিকদের বিপরীত সত্যবাদীতার পথ গ্রহণ করেছিলেন।

মুফাসসিরগণ আরও বলেন, তওবা কবুল হওয়ার পর তাঁদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তবুক যুদ্ধের পর মুসলমানগণ আপন আপন সমরাস্ত্র বিক্রি করা শুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন, জেহাদ শেষ। এই সংবাদ যখন রসুলেপাক স. শুনতে পেলেন, তখন বললেন— 'লা ইউজালু আ'সাবাতুম মিন উম্মাতী ইউজাহিদূনা আ'লাল হাক্কি হাত্তা ইয়াখরুজাদ দাজ্জাল' (আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে পর্যন্ত না দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে)(অপর এক বর্ণনায়— নবী ঈসার আবির্ভাব পর্যন্ত)।

তবুকের যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপদ অবলম্বনকারীগণের মধ্যে তিনজন সাহাবীর নাম বিখ্যাত। তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেই তাঁর পাক কালামে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'লাক্বাদ তাবাল্লাহু আলান নাবী ওয়াল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসারি' (আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি)(৯ঃ১১৭)। তারা ছাড়াও আরও দু'জন সাহাবী ছিলেন এরকম। একজন হচ্ছেন হজরত আবু যর গেফারী ও অন্যজন হজরত আবু খায়ছামা। হজরত আবু যর গেফারীর উট রাস্তায় বসে গিয়েছিলো। পরে তিনি পায়ে হেঁটে তবুকের প্রান্তরে পৌঁছেছিলেন। আর হজরত খায়ছামা মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি যেয়ে মিলিত হয়েছিলেন তবুক প্রান্তরে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আরও কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির। এই আবু লুবাবাই বনী কুরায়যার লোকদেরকে গলার দিকে ইশারা করে দেখিয়েছিলেন। এভাবে বুঝিয়েছিলেন, মুসলমানেরা তোমাদেরকে পেলে জবাই করে ফেলবে। রসুলেপাক স. যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন তখন তাঁকে ডেকে এনে বললেন, তুমি যে তোমার গলার দিকে ইশারা করে তাদেরকে দেখিয়েছো, এ ব্যাপারে কি আল্লাহ্‌তায়ালা গাফেল? এসব বলে তিনি তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। রসুলেপাক স. যখন তবুকের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন এই আবু লুবাবাই পিছনে রয়ে গেলেন। পড়ে গেলেন পশ্চাদ্‌পদ অবলম্বনকারীদের দলে। পরে তিনি যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন, তখন তিনি স. তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। হজরত আবু লুবাবা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সঙ্গে নিজেকে বাঁধলেন এবং বললেন, আমি এ বাঁধন থেকে নিজকে মুক্ত করবো না। হয় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে উঠিয়ে নিবেন, আর না হয় আমার তওবা কবুল করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী করীম স. এর সঙ্গে তবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে যারা পশ্চাদ্‌পদ অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা দশ। রসুলেপাক স. যখন মদীনা

প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁদের মধ্য হতে সাতজন এসে মসজিদের স্তম্ভের সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধে নিলেন। রসুলেপাক স. তাঁদের সামনে দিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। মসজিদে প্রবেশের পর জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? সাহাবীগণ বললেন, আবু লুবাবা এবং তার সাথীরা। যারা তবুক যাত্রায় আপনার সঙ্গী হয়নি। তাঁরা আরও বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি কি তাদেরকে ক্ষমা করবেন? তাদেরকে মুক্ত করে দিবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এদেরকে মাফ করবো না এবং এদেরকে অসমর্থ বলেও গণ্য করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং এদেরকে মুক্ত করে দিবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন। এরা আমার থেকে বিমুখ হয়েছিলো এবং বিরত ছিলো যুদ্ধ থেকে। পরে যখন 'ওয়া আখারুনা'তারাফূ বিজুনুবিহিম খালাতূ আ'মালান সলিহান ওয়া আখারা সাইয়্যিআন 'আসাল্লাহু আইঁয়াতূবা আ'লাইহিম' (এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন)(৯ঃ১০২) এই আয়াত নাযিল হলো, তখন রসুলেপাক স. কোনো একজনকে পাঠালেন তাদেরকে উন্মুক্ত করার জন্য এবং সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। মুহাজিরগণের মধ্য থেকে উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা উম্মে সালমার ভাই আবু উমাইয়ার নামও পাওয়া যায়। হজরত উম্মে সালামার সুপারিশ কবুল করে রসুলেপাক স. তাঁকে মাযুর (অসমর্থ) হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন।

প্রতিনিধিদলসমূহের আগমন

তবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হলো। 'ওয়ারাআইতান্নাসা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফ্‌ওয়াজা' (এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে)(১০৯ঃ২) এ আয়াতের চাহিদা মোতাবেক মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করলো। ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে শুরু করে দিলো দলে দলে। এ কারণেই নবম হিজরীকে 'সানাতুল ওফুদ' বা প্রতিনিধিদলের বছর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'রওয়াফদ' 'ওফুদ' এবং 'রওয়াফাদা' শব্দসমূহের অর্থ আগমন করা ও প্রবেশ করা। বিস্তারিত অর্থ— নির্বাচিত ব্যক্তিসমূহের জামাত, যাদেরকে কোনো বাদশাহ বা মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। তাদেরকে ওয়াফদ বলা হয়। এ শব্দের একবচন হলো ওয়াফেদ। কেউ কেউ বলেন, প্রতিনিধিদলসমূহের আগমন শুরু হয়েছিলো অষ্টম হিজরীর শেষ দিক জিইররানা নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। তবে অধিকাংশের মতে তবুকের অভিযানের পর থেকে। একথাই সঠিক। কেননা জিইররানা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তা শুরু হলেও ব্যাপকতা লাভ

করেছিলো নবম হিজরীতে। মুহাজিরগণ এবং অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ এ সকল প্রতিনিধিদলের সংখ্যা বলেছেন আট এর অধিক। রসুলেপাক স. এর নিকট যে সব প্রতিনিধিদলের আগমন হয়েছিলো তাদের কোনো কোনোটির বিষয়ে সকল সীরাতগ্রন্থেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে আমি এখানে ওই সকল দলের বিষয়েই আলোচনা করবো, যাতে রয়েছে দুর্লভ কোনো ঘটনা, বিস্ময়কর বর্ণনা, উপকারী কথা, যা রসুলেপাক স. এর মোজেযার সাথে সম্পৃক্ত। সর্বপ্রথম ওই সব দলের কথা আলোচনা করবো, যেগুলোর বর্ণনা রয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে। তারপর আলোচনায় আনবো 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' এবং অন্যান্য কিতাব থেকে প্রাপ্ত ঘটনাসমূহ।

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো প্রতিনিধিদলসমূহ যখন আগমন করতো, তখন তিনি স. আলীশান পোশাক পরিধান করতেন। সাহাবা কেরামকেও সুসজ্জিত থাকার হুকুম দিতেন। আগমনকারী প্রতিনিধিদলসমূহকে উত্তম স্থানের উৎকৃষ্ট ঘরসমূহে অবস্থান করার জন্য ব্যবস্থা করে দিতেন এবং নিঁখুতভাবে তাদের মেহমানদারীর আয়োজন করতেন। প্রত্যেককেই তাদের অবস্থা মোতাবেক হাদিয়া ও উপঢৌকন দিতেন।

প্রথম দল

প্রথম প্রতিনিধিদলটি ছিলো আসাদ ইবনে খুযায়মার দল। ওই দলের সদস্য সংখ্যা ছিলো দশজন। তাঁরা সকলেই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা রসুলেপাক স. এর কাছে তাঁদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন এভাবে— আমরা দুর্ভিক্ষকবলিত। বহুদূরের পথ পায়ে হেঁটে এসেছি। রাতে পেটভরে খেতে পারিনি। আমাদের দিকে কোনো সৈন্যবাহিনীও প্রেরিত হয়নি। আমরা তো স্বেচ্ছায় অতি আগ্রহের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'ইয়ামুন্নূনা আ'লাইকা আন আসলামূ কূল লা তামুন্নূ আ'লাইয়্যা ইসলামাকুম বালিল্লাহু ইয়ামুন্নূ আ'লাইকুম আন হাদাকুম লিল ঈমানি ইনকুনতুম সাদিক্বীন' (উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্ই ইমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও)(১৭ঃ৪৯)। রসুলেপাক স. এর উপর তাদের এহসান প্রকাশ যদি হয়ে থাকে তাদের অজ্ঞতার কারণে, তাহলে এর কোনো গুরুত্ব নেই। বস্তুতঃ তাদের ইসলামগ্রহণ তাদেরকেই উপকার প্রদান করবে দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এর দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হবেন— এরকম কথা তো বলা যেতে পারেই না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দার যাবতীয় কার্যকলাপ

দ্বারা লাভবান হওয়া থেকে পবিত্র। মিন্নাত বা এহসান এমন একটি কাজ, যে কাজে উপকারকারী উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনোরূপ বিনিময় বা প্রতিদান পাওয়ার লোভ করে না। রেসালাতের দরবার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার রবুবিয়াতের দরবারেরই প্রকাশস্থল। প্রকৃত অবস্থার গুঢ় রহস্য যদি তারা জানতো তাহলে তারা আল্লাহ্র দেওয়া ইসলামের নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকতো। মস্তক উত্তোলন করতে পারতো না।

দ্বিতীয় দল

দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলটি ছিলো ফাযারা গোত্রের। তাদের লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় বিশজন। তারা মদীনায় এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলো। এদলের মধ্যে খারেজা ইবনে হাসান এবং হার ইবনে কায়েস ইবনে হাসীম ফাযায়ীও ছিলেন। তারা সকলেই উয়ায়না ইবনে হাসীন ফাযায়ী কবীলার লোক ছিলেন। তারা 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব' শ্রেণীর ছিলেন। খারেযা উয়ায়না ইবনে হাসীনের ভাই ছিলেন। হার ইবনে কায়েস ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র। হার ইবনে কায়েস আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুকের নৈকট্যভাজন। দলটি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে তাদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করলো। তাদের দারিদ্র ও দুর্যোগের বিস্তারিত বিবরণ দিলো। বৃষ্টির জন্য রসুলেপাক স. এর নিকট প্রার্থনা জানানোর অনুরোধ করলো। রসুলেপাক স. মিম্বরের উপর আরোহণ করে দোয়া করলেন। পূর্ণ এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হলো। পরবর্তী সপ্তাহে তিনি দোয়া করলেন, বৃষ্টি হয় যেনো কেবল শস্যক্ষেতে, বাগ-বাগিচায় এবং ঝর্ণাসমূহে। মদীনা শহরে যেনো বৃষ্টিপাত না হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেলো। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এলো। ঘটনাটি এরকম— রসুলেপাক স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! বৃষ্টি বন্ধের কারণে প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সন্তানাদি না খেয়ে মরছে। পানির প্রবাহ রুদ্ধ। বৃক্ষরাজি শুকিয়ে যাচ্ছে। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন। ফলে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হলো। পরবর্তী জুমায় সেই লোক অথবা অন্য কোনো লোক এসে নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্র রসুল! বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়া করুন। অতঃপর রসুলেপাক স. দোয়া করলেন যেনো শুধু পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, ঝর্ণাসমূহ, শস্যক্ষেত ও বাগ-বাগিচায় বৃষ্টিপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেলো। সূর্য বেরিয়ে এলো।

তৃতীয় দল

তৃতীয় দলটি এসেছিলো বনী মুররা গোত্র থেকে। এদলের লোকসংখ্যা ছিলো তেরো জন। তাঁরা সকলেই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের সরদারের নাম ছিলো হারেছ ইবনে আউফ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার কাওম

ও খান্দান লুওয়াই ইবনে গালেবের বংশধর। একথা শুনে তিনি স. মৃদু হাসলেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন এবং তাদের শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁরা দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলেন এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, 'আল্লাহুম্মাস সুকিহিমুল গাইছু' (হে আল্লাহ্! তাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে প্লাবিত করো)। তারপর তিনি হজরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন তাদের প্রত্যেককে দশ আওকিয়া রৌপ্য এবং চারশ' দেরহাম করে দাও। আর হারেছকে বারো আওকিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা আপন আপন বাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে জানতে পারলেন, যে দিন রসুলেপাক স. মদীনায় বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করেছিলেন, সেদিন তাঁদের শহরেও বর্ষণ হয়েছিলো।

চতুর্থ দল

চতুর্থ প্রতিনিধি দলটি ছিলো বনী বুকার দল। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। তাঁদের এক জনের নাম ছিলো মাউনা ইবনে নাওরা ইবনে উবাদা ইবনুল বুকা। তাঁর বয়স হয়েছিলো একশ বছর। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রও ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো বিশর। মাউনা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আপনার পবিত্র হাতখানা আমার পুত্রের শরীরে বুলিয়ে দিন, সে যেনো আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাত মাউনার পুত্রের মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দিলেন। তাঁকে কয়েকটি বকরী দান করলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর থেকে বুকার এলাকা কখনোই দুর্ভিক্ষকবলিত হতো না। ওই দলের আরেক ব্যক্তির নাম ছিলো ওমর। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আব্দুর রহমান। তাঁকে তিনি স. তাঁদের শহরের জমি থেকে একখণ্ড জমিও দান করেছিলেন।

পঞ্চম দল

পঞ্চম প্রতিনিধি দলটি ছিলো কেনানার দল। তাঁরাও মুসলমান হয়েছিলেন। ওই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন ওয়াছেলা ইবনে আসকা লাইছী। রসুলেপাক স. তখন তবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওয়াছেলা বায়াত গ্রহণ করে তাঁর নিজের কবীলায় ফিরে গেলেন এবং তাঁর কাওমের লোকদের কাছে তাঁর নিজের অবস্থার কথা জানালেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তাঁর পিতা বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার সাথে কখনও কথা বলবো না। তাঁর পিতা তাঁর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু তাঁর বোন মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি মদীনা শরীফে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ইতোমধ্যে রসুলেপাক স. তাঁর বাহিনী নিয়ে তবুকের দিকে যাত্রা করেছেন। বাহিনীর পিছনে যাত্রা করলেন ওয়াছেলা। বললেন, কে আছে এমন, যে আমাকে সওয়ারীতে উঠিয়ে নিবে? গনিমতে আমার যে অংশ হবে

আমি তা তাকেই দিয়ে দিবো। কাআব ইবনে উজরা তাঁকে সওয়ারীতে উঠিয়ে নিলেন। অবশেষে তিনি মিলিত হতে সক্ষম হলেন রসুলেপাক স. এর সঙ্গে। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সঙ্গে উকায়দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত খালেদ এই যুদ্ধ থেকে গনিমতের মাল এনে রসুলুল্লাহ্ স. এর সামনে উপস্থিত করলেন। গনিমত বণ্টন করা হলো। ওয়াছেলার ভাগে পড়লো ছয়টি বা তার চেয়ে বেশী উট। তিনি শর্ত অনুযায়ী সেগুলো হজরত কাআব ইবনে উজরাকে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌রওয়াস্তে সওয়ার করিয়েছি। আমার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করতে চাই না।

জীবনীগ্রন্থবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ওয়াছেলা ইবনে আসকা রসুলেপাক স. এর খেদমত করেছিলেন তিন বৎসর। তিনি ছিলেন আসহাবে সুফ্‌ফা সাহাবীগণের অন্তর্ভূত। পরে তিনি বসরায় বসবাস করেন। তারপর শামদেশে চলে যান। পঁচাশি বা ছিয়াশি হিজরীতে তিনি দামেশকে ইনতেকাল করেন। তিনি আটানব্বই বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি দামেশকে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন।

ষষ্ঠ দল

ষষ্ঠ প্রতিনিধিদলটি ছিলো বনী হেলাল ইবনে আমেরের দল। ওই দলে ছিলেন যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মালেক, আবদ ইবনে আহরাম এবং কাবীলা ইবনে মুখারেক— এই তিনজনও। যিয়াদ তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হজরত মায়মুনার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জীবনীগ্রন্থবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স. হজরত মায়মুনার ঘরে গিয়ে হজরত যিয়াদকে দেখতে পেলেন। তিনি স. রুষ্ট হলেন। হজরত মায়মুনা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে তো আমার বোনের ছেলে। একথা শুনে তিনি স. শান্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন মসজিদে। হজরত যিয়াদও তাঁর অনুসরণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ডেকে কাছে বসালেন। তাঁর জন্য অনেক দোয়া করলেন। হাত বুলিয়ে দিলেন তাঁর মস্তকে। বনী হেলাল বলেন, তারপর থেকে আমরা তাঁর চেহারার মধ্যে বরকত ও নূরের আভা প্রত্যক্ষ করতাম।

এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর প্রিয়জনদেরকে ে্নহ করা ও ভালোবাসা রসুলেপাক স. এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর অন্যতম। আগমনকারীদের আর একজনের নাম ছিলো আবদ ইবনে আউফ। তিনি তাঁর নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ্। যেমন বনী বুকা'র প্রতিনিধিদলের আবদে আমরের নাম রেখেছিলেন আব্দুর রহমান। এই থেকে ঘটনা প্রতীয়মান হয়, গায়রুল্লাহ্‌র সঙ্গে আবদ শব্দের সম্পৃক্তি শুভ নয়। কবীলা ইবনে মুখারেক আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ঋণের এক বোঝা বহন করে চলেছি। ফেতনা ফাসাদ দূর করতে গিয়েই

আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের মধ্যে ভালো অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই আজ আমার এরকম অবস্থা। ঘটনাটি এরকম— আমার কাওমের এক লোক কোনো একজনকে খুন করেছিলো। ফলে তার উপর দিয়ত (রক্তপণ) অত্যাবশ্যক হয়। আমি ফেতনার আগুন নেভানোর উদ্দেশ্যে কর্জ করে সেই দিয়ত পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। এখন রসুলেপাক স. এর দরবারে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত কর্জ পরিশোধ করতে আমাকে সাহায্য করুন। রসুলেপাক স. বললেন, অপেক্ষা করো। যাকাতের কোনো মাল এলে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবো। তিনি স. আরও বললেন, তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কারও কাছে কোনো কিছু যাচ্ঞা করা বৈধ নয়। ১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্তি লাভ পর্যন্ত যাচ্ঞা করতে পারবে। ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে আর চাইতে পারবে না। ২. কোনো দুর্ঘটনায় সহায়-সম্পদ সব ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষের কাছে সওয়াল করা হালাল হবে। ৩. ওই ব্যক্তি যে অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত। আর তার কাওমের তিনজন জ্ঞানবান ও হুঁশিয়ার ব্যক্তির সাক্ষ্যও তার পক্ষে আছে। সে-ও হতে পারবে যাচ্ঞাকারী। উল্লেখ্য, শেষের বিধানটি করা হয়েছে শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ তার অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়ার বিষয়টি হবে প্রকাশ্য। এমতাবস্থায় সওয়াল করা হবে বৈধ। রসুলেপাক স. বললেন, হে কাবীসা। এই তিন অবস্থা ছাড়া কারও কাছে সওয়াল করা হারাম। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। সওয়াল করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে এরকম হাদিস রয়েছে অনেক। উলামা কেরাম বলেন, যার কাছে একদিনের খাবার না থাকে অথবা না থাকে লজ্জা নিবারণের কোনো বস্ত্র, তবে তার জন্য সওয়াল করা হালাল। বিনা প্রয়োজনে সওয়াল করা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে সকল আলেমের ঐকমত্য। তবে মতভেদ রয়েছে এই সম্পর্কে যে, আমলটি হারাম না মাকরুহ। সওয়াল করার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রাখা হয়েছে। ১. সওয়াল করতে যেয়ে নিজকে অপদস্থ করবে না। ২. কাকুতি মিনতি করবে না। ৩. দাতাকে কষ্টকর অবস্থায় ফেলবে না। এই তিনটি শর্তের যে কোনো একটি যদি লংঘিত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সওয়াল করা হবে হারাম। ফকীহ্ ইবনুল মুবারক বলেছেন, কোনো সওয়ালকারী যদি বলে 'লিওয়াজহিল্লাহ' (আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করুন) তাহলে তাকে কিছু দান করা আমার কাছে পছন্দনীয় মনে হয় না। কেননা দুনিয়া বা দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিকৃষ্ট বস্তু। সওয়ালকারী যখন 'লিওয়াজহিল্লাহ' (আল্লাহ্রওয়াস্তে) সওয়াল করে তখন দুনিয়া বা দুনিয়ার ধন-সম্পদকে সে সম্মান করে। এরকম আমলকে আল্লাহ্তায়ালা নিকৃষ্ট মনে করেন। সুতরাং ধমক ও শাসানোর উদ্দেশ্যে তাকে দান করা উচিত নয়। আর যদি কেউ বলে বিহাককিল্লাহ্ বা বিহাককি মুহাম্মদ অর্থাৎ আল্লাহ্র দেওয়া বা মোহাম্মদের দেওয়া বিধান হিসেবে দান করুন, তখন দান করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেউ যদি মিথ্যা বলে নিজের অভাব দেখিয়ে কিছু লাভ করে,

তবে সে ওই মালের মালিক হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি বলে নিজকে উলুববী (হজরত আলীর বংশ) বলে দাবী করে, তবে তাকে যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সঠিক আছে। আর যদি দেখা যায়, সে গোপনে গোপনে গোনাহ্র কাজে লিপ্ত, তবে তাকে দান করা থেকে বিরত থাকবে। তাকে যদি কিছু দান করেও দেয় তবুও সে উক্ত মালের মালিক হবে না। সে মাল তার জন্য হারাম হবে এবং দানকারীর উপর ওয়াজিব হবে ওই মাল ফিরিয়ে নেয়া। কেউ যদি কাউকে তার অকথ্যভাষ্য বা কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য দান করে, তবে সে দান গ্রহণ করা হারাম হবে। কোনো ভিক্ষুক যদি সওয়ালের উদ্দেশ্যে কারও হাতে চুম্বন করে আর এ জন্য তাকে কিছু দান করা হয় তবে তা মাকরুহ হবে। এক্ষেত্রে উত্তম হবে চুম্বনের জন্য তার প্রতি হাত বাড়ানো থেকে বিরত থাকা। যে সকল সায়েল সাওয়াল করতে এসে বাড়ির ফটকে ঢোল কাঁশা বাজায়, তাদেরকে দান করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এ জাতীয় মাসআলা বর্ণিত হয়েছে 'মাতালেবুল মুমিনীন' নামক পুস্তকে।

সপ্তম দল

সপ্তম যে দলটি ছিলো আমের ইবনে যা'সাআ এর দল। এ দলটির মধ্যে ছিলো আমের ইবনে তুফায়েল ইবনে মালেক ইবনে জাফর ইবনে কেলাব, আরবাদ ইবনে রবীয়া। অপর এক বর্ণনায় আছে, আরবাদ ইবনে কায়স, খালেদ ইবনে জাফর এবং হাসসান ইবনে আসলাম ইবনে মালেক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কথা। তাঁরা ছিলেন তাঁদের কাওমের নেতৃস্থানীয়। আমের ইবনে তুফায়েল ঐ বদবখত, যে সত্তুরজন ক্বারী সাহাবীকে শহীদ করেছিলো। এই প্রতিনিধি দলটির দুরভিসন্ধি ছিলো। সে আরবাদের সঙ্গে পূর্বাহ্নে সাব্যস্ত করে নিয়েছিলো যে, আমি মোহাম্মদকে যখন আলাপচারিতায় ব্যস্ত রাখবো, তখন তুমি পিছন দিক থেকে তাকে তলোয়ারের আঘাত করবে। তাকে রক্তাক্ত করে দিবে। তাতেই আমাদের অন্তর শান্তি পাবে। শয়তানের দলটি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলো। আমের বললো, হে মোহাম্মদ! আমি যদি মুসলমান হই আমার কী লাভ হবে? রসুলেপাক স. বললেন, অন্যান্য মুসলমানের যে অবস্থা হবে তোমারও তাই হবে। সে বললো, আপনার পর আমাকে আপনার খলীফা বানাবেন। তিনি বললেন, তোমার এবং তোমার কাওমের এমন অধিকার নেই। এর জন্য রয়েছে উপযুক্ত লোক। তাদের সম্পর্কে তুমি জানো না। সে বললো, তাহলে আমাকে বেদুঈনদের সরদার বানিয়ে দিন। আপনি লোকালয় ও শহরের শাসক থাকবেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে একটি জামাতের সরদার বানিয়ে দিবো, তুমি তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের

সৌভাগ্য তোমার নসিব হবে। সে বললো, আমি একটি কাওমের সরদার। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এক দুঃসাহসিক পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী আপনার বিপক্ষে দাঁড় করাবো। এক বর্ণনায় আছে, এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার উটের উপর আরোহণকারী এক বাহিনী নিয়ে আপনার বিপক্ষে দাঁড়াবো। একথা বলে সে আরবাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। বের হওয়ার সময় আরবাদকে বললো, আমি তোমাকে যা করতে বলেছিলাম, তা তো করলে না। আরবাদ বললো, আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমি ইচ্ছা করি তলোয়ার উত্তোলন করবো তখনই দেখি তুমি আমার এবং মোহাম্মদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ। বলো, আমি কি তোমাকে তলোয়ারের আঘাত করতে পারি? ওই দু'জন হতভাগা যখন বেরিয়ে গেলো, তখন রসুলেপাক স. বললেন, হে আল্লাহ্! আমেরের ক্ষতি থেকে আমাকে মুক্ত রেখো। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমের ও আরবাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। ঘটনা ঘটলো এরকম— আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পড়লো এবং আরবাদকে জ্বালিয়ে খতম করে দিলো। আর উটের গর্দানে যেরকম গুদ হয় আমেরের গলায় বের হলো সে রকম একটি গুটলী। সে সালুলিয়া নামের এক মহিলার ঘরে আশ্রয় নিলো। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলো। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলো। কিছুক্ষণ পর পথিমধ্যেই ঘোড়ার পিঠের উপর থাকা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হলো। এ প্রতিনিধি দলের বিষয়ে জীবনচরিতবিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন। এ দলের লোকসংখ্যা কতো ছিলো এবং তাদের মধ্যে কতোজন ইমান এনেছিলো সে সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ওই দু'জন হতভাগা ছাড়া অন্য সকলে হয়তো ইমান এনেছিলো। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. আমের ও আরবাদের বিষয়ে উপরোল্লিখিত দোয়া করার পর বললেন 'আল্লাহুম মাহদি বানী আমেরিন ওয়াগনিল ইসলামা আন আমেরিন' (হে আল্লাহ্! তুমি বনী আমের কবীলাকে হেদায়েত দাও আর আমের থেকে ইসলামকে অমুখাপেক্ষী করো)। এই বিবরণ থেকে বুঝা যায়, বনী আমের গোত্রের লোকেরা হেদায়েত পেয়েছিলো এবং ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিলো। বনী আমের বলে দোয়ার মধ্যে যে নাম উল্লেখ হয়েছে, সে আমের ইবনে তুফায়েল ভিন্ন অন্য কোনো আমের। তার পরিচয় হচ্ছে, আমের ইবনে মালেক ইবনে জাফর। আর তার কুনিয়াত হচ্ছে আবুল বার। সে ছিলো আমের ইবনে তুফায়েলের চাচা মালেকের পুত্র। সে রসুলেপাক স. এর কাছে এসে খুব ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেছিলো। বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! আমি আপনার হুকুম ও আপনার দ্বীনকে পছন্দনীয় মনে করি। কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। ক্বারীগণের একটি জামাতকে সে কোরআন ও শরীয়তের হুকুম আহকাম শিখানোর

জন্য নিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, আমি তাঁদেরকে আমার কাছেই রাখবো। আমি তাঁদের কোনো ধরনের ক্ষতি হতে দেবো না। আপনি এ বিষয়ে কোনো আশংকা করবেন না। কিন্তু তার ভাতিজা আমের ইবনে তুফায়েল সমস্ত অপকর্মগুলো বাস্তবায়ন করলো। বিরে মাউনার ঘটনায় তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম দল

অষ্টম প্রতিনিধি দলটি ছিলো আব্দুল কায়সের দল। আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দল সম্পর্কে সপ্তম হিজরীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে। তবে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে প্রতিনিধি দলের আগমন বর্ষে তার আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্দুল কায়সের দু'টি প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো। একটি দল এসেছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আরেকটি পুরাতন দল। আগমন করেছিলো পঞ্চম হিজরী বা তার পূর্বে। তারা বাহরাইন অঞ্চল থেকে এসেছিলো। উক্ত প্রতিনিধি দলে তেরো বা চৌদ্দজন আরোহী ছিলো। উক্ত দলটি ইমান ও শরাব পানের বরতন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো। ওই প্রতিনিধি দলটির প্রধান ছিলো আশাজ্জ নামক এক ব্যক্তি। তার সম্পর্কে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টি ভালো গুণ আছে। সহিষ্ণুতা আর ধীরস্থিরতা। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় দলটির আগমন হয়েছিলো 'সানাতুল ওযুদ' বা প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন বৎসরে। এ দলের লোকসংখ্যা ছিলো চল্লিশজন। ইবনে মিনদা আবুল খায়ের সাদী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আব্দুল কায়সের দল দ্বিতীয়বার যে আগমন করেছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাদিসের এ কথাটির মাধ্যমে— রসুলেপাক স. তাদেরকে দেখে বলেছিলেন, কী ব্যাপার! তোমরা যে সকলেই রঙ বদল করে ফেলেছো। এ কথাটি এ বিষয়টিই প্রমাণ করে যে, রসুলেপাক স. তাদেরকে পূর্বে দেখেছিলেন। তাছাড়া তাদের 'আল্লাহু ওয়া রাসুলুহু আ'লামু' বলা এবং 'বাইনানা ওয়া বাইনাকা কুফফারু মুদার' বলাও তাই প্রমাণ করে। তাছাড়া পূর্বের দলের বর্ণনাসংক্রান্ত হাদিসে হজ্বের বিষয়টি উল্লেখ ছিলো না। কেননা সে সময় হজ্ব ফরজ ছিলো না। এ বিষয়গুলোই প্রমাণ করে যে, ওই দলটির দ্বিতীয় বার আগমন ঘটেছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নবম দল

নবম প্রতিনিধি ছিলো যেমাম ইবনে ছা'লাবা। তাকে গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলো সাআদ ইবনে বকর নামক এক ব্যক্তি। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস

ইবনে মালেক বলেছেন, আমরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে ছিলোম। এমন সময় এক উষ্ট্রারোহী উপস্থিত হলো। সে তার উটটিকে বেঁধে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ কে? সাহাবা কেরাম বললেন, শাদা তাকিয়ায় যিনি উপবেশন করে আছেন। রসুলেপাক স. তখন শাদা তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে ছিলেন। লোকটি বললো, হে আব্দুল মুতালিবের সন্তান! রসুলেপাক স. বললেন, আমি উত্তর দিচ্ছি। যেমাম তোমার যা বলার বলো। সে বললো, আমি আপনাকে কয়েকটি কঠিন ও রুক্ষ প্রশ্ন করবো। আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো? রসুলেপাক স. বললেন, তোমার যা মনে আসে প্রশ্ন করতে পারো। যেমাম ছিলো লাল শাদা লম্বা জটধারী। সে বললো, ওই আল্লাহ্‌র কসম! যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন এবং আপনার পূর্ববর্তীগণকেও প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কি আপনাকে আমাদের কাছেই প্রেরণ করেছেন? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। অতঃপর সে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্বের বিষয়ে প্রশ্ন করলো। প্রত্যেকবারেই সে কসম দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছিলো। সে বললো, আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্‌তায়ালা কি আপনার উপর নামাজ ফরজ করেছেন? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। তারপর সে জাকাত ও হজ্বের বিষয়েও অনুরূপ প্রশ্ন করলো। অবশেষে সে বললো, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর উপরই আমি ইমান আনলাম। ইবনে ইসহাক স্বীয় কিতাব মাগাযিতে এর চেয়ে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। সে রসুলেপাক স.কে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে এরকম হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা তাঁর ইবাদত করবো? তার সাথে অন্য কিছুকে আমরা শরীক করবো না? আমরা কি ওই সকল মূর্তিকে পরিত্যাগ করবো, আমাদের পিতামাতাগণ যাদের উপসনা করে এসেছেন? আমরা কি সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট হবো? রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহুম্মা, নাআম। সে বললো, আমি যেমাম ইবনে ছা'লাবা, বনী সাআদ ইবনে বকরের ভাই। তারা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে এ জন্য যে, আমি যেনো আপনার দ্বীনের বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করি এবং আপনার কাছ থেকে যা শুনবো তা যেনো তাদের কাছে গিয়ে বর্ণনা করি। তারপর সে মসজিদের বাইরে গিয়ে উটকে বাঁধনমুক্ত করে তার উপর সওয়ার হয়ে চলে গেলো। তার কাওমের নিকট পৌঁছে সর্বপ্রথম লাত-মানাত আর হুবলের নিন্দাবাদ করলো। লোকেরা বললো, হে ইবনে ছা'লাবা! চুপ করো। এমন কথা বলছো কেনো? তুমি যা বলছো, এর কারণে তুমি শ্বেতী ধবল ও চর্ম রোগে আক্রান্ত হবে। পাগল হয়ে যাবে। সে বললো, তোমাদের মূর্খতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। মূর্তির কী ক্ষমতা আছে? ও তো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। হকতায়ালা একজন রসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর এক কিতাব নাজিল করেছেন, যা তোমাদেরকে শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শন

করতে পারে এবং পথভ্রষ্টতা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে। আমি আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তাঁর রসুল মোহাম্মদের রেসালতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি তাঁর পক্ষ থেকে কতিপয় আদেশ ও নিষেধ বাণী নিয়ে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার আগেই কাওমের সকল লোক মুসলমান হয়ে গেলো। তারা মসজিদ নির্মাণ করলো। আজান ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করলো। জাকাত আদয়ে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করলো। কোনো বিষয়ে মতভেদ বা সন্দেহের উদ্রেক হলে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তার সমাধান করে জেনে নিতে লাগলো।

দশম দল

দশম দলটি ছিলো বাল্লী'র প্রতিনিধিদল। আবু রুয়ায়ফা ছাবেত বলবী, যিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে ছিলেন, তিনি ছিলেন উক্ত বাল্লী কবীলার লোক। তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই হচ্ছে আমার কাওম। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার এবং তোমার কাওমের আগমনের জন্য মোবারকবাদ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই লোকগুলো আপনার দরবারে ইসলামের স্বীকৃতি দান করতে এবং তাদের কাওমের সকল লোকের ইসলামের যিম্মাদার হতে এসেছে। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন। ওই দলের এক বৃদ্ধ লোক ছিলেন যাকে বলা হতো আবু যইফ। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি যিয়াফত বা মেহমানদারী করতে খুব পছন্দ করি। এতে কি আমার কোনো সওয়াব হবে? রসুলেপাক স. বললেন, অবশ্য, অবশ্যই তুমি নেকী পাবে। প্রত্যেক ভালো বা মন্দ কাজ যা কোনো মুসলমান সম্পাদন করবে, সে তারই প্রতিদান পাবে। সে ধনী হোক, অথবা হোক নির্ধন। লোকটি বললো, মেহমানদারীর সময়সীমা কতো? তিনি বললেন, তিন দিন। তিন দিনের পর যতোদিন মেহমান অবস্থান করবে, তা মেহমানদারের জন্য সদকা হয়ে যাবে। কোনো মেহমানের বৈধ নয় কারও কাছে এতো বেশী দিন অবস্থান করা যাতে মেহমানদারের কষ্ট হয়। জাকাতের

একাদশ দল

একাদশ প্রতিনিধিদলটি ছিলো নুজায়বের প্রতিনিধিদল। এ দলের লোকসংখ্যা ছিলো তেরো জন। তারা তাদের জাকাতের মাল ও পশু নিয়ে এসেছিলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে মারহাবা দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের জাকাতের মালসমূহ নিয়ে যাও এবং তোমাদের কাওমের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোক যারা, তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তারা বললো, আমরা আমাদের জাকাতের

ওই মালসমূহ নিয়ে এসেছি, যা আমাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করার পর উদ্বৃত্ত হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে হজরত আবু বকর সিদ্দীক মন্তব্য করেছেন, নুজায়বদের প্রতিনিধিদলের ন্যায় আরবের অন্য কোনো প্রতিনিধিদল আগমন করেনি। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। তাঁর দয়া তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কল্যাণের ইচ্ছা করে, আল্লাহ্তায়ালা কল্যাণের জন্য তার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেন। কথিত আছে, তারা যখন ফরজ সুন্নত ও কোরআনের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলো, তখন তাদের প্রতি রসুলেপাক স. এর মহব্বত আরও বৃদ্ধি পেলো। তিনি তাদের প্রতি আরও দয়াপরবশ হয়ে গেলেন। তাদের জন্য উত্তম মেহমানদারীর নির্দেশ দিলেন হজরত বেলালকে। বিদায়ের কালে তাদেরকে সকলের চেয়ে বেশী উপঢৌকন দিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্দেগী করার চেষ্টা করে এবং দ্বীনের পথে মেহনত করে, সে দুনিয়াবী ফায়দাও লাভ করে থাকে।

হাদিয়া ও উপঢৌকন দেওয়ার পর রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আর কেউ কি বাকী আছে? তারা বললো, এক যুবক খাদেম আছে। সে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। আমরা তাকে আমাদের অবস্থানস্থলের হেফাজতের জন্য রেখে এসেছি। রসুলেপাক স. তাকে ডেকে আনালেন। সে রসুলেপাক স. এর মহান দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এই কাওমেরই লোক। আপনি তো তাদের অভাব দূর করে দিয়েছেন। আমার অভাবও দূর করে দিন। তিনি স. বললেন, বলো, তোমার অভাব কী? সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার লোকালয় থেকে এজন্য আসিনি যে, আপনি আমাকে দুনিয়াবী কোনো কিছু দান করবেন। যেমন আমার অন্যান্য সাথীদেরকে করেছেন। হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এজন্য এসেছি যে, আপনি আমার জন্য হকতায়ালার কাছে প্রার্থনা করবেন, তিনি যেনো আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার উপর রহম করেন। আমার অন্তরকে যেনো দুনিয়ার মালমাত্তা থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। পার্থিবতার প্রতি আমার অন্তর যেনো বীতশ্রদ্ধ হয়। রসুলেপাক স. দেখলেন যুবকটি দ্বীনের অন্বেষণকারী, আখেরাতের আকাঙ্খী এবং উচ্চ হিম্মতওয়ালা, তখন তার প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন— 'আল্লাহুম্ম মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াজ'আল গিনাহু ফী কালবিহী' (হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে দয়া করো। তার হৃদয়কে করো বৈভবিত)। তারপর রসুলেপাক স. তার দলের অন্যান্যদেরকে যেরকম উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তাকেও সে রকম উপঢৌকন দিলেন। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর সে হলো তার কাওমের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানিত। এমনকি হয়ে গেলো তাদের সরদার। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আখেরাতের তালেব হয়, সে

দুনিয়াও পায়, আখেরাতও পায়। তারপর তারা সকলেই আপন জনপদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। পরবর্তী বৎসরে বিদায় হজ্বের সময় তাদের একটি দল মিনায় এসে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলো। রসুলেপাক স. তাদের কাছে সেই যুবকের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, আমরা তার মতো অল্পে তুষ্ট ও ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি আর কখনও কোথাও দেখিনি। সমস্ত পৃথিবীও যদি তার দখলে এসে যায়, তবুও সে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না।

দ্বাদশ দল

দ্বাদশ প্রতিনিধিদলটি ছিলো লাখম কবীলার প্রতিনিধি দল। এ দলের লোকসংখ্যা ছিলো দশজন। তাদের সরদার ছিলো হানী ইবনে হাবীব। এ দলটি রসুলেপাক স. এর জন্য হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এসেছিলো ঘোড়া, কাবা এবং এক মশক শরাব। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা শরাব হারাম করে দিয়েছেন। হানী বললেন, তাহলে আমি তা বিক্রি করে দেই। তিনি বললেন, যিনি শরাব পান হারাম করে দিয়েছেন, তিনি তার কেনা বেচাও হারাম করে দিয়েছেন। ঘোড়া ও কাবা কবুল করলেন। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কাবাটি হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এ দিয়ে কী করবো? এটাতো পুরুষের জন্য হারাম। রসুলেপাক স. বললেন, এ থেকে স্বর্ণ আলাদা করে তার কিছু অংশ দিয়ে স্ত্রীর অলংকার বানিয়ে দাও। আর কিছু অংশ নিজের খরচের জন্য নিয়ে নাও। আর রেশমী কাপড়টি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের প্রয়োজন মিটাও। হজরত আব্বাস কাবাটি আট হাজার দেরহামের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এই কয়টি প্রতিনিধিদলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, এই বৎসর আরও প্রতিনিধিদলের আগমন হয়েছিলো। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা জীবনচরিত বিষয়ক অন্যান্য কিতাবে আছে। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' কিতাবের লেখক এর চেয়েও কম দলের কথা আলোচনা করেছেন।

বান্দা মিসকীন (শায়খে আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাব থেকে ওই সকল প্রতিনিধিদলের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফায়দা। যেহেতু ওই কিতাবে বৎসরের উল্লেখে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তাই তিনি সকল প্রতিনিধিদলের আগমনের আলোচনা নিয়ে এসেছেন একটি মাত্র অনুচ্ছেদে। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য ঘটনাটি সম্পর্কে এলেম হাসিল করা। সে সকল প্রতিনিধিদলের মধ্যে—

প্রথম দল

প্রথম আগমনকারী দলটি ছিলো হাওয়াযেন কবীলার প্রতিনিধিদল। রসুলেপাক স. যখন তায়েফ থেকে জিইররানায় তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা এসে মুসলমানদের দখলে তাদের যে সকল গোলাম বাঁদী ও মাল ছিলো, সেগুলোর দাবী করলো। রসুলেপাক স. তাদের বন্দীদের বিষয়টি বিবেচনায় এনেছিলেন। যার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম হিজরীর বর্ণনায়।

দ্বিতীয় দল

দ্বিতীয় দল ছিলো ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল। এ দলটি এসেছিলো তবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। মূল ঘটনা এরকম— রসুলেপাক স. যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ছাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আপনি ছাকীফদের উপর বদ দোয়া করুন। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! ছাকীফ গোত্রের লোকদেরকে হেদায়েত করুন এবং তাদেরকে আমাদের পক্ষে এনে দিন। অত:পর রসুলেপাক স. যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর পিছে পিছে উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী চলে এলেন। মুসলমান হয়ে গেলেন। আবেদন করলেন, তাঁকে যেনো আপন কাওমের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রসুলেপাক স. তাঁকে তাঁর কাওমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আপন কওমে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন ছিলো সেহরীর সময়। তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে উঠে কাওমের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রচার করতে লাগলেন। এমন সময় কোনো ব্যক্তি তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। সে তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শহীদ হওয়ার পর ছাকীফ গোত্রের লোকেরা কয়েকমাস অপেক্ষা করলো। তারপর তারা পরস্পরে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, যেহেতু চতুর্দিকের সকল আরব বায়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তাই এখন আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এখন আমাদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা উচিত। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কয়েক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। তাদের মধ্যে ওসমান ইবনুল আস নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রসুলেপাক স. তাদের জন্য মসজিদে নববীর প্রান্তরে একটি তাঁবু বানিয়ে দিলেন। তাদের নিবেদন ছিলো, লাত নামক মূর্তিমন্দিরটি যেনো ভাঙা না হয়। তিন বৎসর পর্যন্ত যেনো অটুট রাখা হয়। রসুলেপাক স. তাদের এ নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন। তিনি তাদের ওই মন্দির ধ্বংস করার জন্য আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং মুগীরা ইবনে শুবাকে প্রেরণ করলেন। তারা দ্বিতীয় নিবেদন করলো,

যেনো তাদেরকে নামাজ পড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আর নিজেদের হাতে মূর্তি ভাঙার হুকুম যেনো না দেওয়া হয়। রসুলেপাক স. বললেন, না। আমি যেরকম বলি সেরকমই হবে। মূর্তিনিধনই তো আমার উদ্দেশ্য। কাউকে না কাউকে তো মূর্তিনিধন করতেই হবে। তবে নিজের হাতে ভাঙাই উত্তম। আর নামাজ মাফ করে দেওয়ার তো কোনো সুযোগই নেই। কেননা যে ধর্মে নামাজ নেই, তার মধ্যে কল্যাণ নেই। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের নেতা নির্ধারণ করলেন হজরত ওসমান ইবনুল আসকে, তিনি ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ। কিন্তু ইসলাম ও কোরআন শিক্ষাদানের ব্যাপারে ছিলেন অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। নেতা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর এলাকার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং হজরত মুগীরা ইবনে শুবা। তাঁরা সেখানে পৌঁছে লাতের মূর্তিমন্দির গুঁড়িয়ে দিলেন। হজরত ওসমান ইবনুল আস নিজে বলেছেন, আমি সুরা বাকারা মুখস্থ করছিলাম। ওই সময় বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কোরআন আমার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। মুখস্থ রাখতে পারি না। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হস্ত আমার সীনার উপর রেখে বললেন, হে শয়তান! ওসমানের সীনা থেকে তুই দূর হয়ে যা। তারপর থেকে যা কিছু মুখস্থ করতাম, তা মনে থাকতো। কখনও ভুলতাম না। আমি আরও নিবেদন করেছিলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! শয়তান আমার এবং আমার নামাজ ক্বেরাতের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। রসুলেপাক স. বললেন, এই শয়তানের নাম খিনজিব। 'খিনজিব' অর্থ গোশতের টুকরা। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি যখন ওই শয়তানের অবস্থান উপস্থিতি তোমার দিলের মধ্যে অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কোরো। 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলবে। আমি সেরকমই করলাম। আল্লাহ্তায়ালা আমার উপর থেকে শয়তানের কুপ্রভাবসমূহ দূর করে দিলেন।

তৃতীয় দল কিন্দার প্রতিনিধি দল

তৃতীয় প্রতিনিধিদলটি ছিলো কিন্দার দল। কিন্দা ইয়ামনের একটি কবীলার নাম। কিন্দা মূলত ছুর ইবনে উফায়েরের উপাধি ছিলো। যে ছিলো ইয়ামের কবীলার আদি পিতা। তার কিন্দা উপাধি হওয়ার কারণ হচ্ছে ছুর ইবনে উফায়ের তার পিতার সঙ্গে নাফরমানী করে মামার সঙ্গে মিলিত হয়ে ছিলো। 'কিন্দা' শব্দটি এসেছে 'কুনুদ' থেকে। এর অর্থ নাশুকুরী করা। যেমন কোরআন মজীদে এসেছে— 'ইন্নাল ইনসানা লিরব্বিহি লাকানূদ' (মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)(১০০:৬)। ইয়ামনে তার আওলাদদের নামকরণ হয়ে গিয়েছিলো কিন্দা। উক্ত কিন্দা কবীলার সত্তুর বা আশিজন লোক আরোহী অবস্থায় মাথার চুল আঁচড়িয়ে জরির জামা পরিধান করে হাতিয়ার ঝুলিয়ে ইয়ামনী

চাদরের জুব্বা, যার পাড় ছিলো রেশমের তা পরিধান করে রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? তারা বললো, হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। রসুলেপাক স. বললেন, তাহলে রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছো কেনো? একথা শোনামাত্র তারা তাদের রেশমী বস্ত্র শরীর থেকে খুলে ছিঁড়ে ফেলে দিলো।

চতুর্থ দল

চতুর্থ দল ছিলো আশআরী ও ইয়ামনবাসীর দল। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকমই শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা শায়েখ ইবনে হাজার আছকালানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আহলে ইয়ামন মানে ওই সকল আহলে ইয়ামন, যারা আশয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। তারা ছিলো হিময়ার গোত্রের। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার কাছে ধর্ম সম্পর্কে জানতে এসেছি। তারা রসুল করীম স. এর কাছে সর্বপ্রথম সৃষ্টির বিষয়ে প্রশ্ন করলো। জানতে চাইলো, সর্বপ্রথম কী ছিলো এবং কী রকম ছিলো। রসুলেপাক স. বললেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্তায়ালাই ছিলেন এবং তাঁর সাথে আর কিছুই ছিলো না। তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপর। আর লওহে মাহফুজে সব কিছুই লিখিত ছিলো। এ দু'টি দলের আগমন এক সাথে হয়নি। হজরত আবু মুসা আশআরীর সঙ্গে দলটি এসেছিলো প্রথমে। সপ্তম হিজরীতে। খয়বর বিজয়ের সময়। আর হিময়ারের দলটি আগমন করেছিলো নবম হিজরীতে বিদায় হজ্বের বৎসরে। এই দু'টি দলেরই প্রশংসা করেছেন রসুলেপাক স.। তাদের ব্যাপারে জানিয়েছেন সুসংবাদ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. একবার বললেন, তোমাদের কাছে এমন একটি দল আসছে, যাদের অন্তর খুব কোমল। একটু পরেই আশআরীদের দলটি বিজয়সঙ্গীত গাইতে গাইতে আসতে লাগলো। হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, ইয়ামনবাসীরা এসেছে। তাদের দিল খুব কোমল এবং দুর্বল। তাদের ইমান এবং ইমানী হেকমত আছে। বকরী পালনকারী লোকদের অন্তরে ছাকীনা বা দিলের শান্তি আছে। আর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা আছে উট পালনকারীদের মধ্যে। সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, বনী তামীমের একটি দল রসুলেপাক স. এর কাছে এলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে বললেন, হে বনী তামীম! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তারা বললো, আপনি তো আমাদেরকে কেবল সুসংবাদ দিলেন। কিছু সম্পদও দিন। একথা শুনে রসুলেপাক স. এর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেলো। এমন সময় ইয়ামনবাসীর একটি দল আগমন করলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা ওই সুসংবাদটি কবুল করো, যা বনী তামীমরা কবুল করেনি। আশআরীগণ বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তা কবুল

করলাম। বনী তামীম গোত্রের লোকেরা 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' শ্রেণীর লোক ছিলো। তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে কঠোরতা ও রুক্ষতা জমাটবাঁধা অবস্থায় ছিলো। অপরপক্ষে ইয়ামনবাসীরা ছিলো জ্ঞানবান, পরিচ্ছন্ন ও নরম অন্তরবিশিষ্ট। হেকমত ও মারেফতের প্রেরণায় পরিপূর্ণ। বিশেষ করে হজরত আবু মুসা আশআরীর কোরআন পাঠের সৌন্দর্য ছিলো অতুলনীয়। তাঁর সম্পর্কে হাদিছ শরীফে উক্ত হয়েছে 'উতিয়া মিয্মারুম মিম মাযামীরি আলি দাউদ' (তাঁকে নবী দাউদ এবং তাঁর বংশধরদের ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠ দেওয়া হয়েছে)। শায়েখ আবুল হাসান আশআরী ছিলেন আকায়েদ শাস্ত্রের ইমাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথিকৃৎ। তিনি হজরত আবু মুসা আশআরীর বংশধর ছিলেন। তিনি পৌঁছেছিলেন এলেম, হেকমত ও মারেফতের নিদর্শন পর্যন্ত।

পঞ্চম দল

পঞ্চম দলটি ছিলো হামাদানের দল। হামাদান ইয়ামনের একটি জনপদের নাম। বায়হাকী সহীহ্ সনদের ভিত্তিতে হজরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে সাহাবা কেরামের একটি জামাতের সঙ্গে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেখানে ছয়মাস পর্যন্ত থাকলাম। তাদেরকে পুনঃপুনঃ ইসলামের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু তারা কবুল করলো না। অতঃপর হজরত আলীকে সেখানে প্রেরণ করা হলো। তিনি ইয়ামনবাসীদের কাছে রসুলেপাক স. এর একখানা চিঠি পাঠ করে শোনালেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। হজরত আলী রসুলেপাক স. এর কাছে পত্র লিখে জানালেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুলেপাক স. পত্র পাঠ করে সেজদা করলেন। সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন, আসসালামু আলা হামাদান, আসসালামু আলা হামাদান, আসসালামু আলা হামাদান।

ষষ্ঠ দল

রসুলেপাক স. এর কাছে ষষ্ঠ যে দলটি এসেছিলো, তা ছিলো মুযায়নার দল। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, নোমান ইবনে মাকাররেন বলেছেন, রসুলেপাক স. এর দরবারে আমরা মুযায়না কবীলার চারশ' লোক এসেছিলাম। আমরা যখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলাম, তখন রসুলেপাক স. হজরত ওমর ফারুককে বললেন, তাদেরকে রাস্তার খরচ দিয়ে দাও। হজরত ওমর বললেন, আমার কাছে তো সামান্য কিছু খেজুর আছে। আমার মনে হয় তারা এতে সন্তুষ্ট হবে না। কবুলও করবে না। রসুলেপাক স. বললেন, যাও, তাদেরকে পাথেয় দেওয়ার ব্যবস্থা করো। হজরত ওমর তাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁরা যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন, ঘরে রয়েছে শাদা কালো বিভিন্ন

প্রকারের বিরাট খেজুরের স্তুপ। সকলেই তাদের প্রয়োজন মতো খেজুর নিয়ে নিলো। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে আমিই ছিলাম সর্বশেষ ব্যক্তি। সকলেই খেজুর নিয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হলো, এখান থেকে একটি খেজুরও কমেনি। নোমান ইবনে মুকাররেন মযনী তাঁর সাত ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, তিনি যখন এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এসেছিলেন, তখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেননি। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, ইমানের ঘর যে রকম আছে, সে রকম নেফাকের ঘরও আছে। তবে মাকাররেন পরিবারের ঘর ছিলো ইমানের ঘর।

সপ্তম দল

সপ্তম প্রতিনিধি দলটি ছিলো দাউস এর। এটি একটি জনপদের নাম, হজরত আবু হুরায়রা এই জনপদের। তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে এসেছিলেন খয়বরের প্রান্তরে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, দাউসের দলটিতে তুফায়েল ইবনে আমর দাউসী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি হিজরতের পূর্বে রসুলেপাক স. এর মক্কাবাসের সময়েই তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন এবং হিজরত পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পরে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে খয়বরে মিলিত হন এবং তাঁর স. মহাতিরোধান পর্যন্ত খেদমতে থাকেন। তাঁর উপাধি ছিলো যুন্নুর। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের শাসনকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি শহীদ হন হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে। তিনি ছিলেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরানো কবি। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তুফায়েল ইবনে আমর দাউসী নিজে তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— আমি মক্কায় এলাম। রসুলেপাক স. তখন মক্কায়। আমার কাছে কুরাইশদের কতিপয় ব্যক্তি এসে বললো, আমাদের শহরে আমাদেরই মধ্য হতে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। তার কারণে আমাদের সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। তার কথায় রয়েছে এমন যাদু, যার কারণে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ে বিভেদের সৃষ্টি হয়। আমাদের আশংকা হচ্ছে, না জানি তোমাদের কাওমের মধ্যেও উক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের উচিত তার সঙ্গে কথা না বলা এবং তার কোনো কথা না শোনা। আল্লাহ্‌র কসম! তার পর থেকে কুরাইশরা এ বিষয়ে সর্বদাই আমাকে তাগিদ দিয়ে আসছিলো এবং আমাকে মানা করে আসছিলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমি এই মর্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, আমি তাঁর কোনো কথা শুনবোও না, তাঁর

সঙ্গে কোনো কথা বলবোও না। আমি আমার কর্ণকুহরে রুটির টুকরা ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে তাঁর কোনো কথা আমাকে শুনতে না হয়। হঠাৎ একদিন আমি সকাল বেলা মসজিদে হারামে গেলাম। রসুলুল্লাহ্ স.কে দেখলাম। দেখলাম কাবাঘরের পাশে তিনি নামাজ পড়ছেন। আমি আমার অজান্তেই তাঁর কাছে চলে গেলাম। তারপর আল্লাহ্তায়ালা আমার কানের মধ্যে তাঁর বাণী প্রবেশ করালেন। কী বিস্ময়কর কোমল ও শ্রুতিমধুর বাণী। মনে মনে বললাম, আমার মা আমার জন্য কাঁদুন। আমি নিজে একজন ফাসাহাত বালাগাতপূর্ণ অনলবর্ষী কবি। কালামের সৌন্দর্য ও কদর্যতা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। কুরাইশরা আমাকে বাধা দেয়, আমি যেনো তাঁর কথা না শুনি। তিনি যদি ভালো কথা বলেন, তাহলে তাঁর কথা আমি কেনো শুনবো না। আর যদি মন্দ কথা বলেন, তাহলে অবশ্যই তা বর্জন করবো। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রসুলেপাক স. তাঁর গৃহের দিকে ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। আমি বললাম, হে মোহাম্মদ! আপনার গোত্রের লোকেরা তো আমাকে এরকম এরকম বলে। আমি তাদের ওই সব কথা শুনে অঙ্গীকার করেছিলাম, আমি আপনার সঙ্গে কখনও কোনো কথা বলবো না এবং আপনার কোনো কথা শুনবোও না। তাই আমি সব সময় আমার কানের ভিতর রুটি ঢুকিয়ে রাখি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা আপনার কথা আমার কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আমি স্বীকার করছি, আপনার কথার চেয়ে উত্তম ও কল্যাণকর কথা আমি ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। সুতরাং আপনার অবস্থা আমার কাছে খুলে বলুন। রসুলেপাক স. কোরআন পাকের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ্র শপথ! এর চেয়ে ভালো কোনো কালাম আমি আর কখনও শুনিনি। এর চেয়ে ন্যায়সঙ্গত কথাও ইতোপূর্বে কখনও আমার কানে প্রবেশ করেনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। কালেমা শাহাদত পাঠ করলাম। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার গোত্রের একজন মান্যবর ব্যক্তি। আমার কথা সকলেই মান্য করে। আমার ইচ্ছা, আমি আমার জনগোষ্ঠীর কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানাবো। আহ্বান করবো আল্লাহ্র পথের দিকে। এমতাবস্থায় আমার এমন কোনো নিদর্শন বা আলামত দরকার যা দেখে তারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারে। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে নূর দান করো। তখন সেই নূর আমার দুই চোখের মধ্যে প্রদীপের আলোর মতো চমকাতে লাগলো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্! আমার এই নূরের দ্যুতি দুই চোখের ভিতর থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও স্থাপন করে দাও। যাতে আমার জনগোষ্ঠীর লোক একথা বলতে না পারে যে, এই লোক স্বধর্ম ত্যাগ

করেছে বলে শ্বেতরোগে আক্রান্ত হয়েছে। তারপর সেই নূর আমার চাবুকের অগ্রভাগে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। রাতের বেলায় জ্বলতে লাগলো প্রদীপের মতো।

আমি আমার জনপদে পৌঁছলাম। জনপদবাসীদেরকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালাম। স্বগৃহে অবস্থান নিলাম। আমার বৃদ্ধ পিতা এলেন। তাঁকে বললাম, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও। তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি এমন কথা কেনো বলছো? আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মোহাম্মদের ধর্মের অনুসরণ করছি। পিতা বললেন, হে আমার পুত্র! তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। আমি বললাম, যাও গোছল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এসো। আমি তোমাকে ওই বিষয়ে শিক্ষা দিবো, যা আমি জানি। পিতা গোছল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এলেন। আমি তাকে ইসলাম ধর্মের কথা বললাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কোনো কোনো পুস্তকে এসেছে, তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বটে; কিন্তু মাতা করেননি। ওয়াল্লাহু আ'লাম। তুফায়েল ইবনে আমর দাওসী বলেন, অতঃপর এলো আমার স্ত্রী। আমি তাকেও একই কথা বললাম। বললাম, দূর হয়ে যাও। আমি তোমার কেউ নই। তুমিও আমার কেউ নও। সে বললো, তা কেমন করে হবে? আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। সে বললো, তোমার ধর্মই তো আমার ধর্ম। এভাবে সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। অতঃপর আমি দাউস জনপদবাসীদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালাম। তারা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করতে লাগলো। আমি রসুলেপাক স. এর খেদমতে এসে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! দাউস কবীলার লোক আমার উপর প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে আছে। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। রসুলেপাক স. তাদের জন্য দোয়া করলেন— হে আল্লাহ্! দাউসকে সত্যপথ প্রদর্শন করো। আমাকে বললেন, যাও। আপন গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আমন্ত্রণ জানাও। আমি আমার জনপদে ফিরে গেলাম। দাউস জনপদের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ইসলামের ডাক দিলাম। এক সময় আমি খয়বরে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলাম। দাউস কবীলার সত্তুর বা আশিটি পরিবার মদীনায় এসে বসবাস করতে লাগলো। রসুলেপাক স. অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে আমাদেরকেও অংশ দিলেন। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তুফায়েল ইবনে আমর দাউসী কাদীমুল ইসলাম ছিলেন। ইবনে আবী হাতেম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি হজরত আবু হুরায়রার সঙ্গে খয়বরে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ ওইটি ছিলো তার দ্বিতীয় আগমন।

অষ্টম দল

অষ্টম প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিলো ইয়ামনের বাহরা নামক একটি জনপদ থেকে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইয়ামনের তেরো ব্যক্তি। তাঁরা মদীনায় এসে উঠলেন হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের ঘরে। হজরত মেকদাদের পরিবার তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন। আতিথেয়তা করার জন্য আনা হলো হায়সের একটি বড় পেয়ালা। হায়স এক প্রকারের খাবার, যা খেজুর, ঘি ও ছাতু দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তারা পরিতৃপ্তির সাথে হায়স আহার করলেন। তারপর হজরত মেকদাদের একটি ছোট পেয়ালায় করে কিছু হায়স রসুলেপাক স. এর খেদমতে উম্মত জননী সাইয়্যেদা উম্মে সালামার গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। রসুলেপাক স. তা আহার করলেন। আহার করলেন অন্যান্য গৃহবাসীগণও। মেহমানদারীও করা হলো কিছুদিন পর্যন্ত রেখে রেখে। খাদ্যের পরিমাণ কিছুই কমছিলো না। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, হে আবু মা'বাদ! (হজরত মেকদাদের উপনাম) তুমি আমাদেরকে এমন খাবার খাওয়ালে যা আমাদের কাছে সকল খাবারের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়। আমরা এ সময় ছাড়া এরকম খানা আর কখনও খেতে পারিনি। অতঃপর আবু মা'বাদ তাদেরকে জানালেন, এই খাবার তোমাদের জন্য রসুলেপাক স. পাঠিয়েছেন। আর এর আস্বাদের আধিক্য ঘটেছে রসুলেপাক স. এর আঙ্গুলের বরকতে। তারা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসুল! তাদের বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হলো। তারা ইসলামের সব বিষয়ে বিশ্বাস অর্জন করতে লাগলো। কিছুদিন অবস্থান করলো। অবশেষে রসুলেপাক স. তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দান করতঃ বিদায় দিলেন। তারা ফিরে গেলো আপন পরিবার পরিজনের কাছে।

নবম দল

নবম দল ছিলো উযরার প্রতিনিধিদল। শামদেশের একটি স্থানের নাম ছিলো উযরা। সেখানকার লোক ইশ্ক-ভালোবাসার মধ্যে সবসময় ডুবে থাকে। ভালোবাসার জন্য তারা জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এ প্রতিনিধি দলের লোকসংখ্যা ছিলো বারোজন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিলো হুমরা ইবনে নোমান। রসুলেপাক স. তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে শামদেশ বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বাদশাহ হেরকাল পলায়ন করবে বলে আগাম সংবাদ জানিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাকে হাদিয়া তোহফা দিয়ে তার আপন লোকালয়ের দিকে বিদায় দিয়েছিলেন।

দশম দল

দশম দলটি আগমন করেছিলো মাহারেব জনপদ থেকে, বিদায় হজ্বের বৎসরে। তাদের গোত্রের লোকেরা ছিলো কঠিন হৃদয়ের। যখন রসুলেপাক স. বিভিন্ন জনপদবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন এই জনপদের দশ ব্যক্তি এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং পরে তারা আপন লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

একাদশ দল

একাদশ দলটি রসুলেপাক স. এর কাছে আগমন করেছিলো সদা থেকে। সদা ইয়ামনের একটি বসতির নাম। অষ্টম হিজরীতে জিইররানা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুলেপাক স. কায়স ইবনে মাআদ ইবনে উবাদাকে চারশ' লোক সহকারে উক্ত বসতির দিকে প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে সদা বসতির এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর খেদমতে পৌঁছে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই এ খেদমতটি করবো। আমি নিজেই আমার কাওমের দায়িত্ব নিচ্ছি। রসুলেপাক স. কায়স ইবনে সাআদকে ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের লোকদের কাছে গেলো। সেখানে ইসলামের বিস্তার ঘটলো। পরে বিদায়হজ্বের সময় তার গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে একশ' লোক এসেছিলো। ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, যিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে এসেছিলেন এবং তার বসতির লোকদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন, যিয়াদ ইবনে হারেছ সদায়ী। এক সফরে তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গী ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি পানি আছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার এ চামড়ার বোতলের পানিটুকুই কেবল আছে। তিনি স. বললেন, এ পানিটুকু একটি পেয়ালায় ঢালো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাতখানা কাঠের পেয়ালার মধ্যে রাখলেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর অঙ্গুলসমূহ থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানির ধারা বের হচ্ছে। এই মোজেযাটি কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিলো।

দ্বাদশ দল

দ্বাদশ দলটি আগমন করেছিলো গাসসান গোত্র থেকে। তাদের আগমন হয়েছিলো দশম হিজরীর রমজান মাসে। এই দলের সদস্য ছিলো তিনজন।

ত্রয়োদশ দল

ত্রয়োদশ দলটি রসুলেপাক স. এর কাছে আগমন করেছিলো বনী কায়শ গোত্র থেকে। তারা কোনো এক ব্যক্তিকে রসুলেপাক স. এর নিকট পাঠিয়ে বলেছিলো,

হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের গ্রামের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এসে বলছে, যার হিজরত নেই, তার ইসলাম নেই। আমাদের সম্পদ ও পশুর কোনো অভাব নেই। কাজেই তাদের কথা যদি সত্যি হয়, আমরা আমাদের সম্পদ ও পশুসমূহ বিক্রি করে দিয়ে আপনার কাছে চলে আসবো। রসুলেপাক স. বললেন, যেখানে ইচ্ছে থাকো, তবে আল্লাহ্কে ভয় করো। পরহেজগারীর সাথে জীবনযাপন করো। তোমাদের সওয়াব কম হবে না। তোমাদের কোনো পুণ্যকর্মকেই সওয়াববিহীন রাখা হবে না।

চতুর্দশ দল

চতুর্দশ দল ছিলো উযদ এর প্রতিনিধিদল। ইয়ামনের এক গোত্রের আদি পিতার নাম ছিলো উযদ। মদীনার সকল আনসার উযদের বংশধর। তাকে উযদ শুনুহও বলা হতো। 'কামুস' গ্রন্থে এরকম বর্ননা এসেছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে আবু নাঈমের কিতাব 'মারেফাতুস্ সাহাবা' থেকে আবু মুসা মাদানীর বর্ণনায় আহমদ ইবনুল জাওয়ারীর একটি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি আবু সুলায়মান দারানীকে আলকামা ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সুওয়ায়েদ উযদীর হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। আলকামা বলেছেন, আমার পিতা আমার দাদাকে বলতে শুনেছেন, রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজিরাদানকারী কাওমের সাত ব্যক্তির মধ্যে আমি ছিলাম অন্যতম। আমরা তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করলাম। তিনি আমাদের আচরণ দেখে খুশি হলেন। বললেন, তোমরা কে? আমি বললাম, আমরা মুমিন। রসুলেপাক স. মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক কথারই একটি বাস্তবতা থাকে। তোমাদের কথা এবং তোমাদের ইমানের বাস্তবতা কী? আমরা বললাম, পনেরোটি বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের। তন্মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা আপনার দূত আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি। ওই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর আমরা আমলও করে চলেছি। আর বাকী পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আমরা ধরে রেখেছি জাহেলী যুগ থেকেই। ওগুলোও আমাদের সদ্গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে যা আপনার অপছন্দনীয়, সেগুলোর কথা আলাদা। রসুলেপাক স. বললেন, আমাদের দূত কর্তৃক প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কী? আমরা বললাম, আমরা যেনো ইমান আনি আল্লাহ্র উপর। তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর, তাঁর নবীগণের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। সেই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কী যা আমি আমল করতে বলেছি? আমরা বললাম, আমরা যেনো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলি। নামাজ কায়েম করি। জাকাত আদায় করি। রমজানের রোজা রাখি এবং কাবাঘরে হজ্ব পালন করি, যদি আমাদের সামর্থ্য থাকে। তিনি স. বললেন, ওই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কী, জাহেলী যুগ থেকে তোমরা যাতে অভ্যস্ত। আমরা বললাম, সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করা। বিপদে ধৈর্য

ধারণ করা। তকদীরের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। কারও সাথে সাক্ষাতের কালে সত্য বলা এবং দুশমনদেরকে খুশি করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। এসব কথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের ইমানী প্রজ্ঞা এমন যে, তোমরা প্রায় নবুওয়াতীর প্রজ্ঞার কাছাকাছি পৌঁছে গেছো। অর্থাৎ গুণাবলীর সৌন্দর্যসমূহ যা তোমাদের মধ্যে আছে, তা নবীগণের গুণাবলী। তবে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তোমরা আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত, যারা নবীগণের অনুসারী ও উত্তরাধিকারী। অতঃপর রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে আরও পাঁচটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিচ্ছি, যাতে করে তোমাদের বিশটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয়ে যায়। সেগুলো হচ্ছে ১. যা তোমরা খাও এমন জিনিস জমা করে রেখো না। ২. ঐ জিনিস বানাবে না, যার মধ্যে তোমরা থাকবে না। ৩. এমন জিনিসের আকাঙ্খা কোরো না, যা আগামীতে ফানা হয়ে যাবে। ৪. আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁর সামনে তোমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। ৫. ঐ জিনিসের আকাঙ্খী হয়ো, যার সাথে আগামীকাল তোমাদেরক মিলিত হতে হবে এবং সবসময়ই তাতে থাকতে হবে। প্রতিনিধিদল ফিরে গেলো। রসুল স. এর ওসিয়ত সর্বদাই তারা স্মরণে রাখলো। তার উপর আমল করতে লাগলো।

পঞ্চদশ দল

পনেরোতম দল যারা রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো তারা হলো বনী মুনতাফেক এর প্রতিনিধিদল। মুনতাফেক ছিলো ওই গোত্রজনতার আদি পিতার নাম। ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার কিতাব 'মসনদে ইমাম আহমদ' থেকে বর্ণনা করেছেন, আসেম ইবনে লাকীত ইবনে আমের গোত্রপ্রতিনিধি হিসেবে রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন নুহায়ক ইবনে আসেম ইবনে মালেক ইবনে মুনতাফেক। রসুলুল্লাহ্ স. ফজরের নামাজ শেষ করার পর ভাষণ দেওয়ার জন্য লোকদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এমন সময় তিনি সেখানে পৌঁছলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শুনে রাখো, চার দিন পর্যন্ত আমি আমার আওয়াজ বন্ধ রেখেছি। আজ আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কি কোনো দূত রয়েছে, যাকে তার গোত্রের লোকেরা পাঠিয়েছে? সাহাবা কেরাম আসম ইবনে নাকীতকে বললেন, রসুলুল্লাহ্ স. কি বলেছেন তা লক্ষ্য করে শোনো। পুনরায় রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো। কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে আহকামে ইলাহী (আল্লাহ্র বিধানাবলী) পৌঁছে দিয়েছি কি না। এখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। তারপর রসুলেপাক স. পুনরুত্থান, হাশর নশর ও বেহেশত দোজখ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। আসেম

নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কোন্ বিষয়ে আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করবো? রসুলেপাক স. বললেন, নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা ও আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করার বিষয়ে।

ষোড়শ দল

এ দলটি আগমন করেছিলো ইয়ামনের গোত্র বনীনাখা থেকে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এসেছে, এটি ছিলো সর্বশেষ প্রতিনিধিদল। এটি আগমন করেছিলো একাদশ হিজরীর মধ্য মহররমে। এই প্রতিনিধিদলের লোকসংখ্যা ছিলো দু'শ। প্রথমে তারা মেহমানখানায় অবতরণ করে। পরে ইসলামের স্বীকৃতি জানিয়ে রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা ইয়ামনে থাকা অবস্থায় হজরত মুআফা ইবনে জাবালের মাধ্যমে পূর্বেই বায়াত গ্রহণ করেছিলো। তাদের মধ্যে যুরারা ইবনে আমর নামের এক ব্যক্তি ছিলো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সফরে থাকা অবস্থায় এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। রসুলেপাক স. বললেন, কী দেখেছো? সে বললো, দেখেছি, একটি মাদি গাধা লাল ও কালো রঙের একটি বাচ্চা দিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে এসেছো? লোকটি বললো, হাঁ। রসুলেপাক স. বললেন, সে তোমার সন্তান প্রসব করেছে। আর এটি হচ্ছে তার রঙ। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এ লাল ও কালো রঙের মানে কী? তিনি স. বললেন, আমার নিকটে এসো। লোকটি তাঁর নিকটবর্তী হলে কানে কানে বললেন, তোমার শরীরে শ্বেতী রোগ রয়েছে যা তুমি অন্য লোকদের কাছে গোপন করে আসছো। লোকটি বললো, শপথ ওই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যধর্মের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। আমার এ বিষয়টি সম্পর্কে কেউই অবগত নয়। আপনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আপনার কথা সত্য। লোকটি বললো, আমি স্বপ্নে আরও দেখলাম, পক্ককেশবিশিষ্ট এক বৃদ্ধা যমীনের বাইরে এসেছে। রসুলেপাক স. বললেন, এ হচ্ছে দুনিয়া। তার বয়স এখন এরকম। লোকটি বললো, আমি স্বপ্নে আরও দেখলাম, মাটির নীচ থেকে একটি অগ্নিশিখা বের হয়ে আমার এবং আমার সন্তানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, এ হচ্ছে ওই ফেতনা, যা আখেরী যমানায় প্রকাশিত হবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! সে ফেতনাটি কি? তিনি বললেন. লোকেরা তাদের ইমামকে হত্যা করবে। এহেন ফেতনার যমানায় অসৎ লোকেরা নিজেদেরকে নেক্কার মনে করবে এবং মুসলমানের রক্ত মুসলমানের কাছে মিঠা পানির চেয়েও মিষ্ট মনে হবে। তোমার সন্তান যদি পূর্বে মারা যায়, তাহলে তুমি সে ফেতনা দেখতে পাবে। আর যদি তুমি পূর্বে মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমার পুত্র সে ফেতনা দেখতে পাবে। লোকটি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেনো সে ফেতনার মধ্যে আমাকে মিলিত না করেন। তখন

রসুলেপাক স. বললেন, হে আল্লাহ্! এ যেনো উক্ত ফেতনায় মিলিত না হয়। উল্লেখ্য, লোকটির ইন্তেকাল আগেই হয়ে গিয়েছিলো এবং তার পুত্র বেঁচে ছিলো। তার পুত্র ঐ ব্যক্তি যে হজরত উছমানের খেলাফত উচ্ছেদের তৎপরতা চালিয়েছিলো।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে উক্ত প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন সপ্তম থেকে একাদশ হিজরী পর্যন্ত হয়েছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য আরও কিছু প্রতিনিধিদলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে দশম হিজরীতে। সেগুলোকে যদি উল্লিখিত প্রতিনিধিদলসমূহের মধ্যে একত্রিত করে বর্ণনা করা হয়, তাহলে তা নবম হিজরীর অবশিষ্ট ঘটনাবলীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর নবম হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর যদি দশম হিজরীর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা-ই হবে সমীচীন। তাহলেই কেবল সকল প্রতিনিধিদলের বর্ণনা একত্রে পাওয়া যাবে।

তন্মধ্যে একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো তাঈ গোত্রের। যা সপ্তম হিজরীর অধ্যায়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা হয়েছে। হাতেম তাঈয়ের কন্যা বন্দী হয়ে গেলো। আর তার ভাই আদী ইবনে হাতেম শামদেশে চলে গেলো। রসুলুল্লাহ্ স. হাতেম তাঈয়ের কন্যার প্রতি সদাচরণ করলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর সে শামদেশে চলে গেলো এবং তার ভাই আদী ইবনে হাতেমকে রসুলেপাক স. এর আনুগত্য ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলো। অতঃপর দশম হিজরীতে রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে যখন প্রতিনিধিদল আগমন করলো, তখন তাদের সঙ্গে হাতেম তাঈয়ের পুত্র আদী মদীনায় আগমন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আদী ইবনে হাতেম তাঈ বর্ণনা করেছেন, আমার বোনের পরামর্শে আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি স. আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি হাতেম তাঈয়ের পুত্র আদী। রসুলেপাক স. উঠে তাঁর হুজরা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা সামনে পড়লো। বৃদ্ধা রসুলেপাক স. এর কাছে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলো। রসুলেপাক স. তার কথা শোনার জন্য পথিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার প্রয়োজন পুরো করে দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, কোনো বাদশাহ তো কোনো বৃদ্ধার জন্য এরকম করতে পারেন না। এতো নবীর স্বভাব। তারপর রসুলেপাক স. হুজরা শরীফের ভিতর প্রবেশ করে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি বিছানায় আমাকে বসতে বললেন। তিনি স. বসে পড়লেন মাটির উপর। আমি মনে মনে বললাম, এহেন নিয়ম, অভ্যাস ও ফযিলত কোনো বাদশাহর হতে পারে না। তারপর তিনি স. আমাকে বললেন, হে আদী! সম্ভবতঃ তোমার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার পথে অন্তরায় হয়েছে সম্পদের স্বল্পতা, মুসলমানদের দুরাবস্থার আধিক্য, ধর্মের শত্রুদের আধিক্য এবং ধর্মের

সাহায্যকারীদের স্বল্পতা। আল্লাহ্র শপথ! অতিশীঘ্রই মুসলমানদের সম্পদ এতো বেশী হয়ে যাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না। তোমার বয়স যদি দীর্ঘ হয়, তবে দেখতে পাবে, মুসলমানদের সংখ্যা অনেক হয়ে গিয়েছে। আর দ্বীনের দুশমনদের সংখ্যা এতোই কম হবে যে, কাদেসিয়া থেকে কোনো একটি রমণী যদি একা একা উটে আরোহণ করে কাবা ঘর জিয়ারত করতে যায়, তবে পথে তার কোনো ভয়-ভীতি হবে না। আল্লাহ্তায়ালার ভয় ছাড়া তার আর কোনো কিছুর ভয় তখন থাকবে না। অতি শীঘ্রই এমন হবে যে, বাবেল শহরের শ্বেতশুভ্র বালাখানাগুলো মুসলমানদের করতলগত হবে। তারপর হজরত আদী ইবনে হাতেম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন। এমনকি একদিন তিনি শিকারে গেলেন। আর রসুলেপাক স. আকীক উপত্যকা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিলেন। হজরত আদী ইবনে হাতেমের শিকারের সখ ছিলো। শিকার সম্বন্ধে তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এ বৎসর তাঈ গোত্রের এগারো ব্যক্তি আগমন করেছিলো। তাদের দলপতি ছিলো যায়েদুল খায়ল নামক এক ব্যক্তি। রসুলেপাক স. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। যায়েদ বললেন, আল্লাহ্তায়ালার শুকুর। আপনার বদৌলতে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, শক্তি যুগিয়েছেন এবং দ্বীন ইসলামের তৌফিক দিয়েছেন। আপনি যে বিষয়ে দাওয়াত দেন, তার চেয়ে উত্তম আখলাক আরও আছে কিনা, তা আমি জানি না। আমরা আমাদের আমলের উপর বিস্মিত হচ্ছি যে, আমরা ওই পাথরসমূহের পূজা করেছি, যা কখনও হারিয়ে গেলে নিজেরাই তার অন্বেষণ করি। রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের এহেন এলেম ও অবস্থা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তারপর রসুলেপাক স. তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দান করেন এবং কাউকে কাউকে ভূখণ্ড দান করেন। রসুলেপাক স. যায়েদুল খায়ল নাম পরিবর্তন করে যায়েদুল খায়ের নাম রাখলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আরবদের যে মর্যাদার কথাই আমার সামনে আলোচনা করা হোক না কেনো, তা যায়েদুল খায়েরের মর্যাদার তুলনায় কম হবে। লোকেরা সদ্গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে আমি তার মধ্যে তার চেয়ে বেশী গুণাবলী পেয়েছি।

আরেকটি প্রতিনিধিদল এসেছিলো খাওলান গোত্র থেকে। এ দলে লোক ছিলো দশজন। তারা এসে রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার খেদমতে এসেছি এ অবস্থায় যে, আমরা আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছি। আমরা আপনার রেসালতকে বিশ্বাস করেছি। আপনার দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে আমরা নরম ও কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমরা যে আল্লাহ্র নাম নিতে পারি তা তাঁর রসুলেরই অনুগ্রহ। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা বলেছো আমরা নরম ও কঠিনপথ অতিক্রম করেছি এ ব্যাপারে তোমরা

জেনে রেখো, তোমাদের উটগুলো এ পথে যতগুলো কদম রেখেছে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে একটি করে নেকী আর একটি করে মর্যাদা। আর তোমরা যে বলেছো 'আপনার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি'— এ ব্যাপারে জেনে রেখো, আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যে কেউ মদীনায় আসবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। রসুলেপাক স. বলেছেন, যে আমার কবর জিয়ারত করে সে যেনো আমারই জিয়ারত করে। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করলো, সে যেনো আমার জীবদ্দশায়ই আমার জিয়ারত করলো। সুতরাং রসুলেপাক স. এর কবরে আসওয়ার এর জিয়ারতকারীরাও উক্ত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। মদীনা তাইয়্যেবার কোনো এক দরবেশ বলতেন, জিয়ারতকারীর জন্য রসুলেপাক স. এর জিয়ারত মানবী সোহবত বা আধ্যাত্মিক সাহচর্যের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। 'তুমি জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করবে কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে' এ হাদিসের আলোকে উক্ত দরবেশের উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। তারপর খাওলানের প্রতিনিধিদলকে রসুলেপাক স. হাদিয়া তোহফা দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

আরেকটি দল এসেছিলো যাহাদিয়ীনের প্রতিনিধি হয়ে। মুদলেজ গোত্রের আদি পিতার নাম যাহাদিয়ীন। এ দলের লোকসংখ্যা ছিলো পনেরো জন। তারা মদীনায় এসে রামলা বিনতে হারেছের গৃহে অবস্থান করলো। রসুলেপাক স. সাহাবীগণের একটি দল নিয়ে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তখনকার অবস্থা ছিলো সঙ্গীন। রসুলেপাক স. এহেন অবস্থায় তাদের সঙ্গে কথা বললেন। আগমনকারী দলটি তাদের খাদ্য সামগ্রী থেকে কিছু বের করে রসুলেপাক স. এর সামনে রাখলো। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুগ্রহ করে হাত সম্প্রসারিত করুন। আহারে অংশগ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি রোজা রেখেছি। সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা খাও। রসুলেপাক স.কে খাবার গ্রহণের জন্য পিড়াপীড়ি করা ছিলো তাদের ধৃষ্টতামূলক আচরণ এবং বেআদবী। তাদের এমতো আচরণ ছিলো রসুলেপাক স. এর উচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী। আর রোজাদার থাকাও তার সহায়ক হয়েছিলো। রসুলেপাক স. যদি তাদের মন রক্ষা করতে চাইতেন, তবে অন্যান্য স্থানের মতো নফল রোজা ছেড়ে দেওয়ারও অবকাশ ছিলো। বুযুর্গগণের ইয্যতের মাকাম অতি উচ্চ এবং তার অবস্থান খুবই সূক্ষ্ম। এই প্রতিনিধিদল হাদিয়া তোহফা হিসেবে নিয়ে এসেছিলো ঘোড়া। ঘোড়াগুলো দেখে রসুলেপাক স. কাউকে কাউকে বললেন, তুমি এর উপর আরোহণ করো, এটা কী রকম দ্রুতগামী তা দেখে নেওয়া যাক। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন

বললো, এ ঘোড়াটি বাহর (সমুদ্রের মতো)। কিন্তু দেখা গেলো, ঘোড়াটি ধীরগতি-সম্পন্ন। রসুলেপাক স. বললেন, এটি ভালোভাবে প্রতিপালন ও দেখাশোনা করো। পরবর্তীতে তিনি তার দৌড় করাতে ইচ্ছা করলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে এর উপর আরোহণ করার অনুমতি দিন। অতঃপর সে ঘোড়ার পীঠে আরোহণ করে তাকে দৌড় দেয়ালো। দেখা গেলো এ ঘোড়াটিই সকলের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি একে বাহরই (সমুদ্র) দেখেছি। রসুলেপাক স. সেই ঘোড়াটি নিজে নিলেন এবং তার পরিবর্তে অন্য একটি ঘোড়া সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন। অন্যান্য লোকদেরকে পুরস্কার দিলেন। তারা আপন আপন ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলো।

আরও একটি দল এসেছিলো। দলটি ছিলো গামেদের প্রতিনিধিদল। গামেদ একটি জনগোষ্ঠীর আদি পিতার নাম। তাই তাদেরকে কবীলা গামেদিয়া (গামেদিয়া জনগোষ্ঠী) বলা হয়। কবীলার প্রধান ব্যক্তি গামেদ তার দল নিয়ে মদীনায় আগমন করে। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ্‌। আর তার উপাধি ছিলো গামেদ। সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সংশোধন করা এবং তাদের ব্যবহারিক জীবনে পরিশুদ্ধতা আনয়ন করার কারণে তার এই উপাধি হয়েছিলো। এ দলের লোকসংখ্যা ছিলো দশজন। তারা এসে মদীনা শরীফের কবরস্থান বাকী গারকাদ নামক স্থানে অবস্থান নিলো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের এক যুবক ছিলো। তাকে তাদের মালের হেফাজতের জন্য রেখে নিজেরা এসে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে সালাম আরজ করলো। রসুলেপাক স. বললেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা তোমাদের মালের হেফাজতের জন্য রেখে এসেছো, সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ইত্যবসরে চোর এসে তোমাদের একজনের একটি ব্যাগ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। পরে ওই যুবক সেই ব্যাগটি চোরের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছে এবং শক্তভাবে স্বস্থানে রেখে দিয়েছে। তারা যখন তাদের অবস্থানস্থলে গেলো, তখন এ বিষয়ে হুবহু তাই শুনতে পেলো, যে রকম রসুলেপাক স. বলেছিলেন। তারা বলতে লাগলো, রসুলেপাক স. আমাদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছেন এ জন্য, যেনো আমরা তাঁর রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করি। তারপর সে যুবকটিও এলো এবং সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. হজরত উবাই ইবনে কাআবকে বললেন, এই লোকগুলো যতো দিন মদীনায় থাকবে, তুমি তাদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবে।

আরেকটি দল এসেছিলো বাজীলা গোত্র থেকে। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ বাদালী সে গোত্রের লোক ছিলেন। দলটি ছিলো দেড়শ লোকের। তাদের আগমনের পূর্বে রসুলেপাক স. সংবাদ দিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে এমন লোক আগমন করছে, যাদের চেহারার উপর ফেরেশতারা হাত বুলিয়েছে। কথাটি ছিলো হজরত জারীরের রূপসুষমার দিকে ইঙ্গিত। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হতো,

যেনো তাঁর চেহারার উপর ফেরেশতারা হাত বুলিয়ে দিয়েছে। তিনি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদর্শন লোক ছিলেন। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, আমি নবী ইউসুফের রূপের যে বর্ণনা শুনেছি, সে মতে তিনি ছাড়া জারীরের চেয়ে অধিক সুন্দর ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি। যা হোক হজরত জারীর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সকলেই এসে মুসলমান হয়েছিলেন।

আরেকটি প্রতিনিধিদল এসেছিলো বনী হানীফা গোত্রের। তারা মদীনা তাইয়্যেবায় হাজির হলো। রসুলেপাক স.এর অনুমোদনক্রমে তারা অবস্থান গ্রহণ করলো রামলা বিনতিল হারেছের বাড়িতে। পরের দিন তারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। এ দলের মধ্যে মুসায়লামা কাযযাবও ছিলো। সেও অন্যান্য সকলের সঙ্গে শরীয়তে মোহাম্মদী কবুল করেছিলো। সে যখন ইয়ামামায় পৌঁছে, তখন শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে এবং সে মুরতাদ হয়ে যায়। সে নবুওয়াতের দাবী করলো এবং রসুলেপাক স. এর সঙ্গে রেসালতের অংশিদারীত্বের দাবী করা শুরু করে দিলো।

আরেক জনের আগমন হয়েছিলো তিনি হচ্ছেন, বাদশাহ নাজ্জাশীর ভাগ্নে ফিরোজ দায়লামী। তিনি মদীনা শরীফে আগমন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফিরোজ দায়লামী হচ্ছেন ওই ব্যক্তি, যিনি নবুওয়াতের ভণ্ড দাবীদার আসওয়াদ আনসাকে কতল করেছিলেন।

এখন নবম সালের অন্যান্য ঘটনাবলীর দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে, যা প্রতিনিধি দলসমূহের বর্ণনা একত্রে আনার কারণে বাকী রয়ে গিয়েছিলো।

ইবনে উবাই মুনাফিকের মৃত্যু

হিজরী নবম বর্ষে শওয়াল মাসে মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল রোগাক্রান্ত হলো। অবশ্য কলবী ব্যাধিতে সকল মুনাফিকই আক্রান্ত ছিলো। সেই কলবী ব্যাধির সঙ্গে তার শারীরিক ব্যাধিরও সংযোগ ঘটলো এবং যিলকদ মাসে তার মৃত্যু হলো। তার এক পুত্র ছিলেন। তাঁর নামও ছিলো আব্দুল্লাহ্। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের খাঁটি মুসলমান। তিনি তাঁর পিতার সেবা করার জন্য পিতার কাছেই ছিলেন। ইবনে উবাই যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন রসুলেপাক স. তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রের পাশে বসলেন। বললেন, আমি তোমাকে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পূর্বেই মানা করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা শুনলে না। সে বললো, এটি তিরস্কারের মুহূর্ত নয়; আমি এখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়টি এখানে অস্পষ্ট যে, ইবনে উবাই রসুলেপাক স.কে 'হে আল্লাহ্র রসুল' বলে তখন সম্বোধন করেছিলো কিনা? উক্তিটি আসলে তার, না বর্ণনাকারীর? বর্ণনাকারীও সৌজন্যবশতঃ নিজের পক্ষ থেকে বাক্যটি ব্যবহার করতে পারেন। আবার তার স্বভাবসুলভ মুনাফিকীর কারণে সেও এরকম সম্বোধন

করতে পারে। অথবা মৃত্যু যন্ত্রণায় অক্ষম ও পেরেশান হওয়ার কারণেও তার মুখ থেকে বাক্যটি অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে বললে তো ইমানদারই হয়ে যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনে উবাই বললো, আমার মৃত্যুর পর আপনি আমার জানাযায় আসবেন এবং আমাকে কাফন দেওয়ার জন্য আপনার জামাটি দান করবেন। জীবনচরিত বিশারদগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. সেই দিন দু'টি জামা পরিধান করেছিলেন। তিনি স. তাঁর উপরের জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে উবাই বললো, আমাকে ওই জামাটি দিন, যা আপনার গায়ের সঙ্গে মিলিত আছে। কিন্তু রসুলেপাক স. তাকে তার শরীরসংলগ্ন জামাটি দিলেন না। এক বর্ণনায় আছে, যে জামাটি নীচে পরিহিত ছিলো এবং যেটি সে চাচ্ছিলো, সেটি তাকে দিলেন না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ্ রা. শরীরসংলগ্ন জামাটি দান করার জন্য পুনরায় আরজ করলেন। তাঁর পিতার জানাযার নামাজ পড়ানো এবং তার জন্য ইস্তেগফার করার জন্যও নিবেদন জানালেন। রসুলেপাক স. তার জানাযার নামাজ পড়ার উদ্যোগ নিলেন। হজরত ওমর রা. স্বস্থান থেকে দণ্ডায়মান হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি তার জানাযার নামাজ পড়াবেন? সে তো মুনাফিক। রসুলেপাক স. মৃদু হেসে বললেন, হে ওমর! আমার হাত ছেড়ে দাও। সত্তুর বার তার জন্য ইস্তেগফার করা বা না করার এখতিয়ার আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি ইস্তেগফার করার কাজটিই গ্রহণ করলাম। সত্তুর বারের চেয়ে বেশী ইস্তেগফার করলে যদি তাকে মাফ করে দেওয়া হতো, তবে আমি তার জন্য হাজার বারের চেয়ে বেশী ইস্তেগফার করতাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত— 'ইসতাগফিরলাহুম আওলা তাসতাগফিরলাহুম ইন তাসতাগফিরলাহুম সাবঈনা মার্‌রাতান ফালাইঁ ইয়াগফিরাল্লাহু লাহুম' (তুমি উহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না কর একই কথা। তুমি উহাদের জন্য সত্তুর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না)(৯ঃ৮০)। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. যখন ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামাজ পড়ান, তখন এই আয়াত নাযিল হয় 'ওয়ালা তুসাল্লি আ'লা আহাদিম মিনহুম মাতা আবাদাওঁ ওয়ালা তাকুম আ'লা কাবরিহী ইন্নাহুম কাফারু বিল্লাহি ওয়া রসূলিহী' (উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর পার্শ্বে দাঁড়াইবে না উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল)(৯ঃ৮৪)। রসুলেপাক স. থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া অবশ্য বিস্ময়কর ব্যাপার। বিষয়টির হাকীকত ও রহস্য উদঘাটন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে জীবনীরচয়িতাগণ একটি আশ্চর্য ধরনের কথা বলেছেন। ইবনে উবাইকে যখন দাফন করা হলো, তখন রসুলেপাক স. তার কবরের কাছে গিয়ে বললেন, তাকে বের করে নিয়ে এসো।

তাকে কবর থেকে বের করে আনার পর রসুলেপাক স. তার মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখের লালা তার মুখের উপর ঢেলে দিলেন। বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয়, তিনি স. এরকম করেছিলেন তার পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ্র মন রক্ষার্থে। কেননা তিনি ছিলেন রসুল করীম স. এর দরবারের একজন একনিষ্ঠ সদস্য ও খাঁটি প্রেমিক। তাছাড়া সম্ভবতঃ রসুলেপাক স. এ কাজটি করেছিলেন এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য যে, ইমানের দৌলত ব্যতীত শাফায়াতের দ্বারা কোনো ফায়দা হয় না। আল্লাহ্তায়ালার অকাট্য বিধানে তো রয়েছেই 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আইঁ ইউশরিকো বিহী' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না)। রসুলেপাক স. তখন যা কিছু করেছিলেন, তার সব কিছুই ছিলো বাহ্যিক। হাকীকতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এ বিষয়ে এমনও হতে পারে যে, এ ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নিহিত ছিলো, যা জানতেন কেবল রসুলেপাক স. নিজে।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. ইবনে উবাইয়ের সঙ্গে তখন যে আচরণ করেছিলেন, তার হেকমতসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিলো এই যে, ইবনে উবাইয়ের অনুসারীরা যখন দেখলো, রসুলেপাক স. তাদের নেতার প্রতি এরকম বিনম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করলেন, তখন তারা অভিভূত হয়ে অন্তর থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আনুগত্যের হার গলায় পরিধান করে নিলো।

বর্ণিত আছে, ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর দিন মুনাফিকরা তাদের নেতার শেষ পরিণতি দেখলো। সবশেষে তাকে রসুলেপাক স. এরই দোয়ার মুখাপেক্ষী হতে হলো। আরও দেখলো, রসুলেপাক স. এর তরফ থেকে ইবনে উবাইয়ের প্রতি কী পরিমাণ দয়া রহম করা হলো। এ সব দেখে প্রায় এক হাজার জন মুনাফিক তওবা করে খাঁটি দিলে ইসলাম গ্রহণ করলো।

রসুলেপাক স. ইবনে উবাইকে যে জামা দান করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম এরকম সমাধান ব্যক্ত করেছেন— বদরের যুদ্ধে রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। তিনি তখন ছিলেন বস্ত্রহীন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী। তাই তাঁর পরিধানযোগ্য কোনো জামাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। তখন ইবনে উবাই তাঁকে একটি জামা দান করলো। রসুলেপাক স. তাঁর চাচার ওই ঋণ পরিশোধ করণার্থেই ইবনে উবাইকে তাঁর পবিত্র জামা দান করেছিলেন। তার জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তার জন্য ইস্তেগফার করেছিলেন এজন্য যে, হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকরা ইবনে উবাইকে বলেছিলো, আমরা মোহাম্মদকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবো না। কিন্তু তোমাকে আমরা অনুমতি দিচ্ছি তুমি ওমরা করতে পারো। তখন ইবনে উবাই তাদের কথার জবাবে বলেছিলো, মোহাম্মদ আমাদের নেতা। সুতরাং আমি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে কিছু

করতে পারি না। এক্ষেত্রে সে রসুলেপাক স. এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলো, যদিও তার নিয়ত শুদ্ধ ছিলো না। রসুলুল্লাহ্ স. একথা মনে রেখেছিলেন। তাই প্রতিদানস্বরূপ তার জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তার জন্য এস্তেগফার করেছিলেন। উলামা কেরামের এহেন ব্যাখ্যা অবশ্য দুর্বলতামুক্ত নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্য সান্ত্বনা প্রদানে ও হয়রানী দূর করার ক্ষেত্রে সাহায়ক হতে পারেনি। এসব ব্যাখ্যা উত্থিত আপত্তিকে খণ্ডন করতে পারেনি এবং তার অকাট্য জবাবও হতে পারেনি। কেননা শিরিক ক্ষমা না করা এবং ইস্তেগফার করা না করার বিষয়ে রসুলেপাক স.কে এখতিয়ার দেওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছিলো ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর। আর রসুলেপাক স. ওসকল কিছু করেছিলেন আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পূর্বে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ যদি পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ হতো, তাহলে তো ধারণার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েই যেতো।

কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন, ইস্তেগফার করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে ওই ব্যক্তির জন্য, যার মৃত্যু হয়েছে শিরিকের উপর। তাই ইস্তেগফার নিষেধ হওয়ার বিষয়টি ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে না, যে ইসলাম প্রকাশ করে মৃত্যুবরণ করেছে। কেননা এমন তো হতে পারে যে, সবশেষে বাতেনের জগত জাহেরের কার্যকলাপের অনুকূল হয়ে গিয়েছিলো। এমতো সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলেপাক স. ইবনে উবাইয়ের জন্য ইস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করেছিলেন, বিশেষ করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকালে যখন অনুশোচনার নিদর্শন প্রকাশ পায়। উক্ত বিষয়টি যদি বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, তবে এটা অবাস্তব হবে না যে, রসুলেপাক স. এর এহেন আচরণ কেবল ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ্‌র মন রক্ষার্থে করা হয়েছিলো। তাই দেখা যায়, পরে যখন নিষিদ্ধতার আয়াত নাযিল হলো, তখন রসুলেপাক স. এরকম করা থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেলেন।

'জমউল জাওয়াম' কিতাবে আল্লামা সুয়্যুতী সাহাবীগণের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, হজরত শায়েখ আদাল আলী মুত্তাকী 'জামে কবীর' কিতাবের টীকা ভাষ্যে লিখেছেন 'হাজা ইয়াহ্‌সিবুয্ যাহিরূ ইল্লা হয়া কানা মুনাফিকান' (ইবনে উবাইয়ের প্রতি ওই আচরণ করা হয়েছিলো প্রকাশ্য কার্যকলাপের ভিত্তিতে। অন্যথায় সে একজন মুনাফিকই ছিলো)। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হাবশার বাদশাহর ইনতেকাল

হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহর (নাজ্জাশীর) পরলোকগমন ছিলো নবম হিজরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. বর্ণনা করেছেন, যেদিন হাবশার বাদশাহর ইনতেকাল হলো সে দিন রসুলেপাক

স. বললেন, আজ তোমাদের ভাই পুণ্যবান আসহামার (নাজ্জাশীর) মৃত্যু হয়েছে। তোমরা ওঠো, তার জানাযার নামাজ পড়ো এবং তার জন্য ইস্তেগফার করো। তারপর আমরা ইদগাহ ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে রসুলেপাক স. এর পিছনে দাঁড়ালাম এবং জানাযার নামাজ পড়লাম।

প্রকাশ থাকে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়ার বিষয়ে উলামা কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও জমহুরে সলফ বলেছেন, জায়েয। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেকের মাযহাব হচ্ছে অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা পড়া জায়েয নয়। কেননা জানাযার নামাযের জন্য শর্ত হচ্ছে, জানাযা আদায়কারীর সামনে মাইয়েতকে (মৃত্যুব্যক্তিকে) উপস্থিত থাকতে হবে। গায়েবানা জানাযার মধ্যে উক্তরূপ অবস্থা বিদ্যমান নয়, তাই তা নাজায়েয। গায়েবানা জানাযা জায়েয বলে যে সকল ইমাম মত দিয়েছেন, তাঁদের দলিল হচ্ছে নাজ্জাশীর হাদিসটি। তাই তাঁরা বলেন, মৃতদেহ সামনে হাজির থাকা জানাযার শর্ত নয়। আর যাঁরা নাজায়েযের পক্ষে মত দিয়েছেন, তাঁরা নাজ্জাশীর ঘটনায় গায়েব ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়নি। বরং এক্ষেত্রে যমীনকে সংকুচিত করে জানাযাকে রসুলেপাক স. এর সম্মুখে দৃশ্যমান করে দেওয়া হয়েছিলো। অথবা জানাযাকে রসুলেপাক স. এর সামনে আনা হয়েছিলো। মুক্তাদীদের লাশ দেখতে পাওয়া কোনো শর্ত নয়।

আল্লামা ওয়াকেদী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুলেপাক স. দেখেই নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছিলেন। এরকম আরেকটি ঘটনার বর্ণনাও পাওয়া যায়। রসুলেপাক স. তবুকের প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে থেকে তিনি একজন সাহাবীর জানাযা পড়েছিলেন, যাঁর ওফাত হয়েছিলো মদীনা মুনাওয়ারায়। উক্ত সাহাবীর নাম ছিলো হজরত মুআবিয়া লাইছী। তাঁর সম্পর্কে রসুলেপাক স. বলেছেন, সত্তুর হাজার ফেরেশতা তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক হয়েছে। তাঁর এহেন ফযীলত লাভের কারণ হচ্ছে তিনি সুরা এখলাস খুব বেশী বেশী পাঠ করতেন।

এখনও (এই কিতাব রচনার কালে) মক্কা মদীনায় প্রচলন আছে, কোনো শহরে কোনো নেককার লোকের মৃত্যু যখন হয় এবং এ সংবাদ যখন প্রচারিত হয়, তখন শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা তার জানাযার নামাজ পড়ে থাকে। কোনো কোনো হানাফী মাযহাবের লোকও তাতে অংশ গ্রহণ করে। কাদী আলী ইবনে জারুল্লাহ্ যিনি এ ফকীরের (অর্থাৎ শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) হাদিসের শায়েখ ছিলেন, তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, হানাফী মাযহাবের লোকেরা গায়েবানা জানাযায় অংশগ্রহণ করে কেনো, তখন তিনি বললেন, এ তো হচ্ছে মাইয়েতের জন্য দোয়া মাত্র। এতে কোনো দোষ নেই। গাউছুল আজম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী র. তাঁর 'ফতুহুল গায়ব' কিতাবে

বলেছেন, প্রত্যেক দিন ওযীফা হিসাবে জানাযার নামাজ পড়ো। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তাই তিনি এরকম বলেছেন। বলাবাহুল্য, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট এরকম করা জায়েয।

সিদ্দীকে আকবরের নেতৃত্বে হজ্ব পালন

এ বৎসর রসুলেপাক স. যিলকদ মাসে, কারও মতে যিলহজ্ব মাসে, আবার কারও মতে যিলকদ মাসের শেষ দিকে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে হজ্বে পাঠিয়ে দিলেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জমহুরের মতে হজ্ব ফরজ হয়েছিলো ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ এই আয়াতের দ্বারা— 'ওয়া লিল্লাহি আ'লান্নাসি হিজ্‌জুল বাইতি মানিস তাত্বআ' ইলাইহি সাবীলা' (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য)(৯৭ঃ৩)। আর এই হজ্ব যাত্রা হয়েছিলো নবম হিজরীতে। মুহাকক্কেগণের মতে এ মতটিই পছন্দনীয়। কিন্তু এ বৎসর বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের তালিম দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. খুব ব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য তিনি নিজে হজ্বে যেতে পারেননি। হজরত আবু বকর সিদ্দীককে আমীরুল হজ্ব বানিয়ে তিনশ' লোকসহ হজ্ব সম্পাদনের জন্য মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বিশটি উট দিলেন। তিনি নিজের থেকে নিলেন পাঁচটি উট। যাত্রা করলেন মক্কা অভিমুখে। হজ্বের অনুষ্ঠানাদি আদায় করা ছাড়াও মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও দেওয়া হলো তাঁকে। তাছাড়া কাফেরদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ছিন্ন করা সম্পর্কিত সুরা বারাআতের প্রথম তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে শুনানোও ছিলো তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রধান সাহাবীগণের মধ্য থেকে তাঁর সঙ্গী ছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ এবং হজরত আবু হুরায়রা। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যুলহুলায়ফা মসজিদ থেকে ইহরাম বেঁধে যখন রওয়ানা দিলেন, তখন জিব্‌রাইল আ. এসে বললেন, রেসালত এবং পয়গামের কাজ করবেন আপনি অথবা আলী মুর্তযা। এক বর্ণনায় আছে, আপনি অথবা আপনি যাকে অনুমতি দিবেন। কেননা চুক্তি প্রতিষ্ঠা ও চুক্তিভঙ্গ কেবল ওই ব্যক্তিই করতে পারেন, যিনি এর সাথে সম্পৃক্ত। অথবা ওই ব্যক্তি, যিনি নিকটতম। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে বললেন, তুমি আবু বকরের পিছনে পিছনে যাও এবং হজ্বের দিন সুরা বারায়াতের আয়াতগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে তুমি লোকদেরকে পাঠ করে শোনাও। তাছাড়া আরও চারটি বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বললেন— ১. বেহেশতে মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ২. কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করতে পারবে না। ৩. এ বৎসরের পর আর কখনও কোনো মুশরিক হজ্ব করতে

পারবে না। মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না এবং কোরবানী করতে পারবে না। ৪. কাফের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও তার চুক্তি বলবৎ থাকবে। আর কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ না হয়ে থাকে তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য সে চার মাস পর্যন্ত নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে। এরপর সে যদি মুসলমান না হয় তবে তার জান এবং মাল মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। অতঃপর রসুলেপাক স. তাঁর বিশেষ উট আসবার উপর হজরত আলী মুর্তযাকে আরোহণ করিয়ে ঘোষণাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পিছনে প্রেরণ করলেন। হজরত জাবের বলেন, আমরা হজ্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। মক্কার পথে সাহবান পাহাড়ের সাথে আরাদ নামক জায়গায় যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন ফজরের নামাজের সময় হলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক নামাজের ইমামতী করার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে গেলেন। তখনও নামাজ শুরু হয়নি, এমন সময় হজরত আলী রসুলেপাক স. এর বিশেষ সওয়ারীতে আরোহণ করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমীর না মামুর হয়ে এসেছো? হজ্বের আমীর বানিয়ে কি তোমাকে পাঠানো হয়েছে? আর আমাকে কি অপসারিত করা হয়েছে? নাকি তোমাকে মামুর বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? আমি কি যথারীতি আমীর আছি? হজরত আলী বললেন, না, বরং আমাকে মামুর (আমীরের অধীন) বানিয়েই পাঠানো হয়েছে। আমীরুল হজ্ব আপনিই আছেন। আমাকে আপনার অনুগামী করে পাঠানো হয়েছে। তবে আমাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি সুরা বারায়াতের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবো। আর রসুলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে কতিপয় ফরমানের কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করবো।

তাঁরা মক্কায় পৌঁছে হজ্বের কার্যাবলী আদায় করে চললেন। হজ্বের দিন হজরত আবু বকর সিদ্দীক নির্দিষ্ট খোতবা পাঠ করলেন এবং মানাসেকে হজ্বের তালিম দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন হজরত আলী। সুরা বারাআতের আয়াতসমূহ পাঠ করলেন এবং রসুলেপাক স. এর বিশেষ ফরমানসমূহের ঘোষণা দিলেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদনের পর তাঁরা মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার থেকে এমন কি প্রকাশ পেলো, যার কারণে সুরা বারায়াতের আয়াতসমূহ পাঠ করার দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন? রসুলেপাক স. বললেন, তোমার থেকে কোনো কিছুই প্রকাশিত হয়নি এবং তুমি কোনো ত্রুটিও করোনি। তুমি আমার গারে ছওরের সাথী এবং তুমি আমার হাউযে কাউছারেরও সাথী হবে। কিন্তু ভ্রাতা জিব্রাইল এসে আমাকে জানিয়ে দিলেন, চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কিত ঘোষণাটি আপনি স্বয়ং শোনাবেন, না হয় শোনাবে ওই ব্যক্তি

যে আপনার নিকটাত্মীয়। এ কারণেই আমি এরকম করেছি। সুরা বারায়াতের আয়াতসমূহ মুশরিকদের সঙ্গে কৃত চুক্তি খণ্ডন ও মুনাফিকদের অপদস্থ হওয়ার বর্ণনাসম্বলিত ছিলো।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। এক মজলিশে কতিপয় শীয়া মতাবলম্বী লোক বসেছিলো। তাদের একজন ছিলো মূর্খ ও উগ্র। সে বলতে লাগলো, রসুলেপাক স. তো হজরত আলী মুর্তযাকেই আমীরুল হজ্ব পদ দান করেছিলেন এবং আবু বকর সিদ্দীককে বরখাস্ত করেছিলেন। তাদের আর এক জন ছিলো জ্ঞানবান ও ন্যায়ানুগ। সে প্রতিবাদ করে বললো, কেনো মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছো। অযথা বকছো। উপস্থিত সকলের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো, আমীরুল হজ্ব এবং আহকামে হজ্বের তালীমের দায়িত্ব হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর উপরেই ন্যাস্ত ছিলো। ওই দায়িত্ব প্রথম থেকেই হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে হজরত আলীকে যখন প্রেরণ করা হলো, তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে একটি সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছিলো। হজরত আবু বকরকে সম্পূর্ণ অপসারণ করার ধারণা, যা উক্ত শিয়া ব্যক্তিটির মনে বদ্ধমূল হয়েছিলো, তা ছিলো নিতান্তই অমূলক। কেননা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. স্পষ্টতই হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আমীর হয়ে এসেছো? উত্তরে হজরত আলী বলেছিলেন, না। বরং আমি মামুর ও অনুগামী হয়ে এসেছি।

লেআনের ঘটনা

অধিকাংশ জীবনচরিতবিশেষজ্ঞের মতে লেআনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিলো এ বৎসরেই। মেশকাত শরীফে এ বিষয়ে দু'টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, উয়ায়মের ইবনুল হারেছ আজালানী এবং তাঁর স্ত্রী বিনতে কায়েসের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা প্রসঙ্গে। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন সাহাল ইবনে সাআদ সাঈদা থেকে। তিনি একজন বড় মাপের সাহাবী। মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বশেষ ওফাত বরণকারী সাহাবী ছিলেন তিনি। তিনি বর্ণনা করেন, একবার উয়ায়মের আজালানী রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার হুকুম কি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে যেনা করা অবস্থায় দেখতে পায়। এমনকি সে যদি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ তাকে হত্যা করবে? রসুলেপাক স. বললেন, নিশ্চয়ই তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে কোরআনে করীমে বিধান নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে 'ওয়াল্লাজীনা ইয়ারমূনা আযওয়াজ্বাহুম ওয়ালাম ইয়াকুল লাহুম শুহাদাউ ..... ইন কানা মিনাস সদিক্বীন' (এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে

অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী; এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্‌র লা'নত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী; এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্‌র গযব)। অতঃপর রসুলেপাক স. তাকে বললেন, যাও। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো। তারপর উয়ায়মের এবং তাঁর স্ত্রী মসজিদের মধ্যে এসে পরস্পরে লেআন করলেন। তাঁরা উভয়ে যখন লেআন করা শেষ করলেন, তখন হজরত উয়ায়মের বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি যদি এই মহিলাকে আমার কাছে রাখি তাহলে সাব্যস্ত হবে যে, আমি মিথ্যাবাদী। একথা বলেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। আর এ তালাক দিয়েছিলেন তিনি তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুসারে। কেননা তাঁর ধারণা ছিলো, লেআন করাতে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয় না। কাজেই তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন, যাতে স্ত্রী দাম্পত্য জীবন থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, লেআন করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপর রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, এ স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করবে, দেখতে হবে তার আকৃতি কার সাথে সাদৃশ্য রাখে। সন্তানটি যদি কালো বর্ণের হয়, তার চোখ দু'টি হয় কালো কালো। নিতম্ব হয় স্থূল এবং তার পায়ের গোছা হয় চিকন, তবে আমার মনে হয় যে, উয়ায়মের সত্যবাদী। আর যদি সন্তানটি গৌরবর্ণের হয়, হাররা নামক জানোয়ারের বর্ণ হয় তার দেহের বর্ণ, তবে আমার ধারণা, উয়ায়মের মিথ্যাবাদী। পরে দেখা গেলো স্ত্রী লোকটি একটি কালো বর্ণের সন্তান জন্ম দিলো। তার গায়ের বর্ণের সঙ্গে ওই লোকটির গায়ের বর্ণের মিল পাওয়া গেলো, যার প্রতি আনা হয়েছিলো ব্যাভিচারের অভিযোগ। সন্তানটিকে তার মায়ের হাওলা করে দেওয়া হলো। যেনার সন্তানের বিধান এরকমই। সন্তানকে তার মাতার প্রতি সম্বন্ধ করা হয় এবং সন্তান তার মাতার উত্তরাধিকারী হয়। পিতার নয়।

অপর হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী। বর্ণনাটি এরকম— হেলাল ইবনে উমাইয়া তাঁর স্ত্রীর প্রতি শুরায়ক ইবনে সামহার সঙ্গে যেনা করার তোহমত দিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি সাক্ষী আনয়ন করো। আর না হয় অপবাদের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তিনি নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে পর পুরুষকে দেখতে পায়, এমতাবস্থায় সুযোগ ও সময় কোথায় যে, সে তখন সাক্ষী ডেকে আনবে? রসুলেপাক স. পুনরায় বললেন, তুমি সাক্ষী হাজির করো, অন্যথায় শাস্তি গ্রহণ করো। তিনি বললেন, শপথ ওই মহান সত্তার যিনি আপনাকে সত্যধর্ম সহকারে

প্রেরণ করেছেন। আমি আমার কথায় সত্য। আর আমি আশা করছি আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্যই কিছু নাযিল করবেন, যা আমার পৃষ্ঠদেশকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। পরক্ষণেই জিবরাইল আ. এই আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করলেন— 'ওয়াল্লাজীনা ইয়ারমূনা আযওয়াজ্বাহুম ওয়ালাম ইয়াকুল লাহুম শুহাদাউ ..... ইন কানা মিনাস সদিক্বীন' (এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী; এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্‌র লা'নত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী; এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্‌র গযব)। রসুলেপাক স. এই আয়াতটি পাঠ করলেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উপদেশ প্রদান করে বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আর জেনে রেখো, দুনিয়ার শাস্তি সহজতর। তারপর সে মহিলাটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলো এবং কসম করলো। লোকেরা তাকে বারবার বুঝাতে লাগলো যেনো সে চিন্তা ভাবনা করে এবং তাড়াহুড়া না করে। পঞ্চম সাক্ষ্যে যখন পৌঁছলো তখন সে একটু দ্বিধান্বিত হলো এবং ক্ষণিক চিন্তা করলো। একটু পরেই বললো, আমি সারা জীবনের জন্য আমার কাওমের মুখে চুন কালি লেপন করতে পারি না। তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে দিয়ে কসম করে ফেললো। রসুলেপাক স. উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং বললেন, এ মহিলার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তার গর্ভ থেকে যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে, তার আকার আকৃতি কার সঙ্গে মিলে তা দেখতে হবে। যেমন, উয়ায়মের হাদিসে বলেছিলেন। পরবর্তীতে দেখা গেলো শুরায়কের আকৃতির বাচ্চাই জন্মগ্রহণ করলো। রসুলেপাক স. বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌র বিধান (লেআন ও বিচ্ছেদ) যদি না হতো, তাহলে আমি তার সঙ্গে এরকম আচরণ করতাম না। তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হতো।

প্রকাশ থাকে যে, 'লেআন', 'মুলায়েনাত' ও 'তালাউন' এগুলোর অর্থ এক। একে অপরের উপর লানত করা। যখন স্বামী তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয় আর চারজন সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণ করতে না পারে, তখন স্ত্রী চারবার শাহাদতের মাধ্যমে তা অস্বীকার করবে। তারপর স্বামী চারবার শাহাদত ও কসমের মাধ্যমে বলবে যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চম বার বলবে আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমার উপর আল্লাহ্‌র লানত পতিত হোক। স্বামীর কসম করার পর স্ত্রী আবার উক্তরূপ চারবার শাহাদত ও কসমের মাধ্যমে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বার বলবে, সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে আমার উপর

আল্লাহ্র লানত পতিত হোক। এভাবে উভয়েই যখন লানত করে ফেলবে, তখন হাকীম দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবেন। হানাফী মাযহাবের বিধান এরকমই। হজরত ইবনে ওমরের হাদিসেও বলা হয়েছে— 'ফাফার্‌রাকা বাইনাহুম' (অতঃপর দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন) বর্ণিত হাদিস হানাফী মাযহাবের যথার্থতার প্রমাণ। জমহুর উলামার মতে হাকীমের বিচ্ছেদ করে দেওয়া ছাড়াই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তখন পুরুষ যদি শাহাদত ও কসম করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার উপর তোহমতের শাস্তি আরোপিত হবে। আর মহিলা যদি শাহাদত ও কসম না করে, তাহলে তার উপর যেনার শাস্তি আরোপিত হবে।

এ কথাটিও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বাচ্চার পিতৃত্বকে রহিত করে মায়ের সাথে তাকে দিয়ে দেওয়া যেনা সাব্যস্তের ভিত্তিতে হয়। তাও হয়ে থাকে যেনাকারী ব্যক্তির সাথে বাচ্চার আকার আকৃতির সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। শাফেয়ী মাযহাব এলমে কেয়াফা গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে অত্র হাদিসটিকে। লেআন শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার কারণে যেনার শাস্তি রহিত হয়ে যায় এবং পিতৃত্বের হুকুমও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সন্তানকে মায়ের সঙ্গে মিলিত করে দেওয়া হয় এবং তার নসবও মায়ের সাথে সাব্যস্ত হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এলমে কেয়াফাকে এক্ষেত্রে ধর্তব্য মনে করেন। তবে এলমে কেয়াফা ধর্তব্য হবে এমন সুরতে, যেমন একটি বাঁদী দু'জনের মালিকানায় আছে। বাঁদীর মালিকানা থাকার কারণে প্রত্যেকেই তার সঙ্গে সহবাস করে। এমতাবস্থায় বাঁদীর পেটে সন্তান হলে, সে সন্তানের পিতৃত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এলমে কেয়াফার সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রে এলমে কেয়াফা ধর্তব্য হবে। এলমে কেয়াফায় পারদর্শী ব্যক্তি যে মনিবের সঙ্গে বাচ্চার কায়িক সাদৃশ্য রয়েছে বলে সাব্যস্ত করবে, বাচ্চা তারই হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে বাচ্চা দুই মনিবের হবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে দু'জনের নয়। বিচারে দুই মনিবের বাচ্চা বলেই গণ্য করবে। বিধান হচ্ছে অকাট্য, আর কেয়াফা ধারণা এবং আলামতের ঊর্ধ্বে কিছু নয়। কাজেই বিচার বা বিধানের ক্ষেত্রে কেয়াফার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্র কিতাব যে বিধান দিয়েছে তা যদি না হতো, তাহলে এ মহিলার সাথে এমন আচরণ আমি করতাম না— যা করলাম। অর্থাৎ তাকে আমি শাস্তি দিতাম। রসুলেপাক স. এর একথাটি প্রমাণ করে যে, একজন বিচারকের ধারণা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। বাহ্যিকভাবে শরীয়তের দলিলসমূহ যা চায়, তার মোকাবেলায় ধারণার আলোকে বিচার কার্য করা উচিত নয়। আর এ এলমে কেয়াফা ধারণার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সুতরাং এর মাধ্যমে বিচার কার্য করা যাবে না।

এলমে কেয়াফার গুরুত্ব আছে বলে শাফেয়ী মাযহাবের যে মত রয়েছে তার সপক্ষে দলিল হচ্ছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি হাদিস। তিনি বলেছেন, একবার রসুলেপাক স. খুব আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে এলেন। কারণ এরকম— উসামা এবং যায়েদ পিতা-পুত্র দু'জন মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁদের গায়ের উপর একটি মখমলের চাদর ছিলো। তাঁদের উভয়ের মস্তক চাদরে ঢাকা ছিলো এবং উভয়ের পাসমূহ খোলা ছিলো। সে সময়কার এলমে কেয়াফায় বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুজরেম মুদলেজী তাঁদেরকে এহেন অবস্থায় দেখতে পেলো। দেখে বললো, এঁদের দু'জনের পায়ের কোনো কোনো অংশ এক রকম। তাদের মধ্যে কুল্লি ও জুযী'র নেসবত (সম্পর্ক) রয়েছে। এতে করে মনে হয়, তাঁদের সম্পর্ক পিতা পুত্রের। বিস্তারিত ঘটনা এরকম— হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে রসুলেপাক স. অত্যধিক স্নেহ করে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর চেহারা ছিলো গৌরবর্ণের এবং সুন্দর। কিন্তু তাঁর পুত্র হজরত উসামার গায়ের বর্ণ ছিলো কালো এবং খুব সুদর্শনও তিনি ছিলেন না। তার মাতা, আয়মান ছিলেন কালো বর্ণের। সুতরাং মায়ের সঙ্গে হজরত উসামার গায়ের বর্ণের মিল ছিলো। রসুলেপাক স. তাঁকে খুব মহব্বত করতেন। লোকেরা তাঁকে রসুল স. এর মাহবুব বলে ডাকতো। মুনাফিকরা হজরত উসামার বংশধারা নিয়ে কটুক্তি করে বলতো, পিতা এমন সুন্দর ও সুদর্শন আর পুত্র এরকম। এসব কথা রসুলেপাক স. এর কাছে পছন্দ হতো না। এলমে কেয়াফায় পারদর্শী মুজরেম মুদলেজী যখন তাঁদের দু'জনকে দেখে বললো, তাদের দু'জনের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের। একথা শুনে রসুলেপাক স. খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলে থাকেন, রসুলেপাক স. এলমে কেয়াফা বিশারদের গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তার প্রতি খুশিও হয়েছেন। এর জবাবে আমরা বলি, রসুলেপাক স. খুশি হয়েছিলেন এ কারণে যে, এলমে কেয়াফার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা আরবে খুব বেশী ছিলো। তার কথায় হজরত উসামার উপর যে দোষারোপ ছিলো, তা দূর হয়ে গেলো। তাঁর খুশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এলমে কেয়াফাবিদের কথা আহকামে শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। হানাফী মাযহাবের মত এটাই।

উলামা কেরামের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে যেনাকারীকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে উক্ত হত্যাকারীকে কি করা হবে? জমহুরের মত হচ্ছে, কেসাসের মাধ্যমে তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে চার জন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে অথবা হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের যেনার স্বীকারোক্তি থাকতে হবে। যদি এরকম করে এবং সে সত্য হয় তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো তাকে পাকড়াও করবেন না।

হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, হজরত সাআদ ইবনে উবাদা ইবনে সামেত রা. যিনি আনসারদের মধ্যে একজন আকাবের সাহাবী ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যেনা অবস্থায় কাউকে পাই তাহলে কি আমি তাকে হত্যা করবো, নাকি চারজন সাক্ষী রাখবো? রসুলেপাক স. বললেন, চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করবে। হজরত সাআদ বললেন, ওই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি তার আগেই তলোয়ার দ্বারা তার চিকিৎসা করবো। উলামা কেরাম বলেন, হজরত সাআদ ইবনে উবাদার এরকম বলা রসুলেপাক স. এর উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো না। রসুলেপাক স. এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তাঁর কথার তাৎপর্য ছিলো এরকম— তিনি রসুলেপাক স.কে একথা জানিয়ে দিলেন, তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং রাগ এ পরিমাণ আছে যে, তিনি ওই লোককে হত্যা করে ফেলতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে তা-ই, যা রসুলেপাক স. বলেছেন। হজরত সাআদ ইবনে উবাদার কথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা শোনো, তোমাদের সরদার কী বলে। নিশ্চয়ই সে একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও তেজস্বী ব্যক্তি। আমি তার চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আর আল্লাহ্‌তায়ালা আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাশালী ও রোষতপ্ত। আল্লাহ্‌তায়ালার রোষান্বিত হওয়ার কারণে বান্দার গোনাহ্ প্রকাশ করাকে হারাম করে দিয়েছেন চাই সে গোনাহ্ প্রকাশ্যে হোক অথবা হোক গোপনে। রসুলেপাক স. যা বললেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝানো যে, 'গায়রত' যার অর্থ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রোষ ও অভিমান। এসব কোনো সম্মানী ব্যক্তি বা নেতৃস্থানীয়গণের মধ্যে বিদ্যমান থাকা খুবই স্বাভাবিক। যদিও শরীয়তে এর একটি বিধান দেওয়া আছে। সেই বিধানানুযায়ীই চলতে হবে। 'গায়রত' শব্দের অর্থ আত্মমর্যাদা, আত্মাভিমান। 'গায়রত' সাধারণতঃ হয় প্রিয়জনের প্রতি। কোনো প্রিয়জনের মধ্যে এমন কোনো আচার-আচরণ প্রকাশ পায়, যা সে পছন্দ করে না এবং তা দেখে মনে কষ্ট হয় এমন কাজকে বলে 'গায়রত' বা আত্মমর্যাদা। আল্লাহ্‌তায়ালার 'গায়রত' বা আত্মমর্যাদাবোধ বান্দাকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, যাতে করে বান্দা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি থেকে দূরে চলে না যায়। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত ও অনুগ্রহের কারণেই এরকম হয়ে থাকে। সে কারণেই বিধান দেওয়া হয়েছে, যেনা করা অবস্থায় দেখা মাত্রই তাকে হত্যা করা যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে শরীয়তসম্মতভাবে প্রমাণ ব্যতীত মেয়েলোককেও সঙ্গেসার করা যাবে না।

দশম হিজরীর ঘটনাবলী

দশম হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে বহু প্রতিনিধিদলের আগমন রয়েছে। কিন্তু ইতোপূর্বে আমরা প্রতিনিধিদলসমূহের বর্ণনা এক জায়গায় করে ফেলেছি, তা যে কোনো বৎসরেরই হোক না কেনো। এখানে আমরা অন্যান্য ঘটনার আলোকপাত ঘটাবো।

খালেদ ইবনে ওয়ালীদের অভিযান

দশম হিজরীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের অভিযান। এ অভিযানে তাঁকে এক বাহিনী সহকারে বনী হারেছ ইবনে কাআব কবীলার দিকে প্রেরণ করা হলো। রসুলেপাক স. হজরত খালেদকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সেখানে পৌঁছে তিনবার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তারা যদি দাওয়াত কবুল করে, তাহলে তুমি তাদের মধ্যেই থেকে যাবে এবং তাদেরকে কোরআন ও সুন্নতের শিক্ষা দিবে। আর তারা যদি ইসলামের দাওয়াত কবুল না করে, তাহলে তাদের মোকাবেলা করবে। ফরমানে নববী অনুসারে হজরত খালেদ সেখানে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা মুসলমান হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং তাদেরকে কোরআন করীম এবং শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুদিন পর রসুলেপাক স. এর খেদমতে সার্বিক অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখলেন। রসুলেপাক স. নির্দেশ দিলেন, সেখান থেকে একদল লোক নিয়ে দরবারে রেসালতে হাজির হও। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ উক্ত জনপদ থেকে একটি দল নিয়ে মদীনায় এলেন। রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করলেন এবং বললেন, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসুলুল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, আর নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসুল)। রসুলেপাক স. বললেন, আমিও আল্লাহ্তায়ালার একত্ববাদ ও আমার রেসালতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। তারপর তাদের মধ্যের কায়স ইবনে হাসীনকে উক্ত জনপদের আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে তাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পরবর্তীতে উক্ত জনপদ থেকে জাকাত আদায় করার জন্য আমর ইবনে হাযামকে প্রেরণ করলেন। আমর ইবনে হাযাম ওই জনপদে কর্মরত অবস্থায় রসুলেপাক স. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান।

আমর ইবনে হাযামের জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি আনসার সম্প্রদায়ের নাজ্জার গোত্রের। তাঁর উপনাম ছিলো আবু যাহ্হাক। কেউ কেউ বলেন, আবু মোহাম্মদ। তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম জিহাদ ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। তাঁকে পনেরো

বছর বয়সে নাজরান জনগোষ্ঠীর কাছে জাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। সতেরো বছর বয়সে ইয়ামনে পাঠানো হয়। তাঁর কাছে রসুলেপাক স. এর দেওয়া পত্র থাকতো, যার মধ্যে ফরজ, সুন্নত ও দিয়তের (রক্তপণের) বিষয়ে মাসআলা লিপিবদ্ধ ছিলো।

নাজরানের নাসারাদের কাছে এই বৎসর একটি পত্র পাঠানো হলো। নাজরান ইয়ামনের একটি অঞ্চলের নাম। নাজরান বিন যায়েদ বিল সাবার এর নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিলো। সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো। তারা এ বিষয় নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করলো এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে চৌদ্দজন লোক বাছাই করে মদীনা তাইয়্যেবার দিকে রওয়ানা করালো, যাতে করে তারা সেখানে পৌঁছে রসুলুল্লাহ্ স. এর অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে আসতে পারে। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে লেখা আছে, তারা ষাটজন আরোহী ছিলো। তন্মধ্যে বিশজন ছিলো তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনজন ছিলো এমন ব্যক্তি, যাদের হাতে থাকতো কাওমের যাবতীয় কার্যপ্রণয়নের দায়-দায়িত্ব। একজনের নাম ছিলো আকেব। সে ছিলো কাওমের আমীর, পরামর্শদাতা এবং সরদার। একজনের নাম ছিলো আব্দুল মসীহ। আরেকজনের নাম ছিলো আরহাম। তার উপাধি ছিলো সাইয়্যেদ। তার দায়িত্ব ছিলো দলের লোকজনের মাল-ছামান সংরক্ষণ করা। তৃতীয়জনের নাম ছিলো আবুল হারেছ ইবনে আলকামা। লোকটি ছিলো খুবই চালাক-চতুর এবং সে তার কাওমের শিক্ষকও ছিলো। সে তার নিজের লিখিত পুস্তক থেকে পাঠদান করতো। তাদের কাওমের বাদশাহগণ তাকে যথেষ্ট ইজ্জত-সম্মান করতো এবং তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি মনে করতো। সে রসুলেপাক স. এর পরিচয়-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ববর্তী কিতাব থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলো। কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত, দৌলত ও ইজ্জতের নেশায় নিমজ্জিত হয়ে নাসারাই রয়ে গিয়েছিলো।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, আবুল হারেছ ইবনে আলকামার এক ভাই ছিলো কুরয ইবনে আলকামা। সেও ওই প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলো। সীরাতবিদগণ বর্ণনা করেছেন, আবুল হারেছ ইবনে আলকামার উট পথিমধ্যে মস্ত ক অবনত করে মাটিতে পড়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে কুরয বললো, সেই মস্তক অবনত করে পড়ে যাবে, যে রয়েছে অনেক দূরে। একথা দ্বারা সে মোহাম্মদ স. এর দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আবুল হারেছ বললো, বরং তুমিই মস্তক অবনত করে পড়ে যাবে। কুরয বললো, হে ভাই! তুমি এমন বলছো কেনো? আবুল হারেছ বললো, আল্লাহ্র শপথ। মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। আর তিনি ওই ব্যক্তি আমরা যার অপেক্ষা করে আসছি। কুরয বললো, তাহলে মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করছো না কেনো। কোন্ জিনিস তোমাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছে?

আবুল হারেছ বললো, মোহাম্মদের আনুগত্য করা নিজের কাওমের বিরুদ্ধাচরণ করারই নামান্তর। এ বিষয় যদি আমার থেকে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে খৃষ্টানদের মধ্যে আমার যে মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা শেষ হয়ে যাবে। যে ধন-দৌলত হাদিয়া-তোহফা ও মাল-সামগ্রী তাদের থেকে পেয়েছি, তা সবই আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। একথা শুনে কুরযের অন্তরে ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেলো। সে তাঁর উটকে খুব দ্রুতগতিতে চালাতে লাগলো। রসুলেপাক স. এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করলো। মুসলমানও হয়ে গেলো। কথিত আছে, নাজরানের খৃষ্টানেরা মদীনা যাত্রার সময় সফরের পোশাক খুলে ফেললো। পরিধান করলো রেশমী দোপাট্টা, যার প্রান্তদেশ ছিলো মৃত্তিকাসংলগ্ন। হাতের আঙ্গুলে আংটিও পরিধান করলো তারা। তারপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। সালাম দিলো। কিন্তু নবী করীম স. সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাদের দিক থেকে তার পবিত্র মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। নামাজের সময় তারা তাদের ধর্মের নিয়মে নামাজ পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হলো। পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। তাদের কেবলা ছিলো পূর্ব দিকে। সাহাবীগণ তাদেরকে বিরত রাখতে চাইলেন। রসুলেপাক স. বললেন, ছেড়ে দাও। যেভাবে ইচ্ছে হয় তারা সেভাবেই নামাজ পড়ুক। নামাজ শেষ করে তারা রসুলেপাক স. এর কাছে এসে কিছু কথাবার্তা বললো। তিনি স. কোনো উত্তর দিলেন না। তারা মসজিদ থেকে বের হয়ে হজরত ওছমান এবং হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে খুঁজে বের করলো। এই দু'জনের সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচয় ছিলো। তারা বললো, তোমাদের নবী আমাদের কাছে একটি পত্র দিয়েছিলেন এবং পত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা তো এলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। কথা বললাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না এবং আমাদের সাথে কথাও বললেন না। এখন বলো দেখি, তোমাদের দু'জনের মতামত কী? আমরা কি আমাদের শহরে চলে যাবো? নাকি অপেক্ষা করবো? হজরত ওছমান এবং হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হজরত আলীকে বললেন, হে হাসানের পিতা! এ বিষয়ে তোমার মত কী? হজরত আলী বললেন, আমার মত তোমরা রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলে দিয়ে রাহেবদের (সন্ন্যাসীদের) পোশাক পরিধান করে রসুলুল্লাহ্‌র মজলিশে উপস্থিত হও। তারা তাই করলো। রসুলেপাক স.কে সালাম দিলো। তখন তিনি স. সালামের জবাব দিলেন। বললেন, শপথ ওই আল্লাহ্‌র! যিনি আমাকে সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, এরা যখন প্রথম মজলিশে এসেছিলো, তখন তাদের সঙ্গে ছিলো শয়তান। রসুলেপাক স. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। অযথার্থ কথাবার্তা বললো। প্রশ্ন করলো, ঈসা নবী সম্পর্কে কী বলেন? রসুলেপাক স. বললেন, আজ আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর

দিবো না। তোমরা এ শহরে কিছু দিন অপেক্ষা করো। প্রশ্নের উত্তর শুনতে পারবে। রসুলেপাক স. প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় রইলেন। অপেক্ষা শেষে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো— 'ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাছালি আদামা খালাকাহূ মিন তুরাবিন ছুম্মা কালা লাহূ কুন ফাইয়াকুন আল হাক্কু মির রব্বিকা ফালা তাকুম মিনাল মুমতারীন ফামান হাজাকা ফীহি মিম বা'দি মা জ্বাআকা মিনাল ইলমি ফাকুল তাআলাও নাদউ' আবনাআনা ওয়া আবাআকুম ওয়া নিসাআনা ওয়া নিসাআকুম ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম ছুম্মা নাবতাহিল ফানাজআল লা'নাতাল্লাহি আলাল কাযিবীন' (আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তাহাকে বলিয়াছেন, 'হও' ফলে সে হইয়া গেল। সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে, সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল আইস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত) (৩ঃ৫৯, ৬০, ৬১)।

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও তারা অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রইলো। রসুলেপাক স. আয়াতে করীমার নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে 'মোবাহালা' করার জন্য আহ্বান জানালেন। মোবাহালা করার অর্থ একে অপরকে লানত করা। মোবাহালা এসেছে 'বোহলা' অথবা 'বাহলা' শব্দ থেকে। এর অর্থ পরিত্যাগ করা। 'এবতেহাল' শব্দের অর্থ দোয়ার মধ্যে খুব কাকুতি মিনতি করা, যদিও লানত করার বিষয়টি তার মধ্যে থাকে না। সুতরাং মোবাহালার অর্থ দাঁড়ায় কাকুতি মিনতি করে দোয়া করা, যার মধ্যে মিথ্যাবাদীর উপর লানতের প্রসঙ্গটি থাকে। রসুলেপাক স. তাদেরকে যখন মোবাহালা করার আহবান জানালেন তখন তাদের মধ্যে পরামর্শ দিতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে তারা পরামর্শ কামনা করলো। জানতে চাইলো, তারা মোবাহালায় অংশ গ্রহণ করবে কিনা। লোকটি বললো, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা ভালো করেই জানো যে, মোহাম্মদ সত্য নবী। কাজেই তোমরা তাঁর সঙ্গে মোবাহালায় লিপ্ত হয়ো না। নবীর সঙ্গে যে মোবাহালা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। ঈসায়ী ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে যদি চাও, তবে তাঁর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করো। তারপর আপন শহরে চলে যাও। পরের দিন সকাল বেলা তারা রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে দেখলো, তিনি স. মোবাহালা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। হজরত হুসাইন ইবনে আলীকে কোলে নিয়ে হজরত হাসান ইবনে আলীর হাত

ধরে আছেন। তার পশ্চাতে রয়েছেন হজরত ফাতেমাতুয্ যাহরা। তাঁর পশ্চাতে হজরত আলী। রসুলেপাক স. তাদেরকে বললেন, আমি যখন দোয়া করবো তখন তোমরা আমীন, আমীন বলবে। সুবহানাল্লাহ্! কী চরম মুহূর্ত। কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে! কী তার মহিমা! মর্তবা! খৃষ্টানেরা পাক পাঞ্জাতনের (পবিত্র পাঁচজনের) এই জ্যোতির্ময় সমাবেশ দেখে এবং তাঁদের মুখ থেকে দোয়া এবং আমীন বলার ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আবুল হারেছ ইবনে আলকামা বলতে লাগলো, হে লোক সকল! আমি পবিত্র মানুষের সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা যদি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে পাহাড়কে স্থানান্তরিত করে দিতে চান, তাও তাঁদের দ্বারা সম্ভব হবে। খবরদার! তাদের সঙ্গে তোমরা মোবাহালায় লিপ্ত হয়ো না। ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনো খৃষ্টান ভূপৃষ্ঠে থাকবে না। রসুলেপাক স. বললেন, শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, এরা যদি মোবাহালায় নামে তবে বানর ও শুকরে পরিণত হবে। তাদের উপত্যকায় অগ্নি বর্ষিত হবে। সকল অধিবাসী নিক্ষিপ্ত হবে শূন্যে। এমনকি তাদের অঞ্চলের বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখিরাও হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন। এক বৎসরের মধ্যে সকল খৃষ্টান ধবংস হয়ে যাবে। অতঃপর তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার সঙ্গে মোবাহালায় নামবো না। রসুলেপাক স. বললেন, তাহলে তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তারা বললো, এও আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি স. বললেন, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তারা বললো, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তিসামর্থ্য আমাদের নেই। তবে আমরা এই শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করতে চাই যে, আমরা প্রতি বৎসর দু'হাজার হোল্লা দান করবো। এক বর্ণনায় আছে, লাল হোল্লা দান করবো, যার প্রতিটির মূল্য হবে চল্লিশ দেরহাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিরিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট, ত্রিশটি যেরা এবং ত্রিশটি বল্লম। রসুলেপাক স. বললেন, মুসলমানদের যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে উপরোল্লিখিত বস্তুসমূহ থেকে আরও তিরিশটি করে কর্জ হিসেবে দিতে হবে।

রসুলেপাক স. আরও বললেন, তোমরা সুদ খাবে না এবং আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না। উপরোক্ত শর্তসমূহের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো। সন্ধিপত্রও লিপিবদ্ধ করা হলো। কয়েকজন সাহাবী সাক্ষী হলেন। সন্ধিপত্র তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো। বর্ণিত আছে, প্রত্যাবর্তনকালে তারা বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! একজন আমানতদার ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিন। আমাদের মধ্যে যদি কোনো মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে তিনি যেনো সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তার সমাধান করতে পারেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে এমন এক শাক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোক পাঠাচ্ছি, যে হক ও আমানত রক্ষা করবে। অতঃপর রসুলেপাক স. হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে তাদের সঙ্গে পাঠালেন।

তারা সকলেই আপন শহর নাজরানে প্রত্যাবর্তন করলো। অল্প কিছুদিন পরেই সাইয়্যেদ ও আকেব নামক দুই ব্যক্তি মদীনা ফিরে এসে মুসলমান হয়ে গেলো। এই দু'জনের অনুসরণে সম্ভবতঃ আরও একদল লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বিদায়ের প্রাক্কালে রসুলেপাক স. আসকাফ নামক এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছো এবং তোমার উটের হাওদার সামনে ঘুমিয়ে আছো। তারপর ঘুম থেকে উঠে উটের পীঠে উলটাভাবে হাওদা বেঁধেছো। পরবর্তীতে দেখা গেলো, রসুলেপাক স. যেরকম বলেছিলেন, ঘটনা সেরকমই ঘটলো। আসকাফ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠে ভুলক্রমে তার হাওদা উলটাভাবে উটের পীঠে স্থাপন করলো। এরকম অবস্থা যখন তার চোখের সামনে ধরা পড়লো, তখন রসুলেপাক স. এর উক্তি মনে পড়ে গেলো তার। সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চারণ করলো— আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মোবাহালার এই ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দলিল-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কাফের সম্প্রদায় বিরোধী এবং ক্ষতিকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তবে তাদের সঙ্গে মোবাহালা করা শরীয়তসম্মত হবে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মিথ্যাবাদী যে কেউ মোবাহালায় অবতীর্ণ হলে এক বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বাযানের রাজ্য বণ্টন

এই বৎসর ইয়ামনের শাসনকর্তা বাযানের মৃত্যু হয়। রসুলেপাক স. তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার রাজত্ব বণ্টন করে দেন। কিছু অংশ দেন পুত্র শাহর ইবনে বাযানকে। কিছু অংশ হজরত আবু মুসা আশআরীকে। কিছু অংশ ইয়ালা ইবনে উমাইয়াকে। আর কিছু অংশ হজরত মুআয ইবনে জাবালকে। বাযান ছিলেন মূলতঃ কেসরার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তা। পরে তিনি মুসলমান হয়ে যান। পত্র প্রেরণ অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রসুলেপাক স. কেসরাকেও (পারস্য সম্রাটকেও) একটি পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু কেসরা তাঁর পবিত্র চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো।

এই বৎসর বিদায় হজ্বের পূর্বে রসুলেপাক স. হজরত আবু মুসা আশআরী ও হজরত মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের মুখলাফ অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করেন। শহর বা রাজ্যসন্নিহিত অঞ্চলকে বলা হয় মুখলাফ। ইয়ামনের দু'টি মুখলাফ বা অঞ্চল ছিলো। হজরত মুআযকে যে অঞ্চলটি দান করা হয়েছিলো তা ছিলো উঁচু এলাকা আদন প্রদেশের দিকে। সেখানে হজরত মুআযের নামানুসারে একটি

বিখ্যাত মসজিদ আছে। হজরত আবু মুসা আশআরীর এলাকাটি ছিলো নিু অঞ্চল। হজরত আবু মুসা আশআরী তাঁকে ওই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রসুলেপাক স. তাঁকে উপদেশ দেন এভাবে— মানুষের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করবে। কঠোরতা প্রদর্শন করবে না। মানুষকে কল্যাণের সুসংবাদ দিবে। তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে না। মুআযকে প্রেরণকালে উপদেশ দিলেন— তুমি এমন কাওমের কাছে যাচ্ছো, যারা আহলে কিতাব। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'র শাহাদতের দিকে দাওয়াত দিবে। তারা যদি তোমার আনুগত্য গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন, যা তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে গরীবদেরকে দান করা হবে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তোমাকে তাদের উৎকৃষ্ট মালসমূহ গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ জাকাতের জন্য দেয় উৎকৃষ্ট উট, গরু ও বকরীসমূহ শুধু গ্রহণ করবে, আর কমদামী দুর্বল পশুগুলো তাদের জন্য রাখবে, এমনটি করবে না। মজলুমদের বদ দোয়া থেকে নিজকে রক্ষা কোরো। কেননা মজলুমদের (অত্যাচারিতদের) বদ দোয়া ও আল্লাহ্র মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। বোখারী এরকম বর্ণনা করেছেন। তারপর হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে বিদায় হজ্বের পূর্বে দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল, রবিউসসানী বা জমাদিউল আউয়াল মাসে নাজরানদের জনগোষ্ঠী আব্দুল মাদানে প্রেরণ করেন। তারা তাঁর আহ্বান শুনে ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর হজরত আলীকে দশম হিজরীর রমজান মাসে তিনশ' আরোহীর সাথে ইয়ামন অভিমুখে প্রেরণ করলেন। তাঁর জন্য একটি পতাকা বানিয়ে দিলেন এবং স্বহস্তে তাঁর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিলেন। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পাগড়ীতে তিনটি পেঁচ ছিলো। শরয়ীগজে একগজ সামনের দিকে ছিলো আর অপর কিনারার অর্ধ হাত শামলা কাঁধের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। প্রেরণকালে রসুলেপাক স. হজরত আলীকে বললেন, হে আলী! আমি তোমাকে প্রেরণ করছি এবং তোমার বিচ্ছেদে আমি দুঃখ পাচ্ছি। আরও বললেন, তাদের এলাকায় উপস্থিত হয়ে তুমি আগে-ভাগে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। যতক্ষণ না তারা যুদ্ধের সূচনা করে। তাদেরকে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্র দিকে আহ্বান জানিয়ো। যদি তারা ইমান গ্রহণ করে তবে তাদেরকে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দিয়ো। তারা যখন তোমার এই নির্দেশ প্রতিপালন করতে শুরু করবে তখন বোলো জাকাত আদায়ের কথা। বোলো, তারা যেনো তাদের জাকাতের মাল তাদের সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনগণের জন্য ব্যয় করে। এসব নির্দেশ মেনে নিলে তাদের প্রতি আর আক্রমণ করা যাবে না।

নামাজ ও জাকাতের মধ্যে যে ধারাবাহিকতার কথা এখানে বিবৃত হয়েছে, তার দ্বারা সম্ভবতঃ অন্যান্য ইবাদতের উপর নামাজ ও জাকাতের বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়াই উদ্দেশ্য। আর একটি অর্থ— নামাজ কবুল হওয়ার উপর জাকাত ফরজ হওয়া নির্ভর করে। এখানে আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, রোজা এবং হজ্বের বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই হতে পারে যে, নামাজ হচ্ছে দায়েমী ফরজ। রোজা ও হজ্ব দায়েমী ফরজ নয়। তাই নামাজের সঙ্গে রোজা ও হজ্বের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আর জাকাতকে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মাখলুকের হক। তাই এর গুরুত্ব অত্যধিক। পক্ষান্তরে রোজা বৎসরে একবার মাত্র আসে। হজ্ব জীবনে একবার। এজন্যই আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে করীমে নামাজ ও জাকাতকে এক সঙ্গে উল্লেখ করে বিভিন্ন জায়গায় 'তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত দাও' বলেছেন। আর এই হাদিসেও এই দুই ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। হজরত মুআযের এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসেও জাকাতের অপরিহার্যতার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হজরত আলী, ইয়ামন যাত্রার প্রাক্কালে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি আমাকে এমন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করছেন, যারা আহলে কিতাব। আমি একজন নওজোয়ান। বিচারব্যবস্থা ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে আমার যথেষ্ট দক্ষতা নেই। রসুলেপাক স. স্বীয় হস্ত মোবারক তাঁর বুকের উপর রেখে দোয়া করলেন— হে আল্লাহ্! তুমি তার জিহ্বাকে মজবুত করে দাও এবং তার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাও। রসুলেপাক স. এর দোয়ার বরকতে হজরত আলীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নিত হয়েছিলো সর্বোচ্চ স্তরে। তাই রসুলেপাক স. তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ন্যায়বিচারক আলী। হজরত আলীকে উপদেশ দিয়ে তিনি স. তখন আরও বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়েত দান করেন, তাহলে মনে করবে এই আমলটি তামাম দুনিয়া এবং তাতে যতো কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

হজরত আলী রা. সে অঞ্চলে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও প্রয়োজনে জেহাদের ভূমিকায় দৃঢ়তার সাথে অবস্থান নিয়ে বিশালসংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। বিশেষ করে ইয়ামনের হামাদান জনপদের সকল লোক মুসলমান হয়ে গেলো। তিনি এই শুভ সংবাদ রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট প্রেরণ করলেন। রসুলেপাক স. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সেজদায়ে শোকর আদায় করলেন। সেজদা থেকে মাথা তুলে বললেন, আসসালামু আলা হামাদান।

হজরত বুরায়দা আসলামীর যে বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেছে, সেই বর্ণনায় বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীকে প্রথমে

ইয়ামনে পাঠালেন, পরে সেখানে পাঠালেন হজরত আলীকে। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলীকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিলো, হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ কর্তৃক সংগৃহীত গনিমতের মালের খুমুছ (এক পঞ্চমাংশ) সংগ্রহ করা। হজরত বুরায়দা আসলামী বলেন, উক্ত মালের এক পঞ্চমাংশ যখন পৃথক করা হলো তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মালসমূহের মধ্যে কতিপয় বাঁদীও ছিলো। হজরত আলী সেগুলির মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম বাঁদীটি পছন্দ করলেন এবং তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করলেন। বিষয়টি আমি মেনে নিতে পারলাম না এবং এ বিষয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে নালিশ করে বললাম, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আলী কি করছে? তারপর আমি হজরত আলীকে বললাম, হে আবুল হাসান! এ কী রকম আচরণ? তিনি বললেন, তুমি দেখোনি যে, এ বাঁদীটি খুমুছের মাল হিসেবে এসেছে? তারপর পড়েছে আলে মোহাম্মদের ভাগে। সেই সুবাদে সে পড়েছে মালে আলীর ভাগে। তাই আমি তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছি। তাঁর কথা থেকে মনে হলো তিনি যেনো রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে এইমর্মে অনুমতি পেয়েছেন যে, রসুলেপাক স. এর নিকটজন হিসেবে তিনিই খুমুছের হকদার। সেই হিসেবে হজরত আলী মালসমূহ ভাগ করেছিলেন এবং বাঁদীটি তাঁর নিজের ভাগে নিয়েছিলেন। হজরত বুরায়দা বলেন, পরে আমি রসুলেপাক স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ওই ঘটনা খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, হে বুরায়দা! বেশীরভাগ সময় তুমি আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করো। আমি বললাম, হাঁ। তিনি স. বললেন, তার সঙ্গে শত্রুতা কোরো না। আর তার সাথে যদি মহব্বত রেখে থাকো, তাহলে তা আরও বৃদ্ধি করো। হে বুরায়দা! আলীর প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ তো এক বাঁদীর চেয়ে অধিক। হজরত বুরায়দা আসলামীর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র গণ্ডদেশ তখন রাগে রক্তিম হয়ে গেলো। বললেন, আলীর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ কোরো না। কেননা আলী আমা থেকে আর আমি আলী থেকে। সে তোমাদের মাওলা (নেতা)। আমি যে সকল লোকের মাওলা (নেতা) আলীও তাদের মাওলা (নেতা)। কোনো কোনো হাদিস ব্যাখ্যাতা বলেছেন, হজরত আলীর বিরুদ্ধে হজরত বুরায়দার অভিযোগ ছিলো, তিনি এস্তে বরায়ে রেহেম (গর্ভাশয় খালি করণ) ব্যতীতই বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি করা সঙ্গত ছিলো না। কেননা এস্তেবরা মাসআলাটি ফেকাহশাস্ত্রের একটি ইজতেহাদী বিষয়। এমনও হতে পারে যে, হজরত আলী তাঁর ইজতেহাদ অনুসারেই বিষয়টিকে সঙ্গত মনে করেছিলেন।

গাদীরে খুমে হজরত আলী'র উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার বিষয়ে যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিলো, তা হয়েছিলো হজরত বুরায়দা আসলামীর অভিযোগের ভিত্তিতেই। গাদীরে খুমের ঘটনায় তার বিস্তারিত

আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। হজরত বুরায়দা বলেন, এর পর থেকে আমার অবস্থা এমন হলো যে, সাহাবা কেরামের মধ্যে হজরত আলীর চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ রইলো না।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে কোনো কোনো জীবনীচরিতবিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ইয়ামনে হজরত আলীকে প্রেরণ করা হয়েছিলো দু'বার। একবার দশম হিজরীতে, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় বারে প্রেরণের বিস্তারিত বিবরণ জীবনচরিতবিদগণ আর দেননি। কিন্তু একথা স্বীকৃত যে, হজরত আলী ইয়ামনেই অবস্থান করছিলেন। রসুলেপাক স. হজ্বের এহরাম বাঁধলেন। এমতাবস্থায় হজরত আলী ইয়ামন থেকে এসে তাঁর সঙ্গে শামিল হলেন।

বিদায় হজ্ব

দশম হিজরীর বৃহত্তম ঘটনা হচ্ছে রসুলেপাক স. এর হজ্ব সম্পাদন। পূর্বেই জানা গেছে, হজ্ব ফরজ হয়েছিলো ষষ্ঠ অথবা মতান্তরে নবম হিজরীতে। তবে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তার কারণ নবম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হওয়ার দলিল অধিকতর শক্তিশালী। যা হোক, নবম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হয়ে থাকলেও ইসলামের দাওয়াত, আহকাম শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলো সুদৃঢ় করার কাজে মশগুল থাকার কারণে রসুলেপাক স. এ বৎসর হজ্বে গমন করতে পারলেন না। হজরত আবু বকর সিদ্দীককে হজ্বনেতা হিসেবে মক্কা মুকাররমায় পাঠিয়ে দিলেন। দশম হিজরীতে রসুলেপাক স. হজ্ব পালনের উদ্যোগ নিলেন। এই হজ্বকে 'হাজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের হজ্ব) বা 'হাজ্জাতুল বিদা '(বিদায় হজ্ব) বলা হয়। 'ইসলামের হজ্ব' বলার কারণ, এই হজ্বে লোকদেরকে হজ্বের মাসায়েল ও আহকাম শিখানো হয়েছিলো। আর রসুলেপাক স. এই হজ্বের পর পরই আখেরাতের সফরে যাত্রা করেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমার কাছ থেকে হজ্বের বিধি-বিধানসমূহ শিখে নাও। হতে পারে যে, আগামী বৎসর আমি হজ্ব নাও করতে পারি এবং জীবিত নাও থাকতে পারি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই এই হজ্বের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে ও সীরাত (জীবনী) গ্রন্থে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে আছে, হজরত ইবনে আব্বাস 'বিদায় হজ্ব' বলা মাকরুহ মনে করতেন। তবে তিনি তার কারণ বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ তার কারণ এই হতে পারে যে, বিদায় হজ্ব কথাটি রসুলেপাক স. এর বিদায় হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর হজরত ইবনে আব্বাসের মনে এই বিদায়ের বিষয়টি অত্যন্ত পীড়া দেয়। তাই 'বিদায় হজ্ব' বলা তিনি অপছন্দ করতেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. বিভিন্ন অভিযান এবং প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যতিব্যস্ততা থেকে যখন কিছুটা মুক্ত হলেন, তখন হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। এইমর্মে ঘোষণা

দেওয়া হলো যে, রসুলেপাক স. হজ্ব সম্পাদনের ইচ্ছা করেছেন। এই ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি স. বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠালেন। ঘোষণা শুনে মদীনা শরীফে লোকসমাগম শুরু হলো। যিলকদ মাসের শেষের দিকে পাঁচদিন বাকী থাকতে অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। যিলহজ্বের চার তারিখে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন। এই সফরে এতো সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হয়েছিলেন, যার কোনো সংখ্যা ও হিসাব ছিলো না। কেউ বলেছেন, নব্বই হাজার। এক বর্ণনায় আছে, এক লাখ চৌদ্দ হাজার। অপর এক বর্ণনায় আছে, এক লাখ চব্বিশ হাজার। এ কথাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। জীবনচরিতবিদগণ বর্ণনা করেছেন, যেদিকেই নজর যেতো, শুধু মানুষ আর মানুষই দৃষ্টিগোচর হতো।

রসুলেপাক স. পঁচিশে যিলকদ শনিবার দিন গোসল করে চুলে তেল লাগিয়ে চিরুনী ব্যবহার করলেন। এহরামের কাপড়ে আতর লাগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জোহরের নামাজ আদায় করলেন মদীনায়। আর আসরের নামাজ কসরের সাথে সম্পন্ন করলেন যুল হুলায়ফা মসজিদে। অতঃপর এহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করলেন এবং আরোহণ করলেন কাসওয়া নামক উটনীর উপর। উটনীটি যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন তিনি আবার তালবিয়া পাঠ করলেন। মদীনা শরীফের সামনে উঁচুতে একটি বাঁধ ছিলো। সেখানে যখন উঠলেন তখন আবার তালবিয়া পাঠ করলেন। তালবিয়া আরম্ভ করার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন রকম বিবরণ আছে। কোনো কোনো বিবরণে আছে, নামাজের পর রসুলেপাক স. ওই গাছটির নিকট গেলেন, যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববী তৈরী হয়েছে। তখন তাকে মসজিদে শাজারা বলা হতো। রসুলেপাক স. সেখান থেকে তালবিয়া পড়া শুরু করেন। কোনো কোনো বিবরণে আছে, উটনীতে আরোহণ করার পর যখন তা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো তখন তালবিয়া পড়া শুরু করলেন। কোনো কোনো বিবরণে আছে, যখন বাঁধের উপর আরোহণ করলেন তখন তালবিয়া পড়া শুরু করলেন। মোট কথা, যিনি যখন যেভাবে শুনেছেন তিনি সেই অবস্থার কথাই বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তালবিয়া পড়া শুরু হয়েছিলো নামাজের পর। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে এটাই সুন্নত। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত তালবিয়া এরকম এবং এটাই বিখ্যাত— 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদু ওয়ান নি'মাতা ওয়াল মালিকা লা শারীকা লাক' বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত তালবিয়া এরকম 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লি ফী ইয়াদাইকা লাব্বাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আ'মাল'। রসুলেপাক স. এমন উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করলেন যেনো সকল সাহাবী তা শুনতে পান। হুকুম দিলেন, তোমরা উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করো। কেননা জিব্রাইল আমার সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাকে বলছেন, এহরামে উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করার জন্য আপনার

সাহাবীগণকে নির্দেশ দিন। তালবিয়া পাঠ করার পর আল্লাহ্পাকের কাছে দোয়া করলেন— তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য চেয়ে এবং দোজখ থেকে পরিত্রাণ চেয়ে। রসুলেপাক স. এর সওয়ারী ছিলো উট। উটের পীঠে ছিলো পুরাতন গদী। তার উপর কোনো হওদা ছিলো না। সওয়ারীটি যখন আরাদ নামক স্থানে পৌঁছলো তখন হজরত আবু বকরের এক গোলাম পিছনে পড়ে গেলো। তার কাছে ছিলো একটি উট। ওই উটের পিঠে ছিলো রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সফরের সরঞ্জাম। ওই গোলাম ছিলো উটটির চালক। আরদে পৌঁছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক অনেকক্ষণ ধরে ওই গোলামের অপেক্ষা করলেন। অবশেষে গোলামটি এসে হাজির হলো। কিন্তু দেখা গেলো তার সঙ্গের উটটি নেই। হজরত আবু বকর সিদ্দীক জিজ্ঞেস করলেন, উট কোথায়? সে বললো, হারিয়ে গিয়েছে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে প্রহার করতে লাগলেন। গোলামের কারণে তিনি যে লজ্জা পেলেন তা লাঘব করাই ছিলো তাঁর এমতো আচরণের উদ্দেশ্য। রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন এবং বললেন, দেখো একজন এহরামকারীর কাজ দেখো। তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না। এরকম কথা বললেন না যে, এহরাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা এর জন্য কোনো বিনিময় দিতে হবে। তার কারণ সম্ভবতঃ এই হতে পারে যে, এ ধরনের অপরাধে এহরাম নষ্ট হয় না। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে আছে, আবওয়া নামক স্থানে যখন তাঁরা পৌঁছলেন, তখন সফরের ছামান পাওয়া গেলো। আবওয়া এবং ওয়াদান দু'টি জায়গার নাম। এখানে আসার পর সাআব ইবনে জুছামা লাইছী একটি বন্য গাধা হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে হাজির হলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী এবং মুসলিম। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হাদিয়া হিসেবে আনা হয়েছিলো বন্য গাধার একটি বাচ্চা, যা থেকে রক্ত ঝরছিলো। অপর এক বিবরণে আছে, বন্য গাধার গোশতের একটি টুকরা হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, শিকারের গোশতের টুকরা আনা হয়েছিলো। অন্য এক বিবৃতিতে বন্য গাধার একটি পা আনা হয়েছিলো বলা হয়েছে। রসুলেপাক স. তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমি এহরামকারী। তাই শিকারের গোশত খাবো না। এহরামকারীর শিকারের গোশত খাওয়া প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিবৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ওগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'সফরুস্ সাআদাত' গ্রন্থে।

রসুলেপাক স. আসফান উপত্যকায় পৌঁছলেন। বললেন, নবী হুদ ও নবী সালেহ এই উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁদের সওয়ারী হচ্ছে দু'টি লাল রঙের উট। আর সেগুলোর লাগাম খেজুর পাতার তৈরী। তাদের পরনে রয়েছে পশমী লুঙ্গি ও আবা। আর গায়ে রয়েছে পশমী চাদর। তাঁরা তালবিয়া পড়তে পড়তে উপত্যকা অতিক্রম করে চলেছেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মসনদে ইমাম আহমদ

থেকে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন আরযাক নামক উপত্যকায় পৌঁছলেন তখন বললেন, আমি নবী মুসাকে পথ অতিক্রম করতে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল দুই কানে প্রবিষ্ট করে উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করছেন। বোখারীতেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে উপত্যকার নামোল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে রসুলেপাক স. বললেন, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি নবী মুসা এই উপত্যকায় প্রবেশ করেছেন এবং তিনি তালবিয়া পাঠ করছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদিসের তাৎপর্য নিয়ে কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। ১. এটি হচ্ছে একটি সংবাদ। আম্বিয়া কেরামের পবিত্র হায়াতে যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তন্মধ্য থেকে একটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, নবী মুসা হজ্ব করতে আসতেন, এহ্‌রাম বাঁধতেন এবং তালবিয়া পাঠ করতেন। তাঁর এহেন অবস্থার বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে রসুলেপাক স.কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি রসুল মুসাকে দেখেছি। বোখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি। এরূপ কথা পূর্ণজ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিষয়টি এমনই নিঃসন্দেহ যে, আমি যেনো তা দেখতে পাচ্ছি। ২. কেউ কেউ বলেন, এটি ছিলো নিদ্রাবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্নের বিবরণ। স্বপ্নযোগে তিনি এই অবস্থাটি ওই সময় বা ইতোপূর্বে দেখেছিলেন। এ এলাকায় পৌঁছার পর তার উল্লেখ করেছেন। ৩. কেউ কেউ বলেছেন, এটি ছিলো হাকীকতের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা। কেননা আম্বিয়া কেরাম জীবিত। তাঁরা যদি হজ্বে এসে থাকেন, তাহলে তাতে কোনো বাধা নেই। আর যে নবীগণের বর্ণনা হাদিসে এসেছে, তাঁরা হয়তো ওই বৎসর হজ্ব সম্পাদনে এসে থাকবেন। কেননা রসুলেপাক স. হজ্বে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। আর রসুলেপাক স. তাঁদেরকে সেই অবস্থাতেই দেখেছেন। ৪. আর একদল লোক বলেন, আম্বিয়া কেরাম তাঁদের আপন আপন কবরসমূহে অথবা বেহেশতের মধ্যে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের পবিত্র আত্মাসমূহ আকৃতিবান হতে পারে এবং দেহের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারে। যেমন রসুলেপাক স. মেরাজের রাত্রিতে হজরত মুসাকে তাঁর কবরের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখেছেন, আবার আকাশেও দেখেছেন। আর এহেন আকৃতিবান দেহকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন এবং স্বপ্নযোগেও দেখেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ হচ্ছে আলমে মিছালের দর্শন, যা কাশফের পর্যায়ভুক্ত। কাশফধারী ব্যক্তির অবস্থা এরকম হয়ে থাকে। ৫. এর চেয়েও বড় একটি কথা আছে, এ জগতে যেখানে আকলসমূহ এক অদৃশ্য সুতার মধ্যে আবদ্ধ আছে সেখানে আকলের সে ক্ষমতা কোথায়, যে ওই কথাকে ধারণ করতে পারবে? আর সে কথাটি হচ্ছে এই— উলামা কেরাম বলেন, রসুলেপাক স. ওই সকল আম্বিয়া কেরামকে ওই অবস্থার উপর দেখেছেন, যে অবস্থা তাঁদের

জীবনে বিদ্যমান ছিলো। আর এ অবস্থাটি ওই জগতের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বলতে কিছু নেই— সবই বর্তমান কাল। আর এ অবস্থার বিষয়টি কোনো কোনো কাশফধারী ব্যক্তি যমান (সময়) ও মাকানের (স্থানের) পর্যালোচনায় তাঁদের পুস্তিকাসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. সারাফ নামক জায়গায় পৌঁছলেন। সারাফ মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছার পর উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ঋতুবতী হলেন। ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসুলেপাক স. বললেন, কাঁদছো কেনো? সম্ভবতঃ তোমার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। তিনি বললেন, হাঁ। রসুলেপাক স. বললেন, চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্তায়ালা নবী আদমের কন্যাদের জন্য এরকমই নির্ধারণ করেছেন। হজ্বযাত্রীগণ অন্যান্য যে সব আমল করে, তুমিও তা করতে থাকো। তবে কাবা গৃহের তওয়াফের কাজটি কোরো না। যেহেতু তা মসজিদ, আর ঋতুবতী কোনো নারী ওই অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা শুধু ওমরার এহরাম করলেন। এখন যেহেতু ওমরা পালন করাও অসম্ভব, তাই রসুলেপাক স. চাইলেন হজ্ব ও ওমরা এক সাথে করিয়ে নিতে। অর্থাৎ কেরান হজ্ব করিয়ে নিতে চাইলেন। যেহেতু রসুলেপাক স. স্বয়ং কেরানকারী ছিলেন। তাই তিনি স. তাঁকে বললেন, গোসল করে হজ্বের এহরাম পরে নাও। হায়েজ ও নেফাসধারী রমণীদের এরকম অবস্থায় এহরাম বাঁধা জায়েয আছে। তারা গোসল করে এহরাম বেঁধে নিতে পারে। যুলহুলায়ফাতে আসমা বিনতে উমায়েরের এরকম অবস্থা হয়েছিলো। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের স্ত্রী ছিলেন। ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের মাতা। রসুলেপাক স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তুমি গোসল করে পট্টি বেঁধে নাও এবং এহরাম পরো। উল্লেখ্য, ঋতুবতী হওয়ার কারণে উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার যে ওমরা ছেড়ে দিতে হয়েছিলো তা তিনি পরবর্তীতে কাযা করে নিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করলেন। তারপর সূর্য উপরে উঠার পর তৎকালীন হজ্বের রাস্তা যেখানে কবরস্থান অবস্থিত, যাকে মুআল্লা বলা হয়, যেখানে কাদায়া নামক একটি পাহাড় আছে— সেই পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রচলিত নিয়ম আনুসারে মানুষ সেহরীর সময় (মধ্য রাত্রিতে) মক্কায় প্রবেশ করে থাকে। অবশ্য এই সময় নুরানী ও বরকতপূর্ণ। কিন্তু চাশতের সময়েরও তো নুরানিয়াত ও মর্যাদা আছে। হজরত আতা বলেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা ইচ্ছে করলে রাতের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারো। কিন্তু সাইয়্যেদে আলম স. যেহেতু ইমাম, আর ইমামের নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে দিনের প্রবেশ। যাতে করে লোকেরা দেখতে পারে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে পারে।

সুতরাং তাই করা হলো। রসুলেপাক স. বাবে শায়বাতে (যাকে বাবে সালামও বলা হয়) পৌঁছলেন এবং খানা কাবা দর্শন করলেন, তখন এই দোয়া পড়লেন— 'আল্লাহুম্মা আংতাস সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু হায়্যিনা রব্বা বিস্‌সালামি আল্লাহুম্মা যিদ হাজাল বাইতা তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যিমাওঁ ওয়া তাকরীমাওঁ ওয়া মাহাবাতান' এবং দোয়ার শেষে 'মিন হুজ্জাতি ওয়া'তামারু তাকরী মাওঁ ওয়া তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যিমাওঁ ওয়া বার্‌রা' পড়লেন। মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় সোজা কাবা ঘরের দিকে চলে গেলেন। 'তাহিয়াতুল মসজিদ' নামাজ পড়লেন না। বরং তওয়াফ শুরু করলেন। কেননা মসজিদে হারামের তাহিয়া হচ্ছে তওয়াফ। অন্যান্য মসজিদের তাহিয়া হচ্ছে নামাজ। মসজিদে হারামে তওয়াফই নামাজের স্থলাভিষিক্ত। রসুলেপাক স. যখন হাজারে আসওয়াদের সামনে গেলেন, তখন এস্তেলাম করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। কিন্তু হাত উত্তোলন করলেন না। 'সফরুস সাআদাত' পুস্তকে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 'ফেকহে হানাফিয়া' পুস্তকে তকবীর, তাহলীল ও হাত উঠানোর বর্ণনা পাওয়া যায়। এইমর্মে একটি হাদিসও বর্ণনা করা হয়েছে। হাজারে আসওয়াদ এস্তেলাম করার পর তওয়াফ শুরু করলেন। তওয়াফকালে খানা কাবাকে বাম দিকে রাখলেন। এ তওয়াফকে তওয়াফে কুদুস বা তওয়াফে তাহিয়া বলে। রসুলেপাক স. বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ দোয়া পড়েছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া পাঠ করেছেন 'রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আজাবান্নার' (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর)(২ঃ২০১)। হজরত আবু হুরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. উক্ত আয়াতের পূর্বে এই দোয়াটিও পাঠ করলেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আফিয়াতাহু ফিদ দীনি ওয়াদ দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরা'। ইমাম মোহাম্মদ 'মাশাহেদে হজ্ব' পুস্তকে বিশেষ কোনো দোয়ার উল্লেখ করেননি। বলেছেন, বিশেষ কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করাতে অন্তরের নম্রতা দূর হয়ে যায়। তারপরও যদি কেউ কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত দোয়া বরকত স্বরূপ পাঠ করে, তবে তা ভালোই। রসুলেপাক স. তওয়াফকালে প্রথম তিন চক্কর দ্রুতগতিতে করেছেন। ছোটো ছোটো কদমে দৌড়ের মতো করেছেন। যেমন পালোয়ানরা করে থাকে। এই আমলটিকে রমল বলা হয়। আর চাদর মোবারক ডান কাঁধ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রেখেছেন। একে এসতেবা বলা হয়। এ আমলটিও প্রথম তিন চক্করের সাথে বিশিষ্ট ছিলো। শেষে চার চক্কর আস্তে আস্তে করেছেন। হাজারে আসওয়াদের বরাবর হলে তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা ইশারা করে

সেই লাঠিকে এসতেলাম (চুম্বন) করেছেন। তাঁর ওই লাঠির অগ্রভাগ ছিলো বাঁকা। লাঠিটি তাঁর হাতে থাকতো। ওই দিনও তওয়াফের সময় লাঠিটি তাঁর হাতে ছিলো।

রুকনে ইয়ামনীতে (ওই দু'টি কোণ যা ইয়ামনের দিকে) উপস্থিত হলে রসুলেপাক স. হাত দ্বারা ইশারা করতেন, অথবা ইশারা করতেন হাতের লাঠি দ্বারা। তবে ইশারা করার পর হাতে বা লাঠিতে চুম্বন করছেন এরকম প্রমাণ নেই। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ইশারা করার পর হাতে এসতেলাম করেছেন। তবে হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করা, মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠাধর হাজরে আসওয়াদে স্থাপন করার বিষয়টি প্রমাণিত। এসতেলাম করার সময় বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। কোনো কোনো সময় তাঁর পবিত্র লালট স্থাপন করেছেন এবং পরে চুম্বন করেছেন। অন্বেষণকারীর অন্বিষ্ট বস্তুকে চুম্বন করার বিষয়টি নিশ্চয়ই আস্বাদ্য। আবার যে স্থানে রসুলেপাক স. এর পবিত্র ওষ্ঠের স্পর্শ লেগেছে, সেই স্থানে চুম্বন করা এবং তাতে ওষ্ঠ স্থাপন করার মধ্যে যে আস্বাদ ও আনন্দ আছে, তা অনুভব করতে পারে কেবল সত্যান্বেষী ও আশেকে রসুল ব্যক্তিরাই। এখানে যে হাল সৃষ্টি হয়, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বিষয়টি কেবলই অনুভূতির। আল্লাহ্তায়ালা যাকে সঠিক অনুভূতি দান করেছেন, সেই কেবল তা অনুভব করতে পারে। এ রকম দু'টি স্থান রয়েছে যার সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, হাজারে আসওয়াদ আর অপরটি গারে ছুর (ছুর পাহাড়) যেখানে হিজরত করার সময় রসুলেপাক স. প্রবেশ করেছিলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে উপস্থিত হলেন। মাকামে ইব্রাহীম ওই পাথরের নাম, যার উপর হজরত ইব্রাহীম আ. এর পবিত্র পদযুগলের ছাপ রয়েছে। মাকামে ইব্রাহীম দ্বারা ওই স্থানকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে ওই পবিত্র পাথর স্থাপন করা হয়েছে। মাকামে ইব্রাহীমে পৌঁছে রসুলেপাক স. এই আয়াত পাঠ করলেন— 'ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা' (তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো)(২ঃ১২৫)। এখানে এসে রসুলেপাক স. মাকামে ইব্রাহীমকে নিজের এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যখানে রেখে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। তওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ পড়া আমাদের নিকট ওয়াজিব। মসজিদে হারামের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই এই দুই রাকাত নামাজ পড়া জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে মাকামে ইব্রাহীমে পাঠ করা। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পড়া উচিত।

দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর রসুলেপাক স. আবার হাজারে আসওয়াদ এসতেলাম করলেন। তারপর বের হয়ে প্রথমে সাফা পর্বতে গেলেন।

যখন সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হলেন, তখন এই আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন— 'ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ'ইরিল্লাহ্' এবং বললেন, আমি আরম্ভ করছি এমনভাবে যেভাবে আল্লাহ্তায়ালা বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি সাফা পর্বতের উপর এমন স্থানে উঠলেন, যেখান থেকে কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়। সাফা পর্বতের উপর আরোহণ করে কাবাগৃহের দিকে মুখ করে তকবীর বললেন এবং এ দোয়াটি পাঠ করেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ওয়া সাদাক্বা ওয়া'দাহু ওয়া হাযামাল আযাবা ওয়াহ্দাহু'। এক বর্ণনায় 'ওয়া আনযাযা ওয়া'দাহু' কথাটি বেশী আছে। তার পর দোয়া করলেন 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মূজিবাতি রাহমাতাকা ওয়া আ'যাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল আ'সমাতা মিন কুল্লি রাররিওঁ ওয়াস সালামাতি মিনকুল্লি ইছমি আল্লাহুম্মা লা তাদা'ইন লানা জুনূবানা ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মা ইল্লা ফারাজ্জাতাহা ওয়ালা কারবান ইল্লা কাশাফাতহা ওয়ালা হাযাতা মিন হাওয়াইজিদ দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতি ইল্লা কাদাইতাহা'। তারপর আবার সেই পূর্বোল্লিখিত তাহলীল তিনবার পাঠ করলেন এবং এই তিন বার পড়ার মাঝে দোয়া করতে থাকলেন। অতঃপর নিচে নেমে এলেন। 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে এই দোয়াটি বর্ণিত হয়েছে— যা তিনি স. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে পাঠ করেছিলেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা উদ্'ঊনী আসতাজিবলাকুম ওয়া ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআ'দি ওয়া আস আলুকা কামা হাদাইতানী লিল ইসলামি আন তানযিআহ্ মিন্নী হাত্তা ইয়াতা ওয়াফ্ফানী ওয়া আনা মুসলিমুন'। তারপর নিচে অবতরণ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া পড়েছিলেন 'রব্বিগ্ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা লা গাফারাল আকরাম'। সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ করে সায়ী করলেন। ওয়াদী থেকে অবতরণকালে ধীরে চললেন। আজও সায়ী'র স্থানে সায়ীর সীমানা নির্ধারণ করার জন্য হেরেমের মসজিদের দেয়ালে চিহ্ন দেওয়া আছে। সেখানে লেখা আছে 'বাইনাল মাইলাইনিল আযদারাইন'। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত সায়ী কলেন। আবার সায়ী করলেন মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত। এভাবে সায়ী করলেন সাতবার এবং মারওয়া পাহাড়ে সায়ী সমাপ্ত হলো। প্রত্যেকবার মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে ওই সকল দোয়া পড়লেন, যেগুলো পড়েছিলেন সাফা পাহাড়ে। পায়ে হেঁটেই সায়ী সম্পাদন করলেন তিনি। পরবর্তীতে যখন মানুষের ভীড় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলো, সায়ীকারীদের ভীড় তো কিছু ছিলোই, তদুপরি ছিলো দর্শনার্থীদের ভীড়। রসুলেপাক স.কে দেখার জন্য বাইরে থেকে অনেক লোক এসে সমবেত হয়েছিলো। তিনি স. একটি উটনীর উপর আরোহণ করলেন। লোকেরা বলতে

লাগলো ‘হাজা রাসূলুল্লাহি হাজা মোহাম্মাদ’ (ইনি আল্লাহ্‌র রাসুল, ইনি মোহাম্মদ)। এমনকি তাঁকে এক নজর দেখার জন্য পর্দানশীন মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে চলে এসেছিলো। তবে এতো ভীড়ের মধ্যেও ‘দূর হও’ ‘সরে যাও’ ‘সাবধান ’ এ ধরনের কথা কেউ বলেনি। রাজা বাদশাহ্‌দের গমনকালে যেরকম আওয়াজ দেওয়া হয় সেরকম কোনো শব্দ সেখানে ছিলো না।

সায়ী শেষ করে তিনি স. নির্দেশ দিলেন যাদের কাছে কোরবানীর পশু নেই, তারা যেনো এহরাম মুক্ত হয়ে যায়। এহরাম মুক্ত হওয়ার বিষয়টি কোনো কোনো সাহাবীর কাছে কঠিন মনে হলো। তখন রসুলেপাক স. বললেন, আমার নিকট যদি কোরবানীর পশু না থাকতো, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম।

এমন সময় হজরত আলী মুর্তযা ইয়ামন থেকে এসে পৌঁছলেন। তিনি কোরবানীর নিয়তে কয়েকটি উট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। রসুলেপাক স. এর সাথে যে উট ছিলো এবং হজরত আলী যেগুলো নিয়ে এলেন, সেগুলোসহ মোট সংখ্যা দাঁড়ালো একশত। রসুলেপাক স. বললেন, হে আলী! তুমি এগুলো কী নিয়তে নিয়ে এসেছো? তিনি বললেন, ‘ইহ্‌লালান কাইহ্‌লালিন নাবী’ (আল্লাহ্‌র নবী যেভাবে কোরবানী করবেন, সেভাবে কোরবানী করার জন্য) রসুলেপাক স. বললেন, আমি হজ্বের এহরাম বেঁধে এসেছি এবং আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু এনেছি। হে আলী! তুমিও এহরামের মধ্যে থাকো। হজরত আলী দেখলেন, হজরত ফাতেমা রঙ্গীন কাপড় পরিহিত অবস্থায় আছেন। অর্থাৎ তিনি এহরাম মুক্ত, হজরত আলী তাঁকে বললেন, তুমি কেনো হালাল হয়ে গিয়েছো? তিনি জবাব দিলেন, রসুলেপাক স. আমাকে এরকমই হুকুম দিয়েছেন। রসুলেপাক স.ও তাঁর কথায় সায় দিলেন। উম্মতজননীগণের মধ্য থেকে সকলেই হালাল হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ছিলেন ব্যতিক্রম। রসুলেপাক স. এর নির্দেশ মতো সাহাবা কেরাম যখন হালাল হয়ে গেলেন, তখন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হলক (মস্তক মুণ্ডন) করলেন। আবার কেউ কেউ চুল কর্তন করলেন। রসুলেপাক স. হলককারীদের জন্য দোয়া করলেন ‘আল্লাহুম্মা ইর্‌হামিল মুহাল্লিকীন’ (হে আল্লাহ্! হলককারীদেরকে রহম করো)। এভাবে তিনবার তাদের জন্য দোয়া করলেন। চুল কর্তনকারীরা যখন কাকুতি মিনতি করলেন, তখন তাঁদের জন্য একবার বললেন ‘রযাল মুকাসসিরীন’ (কর্তনকারীদেরকেও) এ ধরনের ঘটনা হুদায়বিয়াতেও ঘটেছিলো। তবে এ সম্পর্কিত বিদায় হজ্বের হাদিসগুলো অধিকতর সুস্পষ্ট। ইমাম নববী এই জাতীয় হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করছেন ‘হুয়াস সাহীহু ওয়াল মশহুর’ (এই হাদিস সহীহ্ এবং মশহুর)। তিনি আরও বলেছেন, উভয় স্থানেই এ রকম সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ইবনে দাকীক বলেছেন, এটাই নিকটতর। ‘ফতহুল বারীতে’ বলা হয়েছে, এটাই নির্ধারিত। কেননা উভয় স্থানের বর্ণনাকারী হাদিসসমূহে রয়েছে তাওয়াতুর (ধারাবাহিকতা)।

রসুলেপাক স. রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ এই চারদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। বৃহস্পতিবার সূর্য উপরে উঠার পর চাশতের সময় মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। যে সকল সাহাবী হালাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং যারা এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, সকলেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মিনায় পৌঁছার পর সেখানে অবস্থান করলেন। জোহর ও আসরের নামাজ সমাপন করলেন, রাত্রি অতিবাহিত হলো। পর দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর আরাফার দিকে চললেন। কোনো কোনো সাহাবী তকবীর বলছিলেন। কেউ কেউ পড়ছিলেন তালবিয়া। রসুলেপাক স. কোনো আপত্তি করেননি। কেননা উদ্দেশ্য এখানে একই— যিকির, তসবীহ এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা। তবে তালবিয়া পড়াই উত্তম। রসুলেপাক স. নামিরায় পৌঁছে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। নামিরা আরাফার নিকটবর্তী স্থান। সেখানে তাঁবু নির্মাণ করা হলো। তিনি তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেদিন ছিলো শুক্রবার। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লো, তখন ছওয়ারীকে মিনপুশ লাগানোর হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি স. ছওয়ারীতে আরোহণ করে উপত্যকায় চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে হৃদয়স্পর্শী এক ভাষণ দিলেন। দ্বীনের বিধান ও নিয়ম-কানুনের বিবরণ দিলেন। অবশ্য এ সকল কিছু সম্পর্কে সাহাবীগণ পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন, তথাপিও এ সকল বিষয়ে তাকীদ করা, শিরিক ও জাহেলিয়াতের ভিত্তিসমূহ পুরোপুরিভাবে উৎপাটিত করে দেওয়া এবং জাহেলিয়াতের কুসংস্কারসমূহ সমূলে ধ্বংস করাই ছিলো ওই ভাষণের উদ্দেশ্য। তিনি বললেন, তোমাদের জান ও মাল ওই রকম পবিত্র যেমন পবিত্র আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর। তিনি আরও বললেন, মূর্খতার যুগের সকল অপবিশ্বাস ও অপসংস্কৃতি আজ আমি পদদলিত করলাম। আরবদের স্বভাব হচ্ছে, যে জিনিসকে একবার তারা বাতিল বলে গণ্য করে, পুনরায় তারা তা বাস্তবায়ন করে না। তারা তাতে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করে না। তাই রসুলেপাক স. বললেন, আমি সেগুলোকে পদদলিত করলাম— বাতিল বলে আখ্যায়িত করলাম। তিনি আরও বললেন, মূর্খতার যুগের সকল রক্তপণ আমি বাতিল ঘোষণা করলাম। আর সর্বপ্রথম আমি আমার বংশের রক্তপণ বাতিল ঘোষণা করলাম। আর তা হচ্ছে ইবনে রাবীআ ইবনে হারেছের রক্তপণ। ইবনে রাবীআ বনী সাআদ গোত্রে দুধ পান করতো। রসুলেপাক স.ও বনী আসাদ গোত্রে দুধ পান করেছিলেন। গোত্রটি দুধ পান করানোর কাজে খুব খ্যাতিমান ছিলো। হারেছ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র— রসুল স. এর চাচা। হারেছের পুত্র রাবীআ রসুলেপাক স. এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। বয়সে তিনি রসুলেপাক স.এর চেয়ে বড় ছিলেন। সেই রাবীআর পুত্রের নাম ছিলো আয়াস। সে বনী সাআদ গোত্রে দুধ পান করতো। বনী সাআদ ও হুযায়েল গোত্রে একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। সে যুদ্ধে

একটি পাথরের আঘাতে আয়াসের মৃত্যু হয়। সেই সূত্রবলে বনী আব্দুল মুত্তালিব বনী সাআদের কাছে তার রক্তের দাবীদার হয়েছিলো। রসুলেপাক স. সেই রক্তপণ মাফ করে দিলেন। বনী আব্দুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী উঠিয়ে নিলেন। তিনি স. তাঁর বক্তৃতায় আরও বললেন, জাহেলিয়াতের যুগের সুদ রহিত করে দেওয়া হলো। কুরাইশদের অভ্যাস ছিলো তারা জাহেলী যুগ থেকেই সুদের কারবার করতো এবং তারা সুদভিত্তিক ঋণ দিতো। সুদসহ তারা ঋণের অর্থ দাবী করতো। রসুলেপাক স. উক্ত সুদের দাবী বাতিল ঘোষণা করলেন। বললেন, সর্বপ্রথম আমি যে সুদ রহিত করলাম তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তলিবের সুদ। রসুলেপাক স. এই বক্তৃতায় নারীদের প্রতি সদাচরণ, বিনম্র ব্যবহার করা, তাদের হক আদায় করা এবং তাদের প্রতি এহসান করার উপদেশ দিলেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্তব্য রয়েছে, সে সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। বললেন, স্ত্রীদের হকের ব্যপারে তোমরা আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করো। পরহেজগারী এখতিয়ার করো এবং তাদের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখো। যে কলেমার ভিত্তিতে তোমরা তাদেরকে হালাল করে নিয়েছো, তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের দখলে নিয়েছো, আল্লাহ্র হুকুম ও তাঁর দেওয়া ওয়াদা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তোমরা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিয়েছো, তা যথাযথ রক্ষা করার প্রতি যত্নবান হয়ো। আর স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, তারা তাদের স্বামীদের অবর্তমানে অন্য পুরুষকে শয্যাপাশে ডাকবে না। অর্থাৎ নারীরা কোনো পরপুরুষকে কাছে আসতে দিবে না। তারা যদি এমন করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার কোরো। তবে এরকম প্রহার কোরো না, যাতে রক্তপাত হয়। জখম হয়ে যায়। স্ত্রীগণকে খোর পোষ দেওয়া, স্বাভাবিকভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া এবং ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করা ফরজ। রসুলেপাক স. আরও বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নত। বক্তৃতা ও উপদেশবাণী প্রদান করার পর রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের দিন আমার বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। বলা হবে, আমি তোমাদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করেছি আর আমি তোমাদের মধ্যে কী রকম জীবন যাপন করেছি? তখন তোমরা কী উত্তর দিবে? কী বলবে এবং কীরকম সাক্ষ্য দিবে? সাহাবা কেরাম বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, আপনি আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা এবং বিধান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং উম্মতকে অতি উত্তম উপদেশ দিয়েছেন। রেসালতের যে দায়িত্ব আপনার উপর ছিলো, তা অতি যত্নসহকারে আদায় করেছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন। আপনার কাছে যে আমানত ছিলো তা আপনি আদায় করেছেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। তখন রসুলেপাক স.

তাঁর শাহাদত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন এবং মাথা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহুম্মাশহাদ, আল্লাহুম্মাশহাদ' (হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো)। রসুলেপাক স. আরও বললেন, হে মুসলিম জনতা! তোমরা জেনে রেখো, তিনটি জিনিস বক্ষকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে। ১. এখলাসের সাথে আমল করা, ২. মুসলমান ভাইদের কল্যাণ কামনা করা ৩. মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরা। উপস্থিত সকলের উচিত, আমি যা কিছু বর্ণনা করলাম, তা অনুপস্থিত সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আরাফার ময়দানে রসুলেপাক স. যখন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মাতা উম্মুল ফযল বিনতে হারেছ রসুলেপাক স. এর জন্য এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেই পেয়ালাটি গ্রহণ করে এমনভাবে দুধ পান করলেন, যাতে সকলেই দেখতে পায় এবং জানতে পারে যে, তিনি স. রোজা অবস্থায় নন। উলামা কেরাম বলেন, আরাফার দিন রোজা রাখা সুন্নত। তবে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীদের জন্য নয়, জিকির আজকারের আমলে বাধা সৃষ্টিকারী দুর্বলতা যাতে না থাকে, সে জন্য আরাফায় অবস্থানকারীদের রোজা রাখা অনুচিত। ভাষণ শেষ হলো। রসুলেপাক স. ছওয়ারী থেকে নিচে নেমে এলেন। হজরত বেলালকে বললেন, আজান দাও। আজানের পর একামত দেওয়া হলো। জোহর ও আসরের নামাজ কসরের সাথে এক আজান ও দুই একামতে আদায় করলেন। দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো সুন্নত ও নফল পড়লেন না। আরাফাতে অবস্থান কালে তাড়াতাড়ি না করা এবং দোয়াতে বেশী সময় যাতে পাওয়া যায়, সে উদ্দেশ্যেই এরকম করলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে আরাফার দিনই কেবল দুই নামাজ একত্র করতে হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বীদের এক জামাতও এই মত পোষণ করেন। অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এর কারণ মনে করেন সফর। অর্থাৎ সফরের কারণে দুই নামাজ একত্র করে পড়া যায়। কিন্তু বিদায় হজ্বে আরাফার ময়দানে মুসাফির এবং মুকীম দু'ধরনের লোকই ছিলো। রসুলেপাক স. তো তাদেরকে মানা করেননি। বরং কসর করাকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং সাব্যস্ত হলো লাব্বাইকের কারণেই দুই নামাজ একত্র করা যায়— সফরের কারণে নয়। এর জবাবে তাঁরা হয়তো বলবেন, রসুলেপাক স. এর অনুসরণের কারণে মুকীমগণ কসর করেছিলেন কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলেপাক স. কসর করে দুই রাকাত পড়ার পর বলে দিয়েছিলেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের নামাজ পুরো আদায় করে নাও, আমরা মুসাফির'।

নামাজ শেষে রসুলেপাক স. ছওয়ারীতে আরোহণ করে আরাফাতের পাহাড় জাবালে রহমতের পাদদেশে গেলেন। সেখানে কালো কালো বড় বড় পাথরের নিকট বালির মধ্যে একটি ইমারত দৃষ্টিগোচর হয়। লোকেরা যাকে মাতরাখে

আদম (আদম আ. এর রন্ধনশালা) বলে, সেখানে দণ্ডায়মান হলেন। উলামা কেরাম বলেন, আরাফার ময়দানে নির্দিষ্ট কোন্ জায়গাটিকে রসুলেপাক স. ওকুফ (অবস্থান) করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে কেউ যদি ওই পাথরগুলোর নিকটপ্রান্তরের কোথাও অবস্থান করে, তাহলে রসুলেপাক স. এর ওকুফের জায়গাটি পেয়ে যাবে। জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং তাতে কোনো সওয়াবও নেই। রসুলেপাক স. কেবলামুখী হয়ে উটের পিঠে বসে কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া শুরু করে দিলেন। এ জায়গায় কান্নাকাটির সাথে দোয়া মোনাজাত করা খুব কাম্য। মন উজাড় করে যদি কান্না আসে, তাহলে তা কবুল হওয়ারই আলামত। রসুলেপাক স. দোয়ার সময় তাঁর দুইখানা হাত বক্ষ বরাবর রাখলেন, মিসকীনগণ যে রকম কোনো কিছু যাচ্ঞা করার সময় করে থাকে।

আরাফার দিন রসুলেপাক স. অনেক দোয়া করেছেন। ওরকম বহু দোয়া মাছুরার বর্ণনা হাদিস শরীফে এসেছে। 'সফরুস সাআদাত' পুস্তকে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলেপাক স. বলেছেন, তন্মধ্যে এমন একটি দোয়া আছে, যা সকল নবী ওই দিনে পাঠ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর'। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে এমনিভাবে দোয়া ও জিকির আজকারে মশগুল থাকা উচিত। সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে রওয়ানা করা উচিত নয়। আরাফার দিন রসুলেপাক স. এর উপর এই পবিত্র আয়াত নাজিল হয়— 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আ'লাইকুম নি'মাতী ওয়া রদীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা' (আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম)। হাদিস শরীফে আছে, শয়তানকে এ দিনের চেয়ে বেশী চিন্তিত ও লাঞ্ছিত আর কখনও দেখা যায়নি, আরাফার দিন বনী আদমের উপর আল্লাহ্র রহমত ও মাগফেরাতের প্রাচুর্য দেখে যেমন হয়েছিলো, বদরের দিনও শয়তান এ রকম লজ্জিত ও অপদস্থ হয়েছিলো। যখন সে দেখেছিলো, জিবরাইল আ. ফেরেশতাবৃন্দের ব্যূহ প্রস্তুত করছেন। উলামা কেরাম বলেন, ওই ব্যক্তি কতোই না হতভাগা যে আরাফার ময়দানে অবস্থান করলো, অথচ সে মনে করলো যে, তার গোনাহ্ মাফ করা হয়নি। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্তায়ালা আরাফার দিন ফেরেশতাদের সাথে গৌরব করে বলে, হে ফেরেশতারা! তোমরা দেখো দেখি, আমার এই বান্দারা নিজেদের ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ফেলে এসে আমার জন্য খালি মাথায় ধূলিমলিন অবস্থায় আমার দরবারে এসে আমাকে স্মরণ করছে। আমি তাদেরকে দোজখের আগুন

থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিলাম। আরাফার ময়দানে সামান্য সময় অবস্থান করলেই ফরজ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নত। কেননা রসুলেপাক স. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছিলেন। আর সে সময়ই আরাফার ময়দানে 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম' আয়াতখানি নাজিল হয়। দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এই শুভসংবাদ রয়েছে এই আয়াতে কারীমার মধ্যে। তাই মুসলমানেরা হয়েছিলেন আনন্দিত। কিন্তু কোনো কোনো সচেতন সাহাবী এর মধ্যে শোকের আভাস আঁচ করতে পেরেছিলেন। রসুলেপাক স. এর প্রস্থানের এবং ইহকালীন জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাঁদের অন্তর ব্যথিত হলো। যেমন সুরা নসর নাযিল হলে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের শরীরের পশম খাড়া হয়ে গিয়েছিলো। তিনি কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান থেকে যখন রওয়ানা দিলেন, তখন হজরত উসামাকে উটের পিঠে পিছনে বসালেন এবং রসুলেপাক স. নিজে উটের রশি ধরে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা আরামের সাথে চলো। প্রশান্তিতে থাকো। দ্রুত চলার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। তাড়াহুড়ার মধ্যে পরহেজগারী নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আরাম ও শান্তি আছে। আছে দৃঢ়তার আলামত। পক্ষান্তরে অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতার মধ্যে আছে কলবের অস্থিরতা, বিক্ষিপ্ততা এবং পেরেশানী। তখন দৌড়াদৌড়ি ও তাড়াহুড়া করা নিষেধ করা হয়েছিলো একারণে যে, কতিপয় অবুঝ লোক নামাজের জামাত পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছিলো। তাই রসুলেপাক স. এরকম করে বলেছিলেন।

আরাফা ও মুযদালেফা থেকে মক্কায় ফেরার পথের একটি জায়গার নাম ফারনীন। আরেকটি পথ আছে মিনা এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে। রসুলেপাক স. আরাফা থেকে মিনার দিকে প্রত্যাবর্তনকালে ঈদগাহে আসা-যাওয়ার নিয়ম পালন করলেন। প্রত্যাবর্তনকালে ধরলেন ফারনীনের পথ। প্রত্যাবর্তনকালে উটের রশি সামান্য শিথিল করে রাখলেন, যাতে উট মধ্যম গতিতে চলতে পারে। উট প্রশস্ত রাস্তায় দ্রুত গতিতে চললো। আবার উঁচু স্থানে ওঠার সময় উটের রশি বিলকুল ছেড়ে দিলেন, যাতে করে উটটি সহজ ছন্দে উঠতে পারে এবং তিনি স.ও নিশ্চিন্ত হয়ে তালবিয়া পাঠ করতে পারেন।

পথে এক স্থানে অবতরণ করে ওযু করলেন। ওযুতে পানি খুব বেশী খরচ করলেন না। আবার ওযুও সম্পন্ন করলেন পুরোপুরিভাবে। হজরত উসামা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মাগরিবের নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করেছেন কি? রসুলেপাক স. বললেন, নামাজ হবে সামনে। অর্থাৎ মুযদালেফায় এশার নামাজের সঙ্গে। তারপর উষ্ট্রারোহী হয়ে মুযদালেফায় পৌঁছলেন। মুযদালেফা

মিনা ও আরাফার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মূর্খতার যুগে কুরাইশ বংশের লোকেরা মুযদালেফাতেই অবস্থান করতো। আরাফার ময়দানে যেতো না। বলতো, আমরা আল্লাহ্‌র হেরেমের প্রতিবেশী। কাজেই হেরেমের বাইরে আমরা যেতে পারি না। রসুলেপাক স. মুযদালেফায় পৌঁছে আবার পরিপূর্ণ ওযু করলেন এবং আযান দানের নির্দেশ দিলেন। আযানের পর একামত হলো। একামতের পর প্রথমে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। তারপর উটের উপর থেকে মালছামান নামালেন। পুনরায় একামত দিয়ে এশার নামাজ পড়লেন। এশার নামাজের জন্য আযান দেওয়া হলো না। মাগবির ও এশার ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো নামাজও পড়লেন না। এভাবে সম্পন্ন হলো মাগরিব ও এশা একত্র করে। আজান হলো একটি এবং একামত দুইটি। যেমন আরাফার ময়দানে জোহর ও আসর একত্র করে পড়া হয়েছিলো। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত উসামা থেকে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম যুফার, শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদেরও অভিমত এরকম। হজরত ইবনে ওমর থেকে এই হাদিসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি এই হাদিসকে হাসান ও সহীহ্ বলেছেন এবং এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম তিরমিজি আরও বলেছেন, মুযদালেফায় যেহেতু এশার নামাজ ঠিক সময়েই অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাই এখানে আলাদা একামত ও আজানেরও প্রয়োজন ছিলো না। আরাফার ময়দানে আসরের নামাজ তার আপন ওয়াক্তে অনুষ্ঠিত হয়নি। সে কারণে অধিক অবগতি প্রদানের প্রয়োজন ছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. এশার নামাজ আদায় করার পর নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন। রাত্রি জাগরণ করেননি। যদিও অন্য সময় রসুলেপাক স. এই আমলটি যথারীতি করে আসছিলেন। এখানে রাত্রি জাগরণ না করার কারণ হচ্ছে, ভারসাম্য রক্ষা করা এবং শরীরের হক আদায় করা। ফজরের সময় যখন হলো, তখন প্রথম ওয়াক্তেই ফজরের নামাজ আদায় করে নিলেন। ফজরের নামাজ আদায় করার পর তিনি স. ছওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মাশআরে হারামে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া ও রোদনে নিমগ্ন হলেন। 'সফরুস সাআদাত' পুস্তকে আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে ইবনে মাসউদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে উম্মতের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে জওয়াব এসেছিলো জালেমদেরকে ছাড়া আমি সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছি। জালেমকে আমি মাজলুমের হক আদায় না করা পর্যন্ত ক্ষমা করবো না। তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তো সক্ষম, তুমি ইচ্ছা করলে জালেমকে ক্ষমা করে দিয়ে মজলুমকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারো। এই দোয়ার কোনো প্রত্যুত্তর এলো না। মুযদালেফায় এসে রসুলেপাক স. সেই দোয়ার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে

বলা হলো, আমি তোমার দোয়া কবুল করলাম। রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর ফারুক নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক, এ সময় তো আপনার মৃদু হাস্য করার সময় নয়। আল্লাহ্তায়ালা তো সব সময়ই আপনার মুখে মৃদু হাসি রেখেছেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র দুশমন ইবলিস যখন জানতে পারলো, আল্লাহ্তায়ালা আমার উম্মতের জন্য আমার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন এবং উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে মস্তকে মাটি নিক্ষেপ করে সজোরে বিলাপ শুরু করে দিলো। তার এরকম দুর্গতি দেখে আমার হাসি এসেছে।

উলামা কেরাম বলেন, এখানে উম্মত বলতে ওই উম্মতকে বুঝানো হয়েছে, যারা ওই সময় আরাফার ময়দানে উপস্থিত ছিলো। এ জন্য তাঁরা বলে থাকেন, হজ্ব দ্বারা হককুল ইবাদের গোনাহ্ও মাফ হয়ে যায়। আল্লামা তাবারানী বলেছেন, হককুল ইবাদ মাফ হবে, বান্দা যখন তওবা করবে এবং হককুল ইবাদ আদায় করা থেকে অক্ষম থাকবে। ইমাম বায়হাকীও আবু দাউদ এবং ইবনে মাজার ন্যায় বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ক্ষমা করার পক্ষে অনেক দলিল আছে। ওগুলো যদি সহীহ্ হয়, তবে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ধর্তব্য হবে। অন্যথায় আল্লাহ্তায়ালার বাণী 'ওয়া ইয়াগফিরু মাদূনা জালিকা' (শিরক ব্যতীত সকল গোনাহ্ই মাফ করে দিবেন) একথাই হবে যথেষ্ট। আর জুলুমও শিরকের নিম্নের গোনাহ্। মোট কথা হাজীগণের হক্কুল্লাহ্ তো মাফ হবে, তবে হক্কুল এবাদের বিষয়ে মতভেদ আছে। তারপরেও বলা যায় আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমাগুণ অতি প্রশস্ত। আর হাদিসের প্রকাশ্য বর্ণনা এ বিষয়ে ব্যাপক। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মুযদালেফায় রসুলেপাক স. জিকির, তকবীর ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে নিমগ্ন রইলেন। সূর্যোদয়ের নিকটবর্তী সময় মিনার দিকে যাত্রা করলেন। হজরত ফযল ইবনে আব্বাসকে বানালেন রাদীফ। হজরত উসামা ইবনে যায়েদ কুরাইশদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে হজরত ফযল ইবনে আব্বাসকে বললেন, নিক্ষেপের জন্য এখান থেকে পাথর সংগ্রহ করে নাও। পাথরগুলো হতে হবে চানা বুটের চেয়ে বড় এবং বাদামের চেয়ে ছোটো। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, বকরীর লাদির মতো। এ ধরনের পাথরকে হাসায়ে খযফ বা নিক্ষেপের পাথর বলা হয়। পাথর যদি এর চেয়ে কিছু বড়ও হয়, তবু তা জায়েয হবে। তবে সুন্নতের পরিপন্থী হবে। হজরত ফযল ইবনে আব্বাস সাতটি পাথর যমীন থেকে সংগ্রহ করে রসুলে করীম স.কে দিলেন। এই সাতটি পাথর ওই দিনের জন্য, অর্থাৎ দশ তারিখ ঈদের দিন জমরাতুল আকাবার কংকর নিক্ষেপের জন্য যথেষ্ট। আর কেউ যদি পূর্ণ তিন দিনের পাথর সংগ্রহ করে, তবে তাকে সত্তুরটি পাথর সংগ্রহ করতে হবে। সাতটি ঈদের দিনের জন্য। আর তেষট্টিটি আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের জন্য। প্রত্যেক দিন একুশটি করে

কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, বাহাত্তুরটি কংকর সংগ্রহ করতে হবে। ওই সময় এরকমই নিয়ম ছিলো। অর্থাৎ দু' একটি বেশী সংগ্রহ করা ভালো। আবার কেউ কেউ বলেন, এর চেয়েও বেশী নেওয়া ভালো। কেননা এমনও হতে পারে যে, দু' একটি কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাদিস শরীফে সাতটির বর্ণনাই এসেছে। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা কংকরসমূহ থেকে ধূলোবালি পরিষ্কার করে নিলেন। কারও কারও মতে ধৌত করে নেওয়া উত্তম।

পথিমধ্যে রসুলেপাক স. এর সামনে পড়লো খাছআম গোত্রের এক সুন্দরী মহিলা। সে তাঁকে প্রশ্ন করলো, আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ। উটের পিঠে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ। হজরত ফযল ইবনে আব্বাস, যিনি রসুলেপাক স. এর রদীফ ছিলেন, তিনি সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনিও ছিলেন একজন গৌরবর্ণের সুন্দর ও সুদর্শন যুবক। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাত ফযল ইবনে আব্বাসের চোখের সামনে ধরে পর্দা বানিয়ে দিলেন। যাতে একে অপরকে দেখতে না পায়। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তার ঘাড়কে ঘুরিয়ে দিলেন। হজরত ফযল নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার চাচাতো ভাইয়ের গর্দান ঘুরিয়ে দিলেন কেনো? তিনি স. বললেন, আমি যখন একজন যুবক ও যুবতীকে দেখলাম, তখন তাদেরকে শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ পেলাম না।

সে পথেই রসুলেপাক স. এক বৃদ্ধা রমণীকে সামনে পেলেন। সে তার মায়ের বিষয়ে বললো, আমার মা বয়োঃবৃদ্ধা এবং অত্যন্ত দুর্বল। তাকে যদি উটের উপর বসানো হয় তবে তার মৃত্যু হওয়ার আশংকা আছে। এমতাবস্থায় কি আমি তার বদলী হজ্ব করে দিতে পারি? রসুলেপাক স. বললেন, তোমার মায়ের উপর যদি ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দিতে? মহিলা বললো, হা। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে নাও। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঋণ এবং তা পরিশোধ করা অধিকতর উত্তম। এই হাদিসই বদলী হজ্বের দলিল। মাসআলাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌র পুস্তকসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

রসুলেপাক স. মিনার প্রারম্ভস্থল বাতনে মুহাসসারে পৌঁছে দ্রুতগতিতে উট চালালেন। এভাবে অতি দ্রুতগতিতে উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন। আরোহণকারীর জন্য এরূপ করা সুন্নত। কেউ যদি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে, তবে তার জন্যও দ্রুতগতিতে স্থলটি অতিক্রম করা সুন্নত। বাতনে মুহাসসার ওই উপত্যকা, যেখানে আসহাবে ফীল (হস্তিবাহিনী) অবস্থান নিয়েছিলো। যার বর্ণনা কোরআন পাকে লিপিবদ্ধ আছে। মুহাসসার শব্দের অর্থ— যাকে অক্ষম করে দেওয়া হয়েছে, রুখে দেওয়া হয়েছে, স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ স্থানে এসে

হস্তিবাহিনীর হাতিসমূহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। চলাচল করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। হস্তি চালকরা ব্যর্থ হয়েছিলো এবং মক্কায় প্রবেশ করা থেকে তাদেরকে রুখে দেওয়া হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, যে স্থানে আল্লাহ্র দুশমনদের উপর আযাব নাযিল হয়েছিলো, সে স্থান তিনি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতেন। যেমন তবুকের যুদ্ধের সফরে কওমে লুতের বসতি অতিক্রম করছিলেন দ্রুতগতিতে, সাহাবীগণকেও দ্রুতগতিতে অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. মিনার নিচু এলাকায় চাশতের সময় পৌঁছলেন এবং জামরাতুল আকাবায় গিয়ে দাঁড়ালেন। জামরা অর্থ পাথর ও কংকর। পরবর্তীতে পাথর নিক্ষেপের জায়গার নামকরণ করা হয় জামরা। পাথর নিক্ষেপের স্থান তিনটি। জামরায়ে উলা, যা মসজিদে খায়ফের দিকে। মুযদালেফা থেকে মাঝামাঝি পথে আগমন করলে এটি প্রথমে পড়ে। তারপর জামরায়ে উসতা এবং সর্বশেষ জামরায়ে আকাবা। জামরায়ে আকাবা, আকাবা পাহাড় থেকে বের হওয়ার পর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এটির অবস্থান মক্কার দিকে। প্রথমদিন রসুলেপাক স. মুযদালেফা থেকে ওয়াদীয়ে মুহাসসারের পথে জামরায়ে উলা ও জামরায়ে উসতা ছেড়ে জামরায়ে আকাবায় এসে দণ্ডায়মান হলেন। মক্কা মুআযযমা বামে এবং মিনাকে ডান দিকে রেখে এক এক করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। এ সময় রসুলেপাক স. সওয়ার অবস্থায় ছিলেন। প্রত্যেকবার কংকর নিক্ষেপের সময় তকবীর বললেন। বাকী আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন তিন জামরাতে পায়ে হেঁটে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করলেন। অবশ্য ছওয়ার হয়েও কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয। তবে পায়ে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। এটা সুন্নতের মধ্যে গণ্য। পাথর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিলেন। তারপর মসজিদে খায়ফের কাছে নিজের অবস্থানস্থলে ফিরে এলেন। খায়ফ ওই উঁচু জায়গাটিকে বলা হয়, যেখানে পানির ঢল পৌঁছে না। মিনার ময়দানে এ স্থানটিতে একটি বিশাল মসজিদ রয়েছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি গম্বুজ। এখানে তিনি স. এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। ভাষণের আওয়াজ সকল তাঁবুতে পৌঁছে গেলো। এটি ছিলো তাঁর অন্যতম মোজেযা (অলৌকিকত্ব)। রসুলেপাক স. কোরবানীর দিনের পবিত্রতা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করে বললেন, এই দিবসের পবিত্রতা আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া পবিত্রতা। আরও বললেন, সময় আবর্তিত হয়ে আসছে ওই দিন থেকে, যেদিন আল্লাহ্তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বৎসরে বারো মাস। তন্মধ্যে চার মাস হারাম অর্থাৎ এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। তিন মাস আসে ধারাবাহিকভাবে— যিলকদ, যিলহজ্ব, মহররম। আর চতুর্থ মাস রজব যা জমাদিউছ্ছানী এবং শাবানের মধ্যবর্তী। তিনি স. আরও বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং সম্মান একে অপরের জন্য হারাম। অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের রবের নিকট হাজির হতে হবে এবং

তোমাদেরকে তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খবরদার! আমার পরে তোমরা দ্বীন থেকে ফিরে যেয়ো না। পথভ্রষ্ট হয়ো না। এক বর্ণনায় আছে, আমার পর তোমরা কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন কোরো না। একে অপরের গর্দানে আঘাত কোরো না। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হক বা বান্দার হকের খেয়ানত করে, সে তাদের নিজের উপরই খেয়ানত করে। জেনে রেখো, আমি তোমাদের রবের হুকুম আহকাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আরও বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। হে উপস্থিত জনতা! তোমরা যারা উপস্থিত আছো, তার উপর অবশ্যকর্তব্য, অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়া। অতঃপর বললেন, এসো। হজ্বের বিধানসমূহ শিখে নাও। হতে পারে আগামী বৎসর আমি হজ্বে নাও আসতে পারি। তারপর উপস্থিত জনতাকে শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার বিষয়ে হুকুম দিলেন। বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সর্বদাই পাঠ করবে এবং দ্বীন ও শরীয়তের বিরোধীতা করবে না। বিরুদ্ধবাদী হবে না। তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের এবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। রমজানের রোজা রাখবে এবং উলুল আমরের আনুগত্য করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ভাষণ শেষ করে কোরবানীস্থলে গেলেন। জায়গাটি মিনার বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। স্থানটি কোরবানীগাহ বা মানহারুন্নবী নামে খ্যাত। সেখানে উটগুলো শায়িত ও ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো। রসুলেপাক স. স্বহস্তে তেষট্টিটি উট জবেহ করলেন, যা ছিলো তাঁর বয়সের বৎসরের সমসংখ্যক।

বর্ণিত আছে, পাঁচ ছয়টি করে উট জবেহ করার জন্য রসুলেপাক স. এর কাছে আনা হতো। প্রত্যেকটি উট কাছে আসতো এবং আগে আসার জন্য একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি করতো, যাতে রসুলেপাক স. তাকে আগে জবাই করেন। সাঁইত্রিশটি উট জবেহ্ করার জন্য হজরত আলীকে হুকুম দিলেন। এ সবগুলোকে হাদী'র জন্তু হিসেবে গণ্য করেছিলেন। হুকুম দিলেন প্রত্যেকটি উট থেকে অল্প অল্প করে গোশত নিয়ে রান্না করো। অতঃপর রসুলেপাক স. হজরত আলীর সঙ্গে পাকানো গোশত ও শোরবা আহার করলেন। হজরত আলীকে হুকুম দিলেন, উটগুলোর চামড়া ও গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। কসাইদেরকে এ থেকে কিছু দিয়ো না। তাদেরকে যেনো পারিশ্রমিক নিজেদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, সে বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দিলেন। মুসলিম শরীফে হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের পক্ষ থেকে গাভী জবেহ্ করলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকার পক্ষ থেকে গাভী জবেহ্ করলেন। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ওই দিন রসুলেপাক স. বকরীও জবেহ্ করেছিলেন। কোরবানী শেষ করার পর ঘোষণা দিলেন, মিনার সকল স্থানই কোরবানী স্থান। কোনো বিশেষ স্থান কোরবানীর জন্য নির্ধারিত নয়।

তারপর রসুলেপাক স. ক্ষৌরকার অন্বেষণ করলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করলেন। রসুলেপাক স. এর ক্ষৌরকাজ যিনি করলেন, তাঁর নাম মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ্ কুরাশী। তিনি প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ক্ষুর হাতে নিয়ে রসুলেপাক স. এর মস্তকের নিকট দাঁড়ালেন, তখন তিনি স. তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে মা'মার ! আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলের কানের লতির উপর সক্ষম করেছেন এমতাবস্থায় যে, তোমার হাতে ক্ষুর। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে এবং এ নেয়ামতের মূল্যায়ন করবে। হজরত মা'মার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে দণ্ডায়মান হওয়া এবং এ মাকামের মর্যাদা পাওয়া নিশ্চয়ই আমার উপর আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া বিরাট নেয়ামত, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। এ হচ্ছে, তাঁর দেওয়া বিরাট নেয়ামত। অতঃপর তিনি ইশারা করলেন, ডান দিক থেকে মস্তক মুণ্ডন করার কাজ শুরু করো। বাহ্যিকভাবে একথার অর্থ দাঁড়ায় রসুলেপাক স. এর ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা। মেশকাত শরীফে বোখারী ও মুসলিম থেকে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— ক্ষৌরকারীর ডান দিক। যা হোক, ডান দিকে যখন ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত হলো, তখন তার পবিত্র কেশ উপস্থিতদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং বাম দিকে ক্ষৌর কার্য করার নির্দেশ দিলেন। তারপর বাম পার্শ্বের কেশরাজি হজরত আবু তালহা আনসারীকে দান করলেন। আবু তালহা হচ্ছেন উম্মে সুলায়মের স্বামী। আর উম্মে সুলায়ম হচ্ছেন হজরত আনাস ইবনে মালেকের মাতা। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সুলায়মকে দান করলেন ডান দিকের কিছু চুল। সর্বপ্রথম আবু তালহা আনসারীর ভাগে তা পড়েছিলো। তাঁর প্রতি রসুলেপাক স. এর বিশেষ অভিনিবেশ ছিলো— 'জালিকা ফাদ্লুল্লাহি ইউ'তীহি মাইঁ ইশাউ ওয়াল্লাহু জুল ফাদলিল আজিম' (ইহা আল্লাহ্রই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল)(৪ঃ৬২)। পবিত্র মস্তক মুণ্ডন করার কাজ যখন সমাপ্ত হলো, তখন সকল লোকের প্রত্যেকের ভাগে এক বা দু'টি করে চুল পড়লো। মস্তক মুণ্ডন করার পর রসুলেপাক স. নখ কর্তন করলেন এবং তাও লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। বেশীর ভাগ সাহাবী মস্তক মুণ্ডন করলেন। আর চুল কর্তন করলেন অল্পসংখ্যক। রসুলেপাক স. মস্তক মুড়ানোকে কর্তনের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত করলেন।

অতঃপর রসুলেপাক স. মক্কায় ফিরে এলেন এবং তওয়াফ করলেন। এই তওয়াফ হচ্ছে হজ্বের রুকন বা ফরজ। এই তওয়াফকে তওয়াফে এফাযা এবং তওয়াফে যিয়ারত বলে। তওয়াফ সম্পন্ন করার পর যমযমের কাছে গেলেন। বায়তুল্লাহ্র পানি পান করানোর দায়িত্ব হজরত আব্বাস ও তাঁর সন্তানগণের উপর

ছিলো। তাই তিনি যখন পানি উঠাচ্ছিলেন, তখন রসুলেপাক স. বললেন, যদি আমার আশংকা না হতো যে, আব্বাসের আওলাদগণের উপর লোকেরা প্রভাব বিস্তার করবে, তাহলে আমিও নেমে যমযমের কূপ থেকে পানি তুলে তোমাদেরকে পান করানোতে সাহায্য করতাম। কেননা এ কাজের মধ্যে ফযীলত ও বুজুর্গী রয়েছে। এ কথার অর্থ আমি যদি একাজ করি, তাহলে তা আমার পর উম্মতের উপর সুন্নত হয়ে যাবে এবং সুন্নত সৃষ্টি হওয়ায় সব মানুষই এ কাজে হাত লাগাবে এবং তারা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে এবং এ সম্মানজনক কাজটি তোমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। যাহোক রসুলেপাক স. যমযম কূপের নিকট আসার পর হজরত আব্বাস তাঁর কাছে এক বালতি পানি এনে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সে পানি পান করলেন। একথা জানা যায় না যে, রসুলেপাক স. ওই সময় দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন কাজটিকে জায়েয বুঝানোর জন্য, নাকি অন্য কোনো প্রয়োজনে। অথবা ভীড়ের কারণে বসার কোনো জায়গা ছিলো না বলে, নাকি এক্ষেত্রে ছিলো অন্য কোনো কারণ। বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলেন, দাঁড়িয়ে পান করার হুকুম কেবল যমযম ও ওযুর পানির জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত।

এই তওয়াফের সময় রসুলেপাক স. ছওয়ারীর উপর ছিলেন। ছওয়ার করার কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তখন ভীড় খুব বেশী ছিলো। অথবা এই উদ্দেশ্যে করেছিলেন, সকল লোক যেনো তাঁকে দেখতে পায় এবং তওয়াফ করার নিয়ম কানুন শিখতে পারে। আদব ও আহকাম সম্পর্কে জানতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনের তাগিদেই রসুলেপাক স. ছওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছিলেন। আর তাঁর উটনী মসজিদকে নোংরা বানানো থেকে নিরাপদ ছিলো। অতঃপর তিনি স. সেখান থেকে মিনায় ফিরে যান এবং সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত ইবনে ওমর থেকে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফের অপর একটি বর্ণনায় আছে, হজরত আয়েশা ও হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি স. জোহরের নামাজ মক্কাতেই আদায় করেন। কোনো কোনো আলেম এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এই বর্ণনার বর্ণনাকারী দু'জন। একজন হজরত জাবের, আর অপর জন উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা। হজরত জাবের বিদায় হজ্বের হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর বিখ্যাত। আর হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তো রসুলেপাক স. এর সর্বাধিক নৈকট্যধন্য। কোনো কোনো আলেম হজরত ইবনে ওমরের হাদিসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তার কারণ, তাঁর হাদিস মুত্তাফাক আলাইহে (ঐকমত্যসম্মত) অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীই বিখ্যাত ও সম্মানিত। শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, আমরা যদি দু'টি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে চেষ্টা করি, তাহলে একথা বলতে হবে যে, জোহরের

নামাজ মক্কাতে পড়েছেন। আর মিনাতে পড়েছেন একথার অর্থ সেখানে তিনি নামাজ পুনরায় পড়েছেন। সম্ভবতঃ মক্কায় পঠিত নামাজে কোনো ত্রুটি ঘটেছিলো।

রসুলেপাক স. মিনায় ফিরে এলেন। সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন। কোরবানীর পরের দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর জোহরের নামাজের পূর্বে পায়ে হেঁটে জামরায়ে উলায় গেলেন। এই জামরাটি মসজিদে খায়ফের খুব কাছাকাছি। এখানে এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক বার তকবীর উচ্চারণ করলেন। কংকর নিক্ষেপ শেষ করে কয়েক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে কাবামুখী হয়ে দোয়া করলেন। এতো দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করলেন যে, যে কোনো ব্যক্তি এই সময়ের মধ্যে সুরা বাকারা পাঠ শেষ করতে পারে। দোয়া শেষে জামরায়ে উসতাতে গেলেন এবং পূর্বোক্ত নিয়মে সেখানেও কংকর নিক্ষেপ করলেন। সেখান থেকে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে উপত্যকার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে দোয়া করলেন। তারপর সেখান থেকে জামরায়ে আকাবার সামনে গেলেন। কাবা শরীফকে ডান দিকে এবং মিনাকে বাম দিকে রেখে দণ্ডায়মান হলেন এবং কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে ফিরে এলেন। কোনো দোয়া পড়লেন না। এখানে দোয়া না করার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা এলমে নবুওয়াতের শানের উপরই নির্ভরশীল। আলেমগণ এখানে দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে— এই জামরাটি চলাচলের পথে অবস্থিত। ভীড়ও ছিলো প্রচুর। ফলে দাঁড়ানোর মতো কোনো জায়গাও সেখানে ছিলো না। দ্বিতীয় কারণ দোয়া ইবাদতের অন্তর্ভূত। যেমন জামরায়ে উলা এবং জামরায়ে উসতায় হয়েছিলো। জামরায়ে আকাবার পর দোয়া নেই। তার পূর্বে দোয়া হওয়াটিই উত্তম।

রসুলেপাক স. মিনা থেকে যাত্রা করার ব্যাপারে কোনোরূপ তাড়াহুড়া করেননি। ইয়ামুন্নফর হচ্ছে মিনা প্রত্যাবর্তনের দিন। অর্থাৎ ঈদুল আযহার তৃতীয় দিন। আর লায়লাতুন্নফর ওই রাতকে বলা হয়, যে রাতে হাজীগণ মিনা থেকে আরাফার দিকে যাত্রা শুরু করে। আরাফা থেকে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা করাকে এফাদা বলে। আর মুযদালেফা থেকে রওয়ানা করাকে বলে দফা। মিনা থেকে ফিরতি যাত্রাকে বলে নফর (ইয়াওমুন্নফর)। রসুলেপাক স. মিনাতে পুরো তিন দিন অবস্থান করলেন। কেউ কেউ চতুর্থ দিনের কথাও বলেছেন, যা যিলহজ্ব মাসের তেরো তারিখ এবং আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন। রসুলেপাক স. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকরনিক্ষেপ সমাপ্ত করে সেখান থেকে রওয়ানা করলেন। পথে ওয়াদীয়ে মুহাসসারে থামলেন। স্থানটি মক্কার সীমানার বাইরে। সেখানে পাথর খুব বেশী। এর অপর নাম খায়ফে বনী কেনানা। একে আবতাহও বলা হয়। আবতাহ এমন প্রশস্ত ময়দানকে বলা হয়, যেখানে ছোটো ছোটো পাথর

টুকরা থাকে, যেমন সাগর বা নদীর পাড়ে থাকে বালুকণা। মক্কাকে বুতহা বা আবতাহ বলা হয় এ কারণেই। রসুলেপাক স. জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ মুহাসসাবে আদায় করলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই স্থানে অবস্থান ছিলো একটি আকস্মিক ঘটনা। হজরত আবু রাফেকে রসুলেপাক স. এর মালছামান পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। হঠাৎ তিনি সেখানে তাঁবু খাটালেন। রসুলেপাক স. সেখানে পৌঁছে ওই তাঁবুতেই অবস্থান গ্রহণ করলেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজ্বের সুন্নতসমূহ ও মানাসেক পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এটি একটি আমল। কেননা রসুলেপাক স. মিনাতে বলেছিলেন, আগামী কাল ইনশাআল্লাহ্ খায়ফে বনী কেনানায় অবস্থান করবো, সেখানে কাফেরেরা কসম করে বলেছিলো, বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে তারা মেলামেশা করবে না। তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক করবে না এবং ক্রয়-বিক্রয়ও বন্ধ করবে তাদের সঙ্গে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রসুলুল্লাহ্ স.কে তাদের হাতে অর্পণ না করবে। যে স্থানে সত্যপ্রত্যাখানের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিলো, সে স্থানেই তো ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং এভাবে যেনো আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা পালন করা হয়। সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা তিনি করেছিলেন একারণেই। আল্লাহ্তায়ালাই উত্তমরূপে অবগত। ওই স্থানে অবস্থান করার আরেকটি অন্যতম কারণ ছিলো উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ওমরা পালন। তাঁর ওমরা পালনের বিষয়টি না থাকলে হয়তো বা রসুলুল্লাহ্ স. আরও কম সময় সেখানে অবস্থান করতেন।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী) শায়েখ আজাল আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী শাযলী কাদেরীর খেদমতে মিনায় মুহাসসারে এসেছিলেন। তখন তিনি জোহরের নামাজ এ স্থানে আদায় করার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর আসরের নামাজও এখানে আদায় করেন। অতঃপর বলেন, সুন্নত অনুসরণের সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট।

রসুলেপাক স. রাতের কিছু অংশে এখানে বিশ্রাম করলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর ছওয়ার হলেন এবং মক্কায় গমন করলেন। বিদায়ী তওয়াফ করলেন। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তওয়াফ করা ওয়াজিব। রসুলেপাক স. এই তওয়াফে রমল করেননি। কিন্তু তওয়াফের দুই রাকাত নামাজ ঠিকই আদায় করেছেন। তওয়াফের পর সাধারণতঃ দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। সেই তওয়াফ ওয়াজিব হোক, অথবা হোক নফল। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এ রাতে ওমরা করার অনুমতি চাইলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তার ভাই আব্দুর রহমানকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তিনি হেরেমের বাইরে অবস্থিত তানঈম নামক স্থানে গিয়ে সেখান থেকে এহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং ওমরা আদায় করলেন। রাত তখনও শেষ হয়নি। হজরত

আয়েশা সিদ্দীকা ওমরা শেষ করলেন এবং মুহাসসারে ফিরে এলেন। তারপর রসুলেপাক স. যাত্রার ঘোষণা দিলেন। সকলেই সেখান থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। ধরলেন নিু ভূমি কুদা'র পথ। পথটি মক্কায় প্রবেশ করার পথের বিপরীত দিকে। প্রবেশ করার পথটি ছিলো উচ্চ পথ। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব এরকমই ছিলো। কোথাও গমন ও নির্গমনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে বিদ্বানগণ বলেছেন, উচ্চপথ দিয়ে প্রবেশ করার কারণ, বায়তুল্লাহ্ শরীফের মহিমা ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আর নিুপথ দিয়ে বের হয়ে আসার কারণ রায়তুল্লাহ্ থেকে বিচ্ছেদ ও পৃথক হওয়ার কারণে মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা আরও বলেছেন, এটা হজরত ইব্রাহীমের সুন্নত ছিলো।

বিদায়ী তওয়াফের সময় মুলতাযামে কিছু সময় অবস্থান করলেন এবং দোয়া করলেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে মুলতাযামে দণ্ডায়মান হয়ে দোয়া করলো, আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে নিজের অভাব অভিযোগ পেশ করলো অথচ তা পূর্ণ হলো না। হাজারে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। দুই স্থানের দূরত্ব হলো এক বা'। অর্থাৎ এক হাত কাবার দরজায় রেখে অপর হাত হাজারে আসওয়াদে রাখলে যে দূরত্ব হয় তাকেই বলে মুলতাযাম। বিদায়ী তওয়াফের পর মুলতাযামে অবস্থান করা ও দোয়া করা মোস্তাহাব। তারপর রসুলেপাক স. যমযম কূপের কাছে গেলেন এবং নিজ হাতে এক বালতি পানি ওঠালেন। কিছু পানি পান করলেন। অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। বিদায়কালে বিপরীত দিকে দুঃখের সাথে ক্রন্দনরত অবস্থায় চললেন। কাবা গৃহ থেকে বিদায় কালে এভাবে বিদায় হওয়াই সুন্নত। ফজরের নামাজ কাবার সম্মুখে সম্পন্ন করলেন। নামাজে সুরা ওয়াত্তুর পাঠ করলেন। নামাজের পর সেখান থেকে যাত্রা শুরু করলেন। রওহা নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন রাতের বেলা সেখানে একদল আরোহীকে দেখতে পেলেন। তিনি স. তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রসুল। এক রমণী এগিয়ে এলো তার শিশু সন্তানকে নিয়ে। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এ শিশুটির হজ্ব কি বৈধ হবে? রসুলেপাক স. বললেন, হ্যাঁ। এর হজ্ব হবে এবং তুমিও সওয়াবের ভাগী হবে। যুলহুলায়ফায় পৌঁছলেন রাতে। সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন। ভোরে মদীনার দিকে চললেন। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি স. চাশতের সময় মদীনায় প্রবেশ করতেন। সফর থেকে রাতে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। গৃহে পৌঁছার পূর্বে সেখানে কিছু পাঠিয়ে দেওয়াকে পছন্দ করতেন। যাতে করে বাড়ির লোকেরা আগমনকারীর জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

যখন মদীনা শহর অবলোকন করলেন, তখন ভাবলেন মহামহিম আল্লাহ্তায়ালার উচ্চতা ও মহামর্যাদার কথা। দেখলেন, তাঁর অপার পরাক্রম প্রতাপের মহাপবিত্র মদীনার জ্যোতিচ্ছটা এবং রহস্যরাজিও প্রতিভাসিত হলো তাঁর দৃষ্টিপথে। তিনি স. অভিভূত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করলেন আল্লাহু আকবর। তারপর শহরে প্রবেশকালে স্বভাবসুলভ বিনয়নম্রতার সঙ্গে আল্লাহ্র সাহায্য, দ্বীনের পূর্ণতা, পরিপূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্তি ও নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে প্রার্থনা করলেন একথা বলে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর আয়িবূনা তায়িবূনা আ'বিদূনা সাজ্বিদূনা রব্বানা হামিদূনা সদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আ'বদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু ওয়াআ'য্যাহু ফালা শাইইন বা'দাহু'। তারপর মদীনা শরীফে প্রবেশ করলেন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

গাদীরে খুম

জুহ্ফার পাশে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে গাদীরে খুম। রসুলেপাক স. বিদায়হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকালে গাদীরে খুমে পৌঁছলেন। সাহাবা কেরামের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি একথা জানো না যে, আমি মুমিনদের নিকট তাদের আপন নফসের চেয়েও নিকটবর্তী এবং প্রিয়। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. কথাটি তিনবার বললেন। কথাটির অর্থ এরকম— আমি মুমিনদেরকে কেবল ওই সকল বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে থাকি, যার মধ্যে রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তি। আর দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ। কিন্তু মানুষের নফস? সে তো অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলাকে আহ্বান জানায়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বাণীবাহক! নিঃসন্দেহে আপনি বিশ্বাসীগণের সত্তার চেয়েও নিকটতম এবং প্রিয়তম। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, আমাকে যেনো ওই জগতের দিকে ডাকা হচ্ছে। আর আমি সে ডাক কবুলও করে নিয়েছি। তোমরা সাবধান হয়ে যাও। আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা একে অপরের চেয়ে সম্মানিত। কোরআনে করীম এবং আমার আহলে বাইত। তোমরা লক্ষ্য রাখবে। আমার পর এ দু'টি জিনিসের প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করবে। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, এই দু'টির প্রতি তোমাদের আচরণ কীরূপ? কীভাবে এদের হকসমূহ তোমরা আদায় করছো। এ দু'টি জিনিস আমার পর কখনও একটি অপরটি থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তোমরা হাউসে কাউছারের পাশে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তিনি স. আরও বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আমার মাওলা (বন্ধু), আর আমি মুসলমানদের মাওলা (বন্ধু)। তারপর হজরত আলীর হাত ধরে বললেন, হে

আল্লাহ্! আমি যাদের মাওলা (বন্ধু) আলীও তাদের মাওলা (বন্ধু)। হে আল্লাহ্! আলীকে যারা ভালোবাসবে, তুমিও তাদেরকে ভালোবেসো। আলীর সঙ্গে যারা শত্রুতা করবে, তুমিও তাদের সঙ্গে শত্রুতা কোরো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তুমি তাকে সাহায্য কোরো, যে আলীকে সাহায্য করবে। আর তুমি তাকে অপদস্থ কোরো, যে আলীকে অপদস্থ করবে। সত্যকে কোরো আলীর অপরিহার্য সহচর। বর্ণিত আছে, ওই ঘটনার পর হজরত ওমর ফারুক, হজরত আলীর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবু তালেবের পুত্র! তোমাকে অভিনন্দন। সকাল সন্ধ্যা তুমি এমন অবস্থায় অতিবাহিত করছো যে, তুমিই সকল মুমিনের মাওলা (বন্ধু)। হাদিসটি ইমাম আহমদ হজরত বারা ইবনে আযেব এবং হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, হাদিসটি হজরত আলীর সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মান, তাঁর প্রতি মুসলমানদের আন্তরিক মহব্বত রাখার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে বার্তাদান করেছে। যেমন অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যে মুমিন সে আলীকে ভালবাসবে। আর যে তার সাথে শত্রুতা করবে সে হবে মুনাফেক। তবে এই হাদিস হজরত আলীর খেলাফত ও ইমামতের প্রমাণ— একথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত মেনে নেননি। কিন্তু শীয়া সম্প্রদায় হজরত আলীর ইমামতের প্রমাণ হিসেবে এই হাদিসকেই দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছে। রসুলেপাক স. এখানে মাওলা শব্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'মাওলা' শব্দ ইমামত এর অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হবে সাহায্যকারী ও প্রিয়তম। এরকম অর্থ যদি না হতো, তবে রসুলেপাক স. সকল সাহাবীকে একত্রিত করে তাঁদেরকে সম্বোধন করে হজরত আলীকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এভাবে জোর প্রদান করতেন না। তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করার প্রয়োজনও ছিলো না। কেননা সকল সাহাবীই খুব ভালো করে তাঁকে জানেন এবং চিনেন যে, তিনি একজন অন্যতম সাহাবী। হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। বর্ণনাকারীদের একটি দল এর বিবৃতিপ্রদাতা। যেমন তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইমাম আহমদ। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাও অনেক। বহুসংখ্যক সাহাবী হাদিসটির বর্ণনাকারী। পরবর্তীকালে হজরত আলীর খেলাফতের বিষয়ে যখন ঝগড়া ফাসাদের সৃষ্টি হয়, তখন তাঁরাই তাঁর অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাঁরা এই হাদিসের সূত্রপরম্পরার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কথা তুলেছেন, তাদের কথার কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি। আর ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি তাদের কথার প্রতিও যারা বলেছে, এই হাদিসের 'আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু' (হে আল্লাহ্! যারা তাকে বন্ধু বানায়, তুমিও তাকে বন্ধু বানাও) এ অংশটি মওযু (জাল)। হাদিসখানি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে ইমাম যাহাবী ছাড়া অন্যান্য অনেকেই সহীহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার আছকালানী তাঁর 'আস্সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ'

নামক পুস্তকে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমরা শীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি এলহামের ভিত্তিতে বলে থাকি যে, তারাও তো ইমামতের বিষয়ে দলিলটি মুতাওয়াতির (সর্বজনবিদিত) হতে হবে বলে মত পোষণ করেছে। বলেছে, যে হাদিস মুতাওয়াতির নয়, তার দ্বারা ইমামতের বিশুদ্ধতার দলিল গ্রহণ করা যাবে না। আর একথা সন্দেহাতীত যে, হাদিসটি মুতাওয়াতির নয়। তা সত্ত্বেও এই হাদিসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ওই সকল মতানৈক্যে কোনো কোনো হাদিসের ইমামের পক্ষ থেকে তাআন (দোষারোপ) করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, বর্ণনাকারী হাদিসটি সর্বজনগ্রাহ্য হাফেযে হাদিসগণ থেকে বর্ণনা করেননি, যারা হাদিস অন্বেষণে বিভিন্ন শহরে সফর করে কঠিন কষ্ট ভোগ করে গিয়েছেন। যেমন বোখারী, মুসলিম , ওয়াকেদী প্রমুখ। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ থেকে হাদিস বর্ণনা করাটা হাদিসের বিশুদ্ধতার পথে যদিও বাধা নয়, কিন্তু তাকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস বলে দাবী করা চরম বিস্ময়কর ব্যাপার। শীয়া সম্প্রদায় ইমামতবিষয়ক হাদিসের ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে তাদের কথা দ্বারাই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'আস্সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ্' পুস্তকে এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলাম। শায়েখ ইবনে হাজার আছকালানী বলেছেন, আমরা একথা মেনে নিতে পারি না যে, 'মাওলা' অর্থ শাসক। বরং শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী। মাওলা শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। যেমন— আযাদকৃত, আযাদকারী, আদেশদাতা, বন্ধু ইত্যাদি। দলিল ছাড়া কোনো অর্থ নির্ধারণ করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। শীয়া সম্প্রদায় এবং আমরা 'মাওলা' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী ও বন্ধু বলেই মনে করি। নিঃসন্দেহে হজরত আলী মুর্তজা আমাদের নেতা, আমাদের সাহায্যকারী এবং আমাদের বন্ধু। হাদিসের পূর্বাপর বাক-ভঙ্গি দ্বারা এই অর্থটিই প্রতিভাত হয়। 'মাওলা' অর্থ ইমাম একথা অভিধান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শরীয়তেও না। অভিধানের কোনো ইমামই এরকম উল্লেখ করেননি।

'ফাআ'লীয়ুন মাওলাহু' (আলী তার মাওলা) হাদিসের 'মাওলা' শব্দ দ্বারা হজরত আলীর প্রতি হিংসা ও দুশমনী পোষণ করা থেকে বিরত থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এরূপ অর্থের মধ্যে রয়েছে হজরত আলীর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. হজরত আলীর জন্য বিশেষ দোয়াও করেছেন। কোনো কোনো সনদে 'আহলে বাইত' বলা হয়েছে সাধারণভাবে এবং হজরত আলীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে খাস করে। যেমন তাবারানী প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর ওই বর্ণনাসমূহ হজরত আলীকে ভালোবাসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। এই হাদিসটি ওয়ারেদ হওয়ার

কারণ হচ্ছে, হজরত আলী মুর্তযা যখন ইয়ামনে ছিলেন, তখন কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর প্রতি কারও কারও অভিযোগ ও আপত্তি সৃষ্টি হয়েছিলো। এরূপ আপত্তি সৃষ্টি হয়েছিলো হজরত বুরায়দা আসলামীর পক্ষ থেকে। আর এই আপত্তি সৃষ্টি হয়েছিলো ইয়ামনের দিকে হজরত আলীর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের বিষয় নিয়ে, বিদায়হজ্বের পূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে। বোখারী শরীফেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বোখারী হাদিসটিকে সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন। এই ঘটনার পর রসুলেপাক স. এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তখনই তিনি বলেছিলেন, আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের জানের চেয়েও প্রিয় নই? তখন তিনি সাহাবীগণকে একত্রিত করে এ বিষয়ে তাকীদ করেছিলেন। হজরত বুরায়দা বলেছেন, ওই ঘটনার পর হজরত আলী আমার নিকট সকল লোকের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আমরা একথা মানি যে, 'মাওলা' অর্থ 'আওলা' হতে পারে। কিন্তু আওলা বিলইমামত (ইমামতের জন্য উত্তম) এই অর্থটি কোত্থেকে পাওয়া গেলো? বরং 'মাওলা' অর্থ নৈকট্য ও অনুসরণ। যেমন কোরআন মজীদে এসেছে 'ইন্না আওলান্নাসি বিইব্‌রাহীমা লিল্লাজীনাত্ তাবাউ'হু'। 'মাওলা' শব্দের অর্থ যে নৈকট্য ও অনুসরণ— এই আয়াত তার অকাট্য ও প্রকাশ্য দলিল, যদিও আমরা 'আওলা বিল ইমামত' (ইমামতের জন্য উত্তম) এই অর্থ মেনে নেই, তবে ফিলহাল ইমামরা তাৎক্ষণিক ইমাম হওয়ার উপর দলিল নয়। বরং তার অর্থ হবে শেষে যখন তিনি ইমাম হবেন তখন আমাদের তাঁর কাছে বায়ত গ্রহণ করতে হবে। ইমামতের ক্ষেত্রে প্রথম তিনজন ইমাম যে অগ্রগণ্য তার উপর ইজমা (ঐকমত্য) সাব্যস্ত হয়েছে। হজরত আলীও উক্ত এজমার অন্তর্ভূত। তাছাড়া আরও বিভিন্ন অনুষঙ্গ আছে, যদ্দারা সাব্যস্ত হয় যে, রসুলেপাক স. এর পর হজরত আবু বকর সিদ্দীকই খলিফা হবেন। হজরত আলী যে খলিফা হবেন তা কীভাবে প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনের সময় হজরত আলী এবং হজরত আব্বাস ছাড়া অন্য কেউই তো হজরত আলীর খেলাফতের সপক্ষে দলিল পেশ করেননি। অবশ্য মজলিশে শূরায় হজরত আলীর অংশগ্রহণ না করাকে তাঁর খেলাফতের সপক্ষে দলিল গ্রহণ করা হয়। অথচ একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রয়োজনের সময় হজরত আলী'র মৌনতা অবলম্বন করা প্রমাণ করে যে, তাঁর সপক্ষে কোনো দলিল নেই। অথচ তিনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, রসুলেপাক স. এর পর তাঁর খেলাফত লাভের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই এবং অন্য কারও সপক্ষেও সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই। সহীহ্ হাদিসসমূহে এসেছে, লোকেরা হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তার

মোকাবিলা করে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে আপনি যে এজতেহাদ করছেন, তার সপক্ষে রসুলেপাক স. এর কোনো সুস্পষ্ট বাণী কি আপনার কাছে দলিল হিসেবে আছে? তিনি উত্তর দিলেন না, এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দলিল নেই। কিন্তু যেহেতু ইতোপূর্বে (তিন খলিফার আমলে) দ্বীন ও মিল্লাতের রীতিনীতি ও দ্বীনের বিধিবিধান বাস্তবায়নে দৃঢ়তা ছিলো, সেজন্য আমি তাতে বাধা সৃষ্টি করিনি এবং আমি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি, দ্বীন ও মিল্লাতের কাজ কারবার ও রীতিনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, তাই মানুষের কল্যাণার্থে এবং দ্বীনের দৃঢ়তার জন্য আমি এ সব করেছি। কেননা এ সময় সবর করে গাফেল হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। সহীহ বোখারী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী মুর্তযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর অন্তিমযাত্রাকালে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। হজরত আব্বাস হজরত আলীকে বললেন, চলো, আমরা রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে গিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব চাই। যদি আমরা খেলাফতের অধিকারী হই, তবে তিনি আমাদেরকে একথা বলে দিবেন। হজরত আলী বললেন, আমি চাইবো না। আমার তো ভয় হচ্ছে, আমি যদি চাই আর তিনি যদি সম্মতি না দেন। আল হাদিস। গাদীরে খুমের হাদিস হজরত আলীর ইমামত ও খেলাফতের জন্য যদি সুস্পষ্ট দলিলই হতো, তাহলে রসুলেপাক স. এর কাছে যেয়ে সে বিষয়ে প্রার্থনা করার প্রয়োজন কী ছিলো? আর হজরত আব্বাস একথাই বা কেনো বলবেন, যদি আমরা খেলাফতের অধিকারী হই, তবে তিনি আমাদেরকে একথা বলে দিবেন। অথচ এই ঘটনাটি ঘটেছিলো গাদীরে খুমের ঘটনার প্রায় দুই মাস পর। যদি ধরে নেওয়া হয়, সাহাবা কেরাম গাদীরে খুমের ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন, অথবা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা তা গোপন করেছিলেন, তা হলে বলবো, এমনটি হতে পারে না। জ্ঞান এটাকে বৈধ বলে মনে করে না। রসুলেপাক স. গাদীর খুমের দিন তাঁর ভাষণে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ব্যাপারে প্রশংসা করে বলেছেন, দ্বীন প্রতিপালনের বিষয়ে আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। একথা সুসাব্যস্ত যে, রসুলেপাক স. তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁদেরকে অনুসরণ করার বিষয়ে লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। মহব্বত ও খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিয়া সম্প্রদায় বলে সাহাবীগণ হজরত আলীর সমর্থনের বিষয়ের হাদিসগুলো জানতেন। কিন্তু তাঁরা এই সকল হাদিসের অনুসরণ না করে আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে যুলুম, অবাধ্যতা এবং অহংকার প্রকাশ করেছেন। হজরত আলীর অনুসরণ করেননি। আমীরুল মুমিনীন দলিল চাননি আত্মরক্ষার্থে— শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, শিয়াদের এই

কথাটি ডাহা মিথ্যা এবং অপবাদমূলক। কেননা হজরত আলীর পূর্ণ শক্তি ছিলো। সীমাহীন লোকবল ছিলো। আর তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। এহেন বাস্তবতা সত্ত্বেও তিনি রসুলেপাক স. এর সুস্পষ্ট হাদিস শোনার পর তিনি তা দলিল হিসেবে গ্রহণ করে আমল না করাটা অসম্ভব ব্যাপার। যখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক হাদিস বললেন, 'আল আয়িম্মাত মিন কুরাইশ' (ইমামগণ হবে কুরাইশ বংশ থেকে) তখন যদি হজরত আলী তাঁর বিশেষত্ব সম্পর্কিত হাদিসটি বর্ণনা করতেন, তবে তো হজরত আবূ বকর সিদ্দীকের দলিল খণ্ডিত হতো। ইমাম বায়হাকী ইমাম আজম আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাফেযীদের মৌলিক আকীদা হচ্ছে, মানুষকে পথভ্রষ্ঠতার কথা বলা। রাফেযী সম্প্রদায় সাহাবা কেরামকে কাফের বলার পক্ষপাতী। তারা বলে, হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সকল সাহাবীই কাফের হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। কাযী আবু বকর বাকেল্লানী বলেছেন, রাফেযীরা যে মাযহাব গ্রহণ করেছে, তার দ্বারা ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা নস বা শরীয়তের অকাট্য দলিলসমূহের বিষয়ে যখন সাহাবীগণের স্বভাব চরিত্র ছিলো গোপন করা আর ইসলামের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় যুলুম, অপবাদ, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নফসানী চাহিদা, তখন এমন চরিত্রের অধিকারী সাহাবীগণের মাধ্যমে যে হাদিসসমূহ ও সংবাদ বর্ণিত হয়েছে, তা সবই তো অগ্রহণীয় ও মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমনকি এই ক্রুটি রসুলুল্লাহ্ স. পর্যন্তও পৌঁছে যায়। নাউযুবিল্লাহ্। সাহাবীগণের চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয়। প্রশ্ন দাঁড়ায়— রসুলেপাক স. এর সোহবত থেকে এরকম লোক বেরিয়েছে? আর স্বয়ং হজরত আলীও তাঁর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরকম ক্রুটি করেছেন। কাপুরুষতার পথ ধরেছেন এবং এ ধরনের লোকদের সহযোগিতা করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্। আল্লাহ্তায়ালা এ ধরনের অপবিত্র আকীদার লোক (আল্লাহ্র লানতপ্রাপ্ত) রাফেযীদের মকর থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করুন। এ কথাগুলো শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানীর 'আসসাওয়াইকুল মুহরেকা' পুস্তক থেকে সংকলিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এতোটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

যুলকেলার দিকে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালীর অভিযান

এ বৎসর রসুলেপাক স. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালীকে পাঠালেন যুলকেলা ইবনে কওর ইবনে হাবীব ইবনে মালেক ইবনে হাসসান ইবনে তুব্বাকে শায়েস্তা করার জন্য। সে ছিলো তায়েফের বাদশাহ। বহু লোক তাকে খোদা হিসেবে পূজা

করতো এবং তার অনুসরণ করতো। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী তখনও অভিযানের যাত্রা করেননি। রসুলেপাক স. দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। যুলকেলা হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' থেকে জানা যায়, যুলকেলা হজরত জারীরের হাতে মুসলমান হয়েছিলো। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার বলেছেন, রসুলেপাক স. হজরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালীকে যুলকেলা এবং যুলআমর এই দু'জনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যান। হজরত জারীর সেখানেই থেকে যান। কিন্তু 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এসেছে, সে হজরত ওমর ফারুকের যমানা পর্যন্ত কুফুরীর উপর ছিলো। তাঁর খেলাফত কালে সে মদীনায় এসেছিলো। তখন তার সঙ্গে ছিলো আঠারো হাজার গোলাম। সে তার সকল গোলামকে সঙ্গে নিয়ে এক সাথে মুসলমান হয়ে গেলো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সে চার হাজার গোলামকে আযাদ করে দিলো। হজরত ওমর ফারুক তাকে বললেন, হে যুলকেলা! তোমার বাকী গোলামগুলো আমার কাছে বিক্রি করে দাও। দুই দাং (মুদ্রার পরিমাণ) মূল্য এখনই নগদ আদায় করে দিবো। দুই দাং মূল্য পরিশোধ করার জন্য ইয়ামনের শাসনকর্তার কাছে লিখে দিচ্ছি। আর দুই দাং পরিশোধ করার জন্য শামদেশের শাসনকর্তার কাছে লিখে দিচ্ছি। যুলকেলা বললো, আজ আমাকে একটু ভাবতে দিন। একথা বলে সে তার অবস্থানস্থলে গেলো। তারপর অবশিষ্ট সকল গোলামকেই আযাদ করে দিলো। পরের দিন সে আমীরুল মুমিনীনের মজলিসে উপস্থিত হলো। হজরত ওমর ফারুক বললেন, গোলামদের ব্যাপারে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিলে? সে বললো, আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য যা উত্তম সাব্যস্ত করেছেন, আমি তাই বাস্তবায়ন করলাম। হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? সে বললো, আমি তাদের সকলকেই আল্লাহ্র পথে আযাদ করে দিয়েছি। হজরত ফারুকে আযম বললেন, ঠিকই করেছো। সে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি বড় গোনাহ্ করেছি এবং আমার মনে হয় আল্লাহ্তায়ালা তা ক্ষমা করবেন না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ গোনাহ্ করেছো? সে বললো, একদিন একদল লোক আমার পূজা করছিলো। তখন আমি লুকিয়ে পড়লাম। পরবর্তীতে একদিন কোনো এক স্থানে তাদেরকে দেখা দিলাম। তারা যখন সেখানে আমাকে দেখলো, তখন প্রায় এক লাখ লোক আমাকে সেজদা করলো। হজরত ফারুকে আযম বললেন, খালেস তওবা করো। আল্লাহ্তায়ালার দিকে ধাবিত হও, অন্তর থেকে পাপচিন্তা দূর করে দাও। আর আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমার আশা পোষণ করো। গোনাহ্ যতো বড়ই হোক, আর যতো বেশীই হোক, তিনি তা ক্ষমা করবেন। জীবনচরিতবিদগণ বলেছেন, যুলকেলা মুসলমান হওয়ার পর তার রাজত্ব ছেড়ে দিলো। এক দেরহাম মূল্যের সামান্য গোশত ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে সফরে বের হলো। 'রওজাতুল

আহবাব' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে যুলকেলাকে তায়েফের বাদশাহদের মধ্য গণ্য করা হয়েছে। তবে জাওহারী তাকে ইয়ামনের বাদশাহ বলেছেন। 'কামুস' গ্রন্থে তার পরিচয় মিলে এভাবে— যুলকেলা ছিলো দুইজন। একজন হচ্ছে, যুলকেলা আকবর যায়েদ ইবনে নোমান। আর অপর জন হচ্ছে যুলকেলা আসগর মুমাস্সা ইবনে নাকুর ইবনে ইয়াগফুর ইবনে যুলকেলা আকবার। এরা দু'জনই ইয়ামন এলাকার লোক ছিলো।

রসুলুল্লাহ্ স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ইনতেকাল

এ বৎসর রসুলুল্লাহ্ স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ইনতেকাল হয়। যেদিন তাঁর মৃত্যু হলো সেদিন সূর্যগ্রহণ লাগলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, তাঁর ইনতেকালের কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে। কেননা তৎকালীন আরবে প্রচলিত ধারণা ছিলো, বড় কোনো ঘটনার কারণেই সূর্যে গ্রহণ লাগে। যেমন মহান কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা এ জাতীয় কোনো বড় ঘটনা। একথা যখন রসুলেপাক স. এর কানে পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্যতম দু'টি নিদর্শন, যা আল্লাহ্তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রমের দলিল। যা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ইবাদতের উপলক্ষ্য। আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের আলো ও আভা ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকার নামাতে পারেন। তেমনি আল্লাহ্তায়ালা মুহূর্তমধ্যে মানুষের ইমান ও এলেমকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তমসাচ্ছন্ন করে দিতে পারেন। মৃত্যু বা জীবনের মধ্যে কারও কোনো দখল নেই। সুতরাং যখন তোমরা চন্দ্র সূর্যকে এরকম রাহুগ্রস্ত দেখতে পাবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো। দান খয়রাত কোরো এবং গোলাম আযাদ করে দিয়ো। বর্ণনাসমূহে এসেছে, রসুলেপাক স. এর সাহেবজাদা হজরত ইব্রাহীম পরলোকগমন করেছিলেন দশই মুহররম বা দশই রবিউল আউয়াল।

মানবরূপে জিব্রাইল আ. এর আগমন

এ বৎসর হজরত জিব্রাইল সুদর্শন পুরুষের বেশে, কৃষ্ণকেশধারী, স্বেতশুভ্র পোশাক পরিহিত অবস্থায় রসুলেপাক স. এর মজলিশ শরীফে আগমন করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি এসেই রসুলেপাক স. এর সামনে দু'জানু হয়ে বসে গেলেন। তারপর তাঁর হাত দু'খানা বের করে রসুলেপাক স. এর জানু মোবারকের উপর অথবা নিজের দুই জানুর উপর রাখলেন। হাদিস শরীফের বর্ণনা দু'রকম অর্থই হতে পারে। অতঃপর তিনি ইসলাম, ইমান, এহসান, কিয়ামত ও তার আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রসুলেপাক স. সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর তিনি মজলিশ থেকে চলে গেলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা যাও, তাকে তালাশ করো। সাহাবীগণ

বাইরে বেরিয়ে অনেক অন্বেষণ করলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেলো না। রসুলেপাক স. বললেন, তিনি ছিলেন জিব্রাইল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। এই হাদিসকে হাদিসে জিব্রাইল বলা হয়। বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে এই হাদিসের উল্লেখ আছে।

একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী

সাইয়্যেদে আলম স. এর অসুস্থতা ও ইন্তেকাল

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. যখন বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন কতিপয় হতভাগ্য ও মূর্খ নবুওয়াতের দাবী করে বসলো। যেমন মুসায়লামা ইবনে ছুমামা, আসওয়াদ ইবনে কাআব আনসী, তুলায়হা ইবনে খুওয়ায়লেদ আসাদী এবং এক মহিলা, যার নাম সাজাহ্ বিনতে হারেছ।

উপরোল্লিখিত হতভাগ্যদের মধ্যে মুসায়লামা ছিলো অধিকতর কুখ্যাত। তাকে বলা হতো মুসায়লামা কায্যাব। সে নিজেকে বলতো রহমানুল ইয়ামামা। সে বলতো, আমার উপর যিনি ওহী নাযিল করেন, তার নাম রহমান। সে মূর্খ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে নিজকে রহমান বলে দাবী করতো। সে ছিলো নিরেট মূর্খ। কেননা 'রহমান' নামটি কেবল আল্লাহ্তায়ালার জন্য নির্ধারিত। ওই অভিশপ্ত ছিলো বয়োবৃদ্ধ এবং চরম প্রতারক। দশম হিজরীতে সে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মদীনায় এসোছিলো। তার কাওমের লোকেরা যখন রসুলেপাক স. এর মজলিশে হাজির হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো, তখন সে পশ্চাদ্পসারণ করলো। দাবী করলো, মোহাম্মদ যদি তাঁর পরে আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেন, তাহলে আমি মুসলমান হবো এবং তাঁর আনুগত্য করবো। রসুলেপাক স. ওই অভিশপ্তের অবস্থানস্থলে গমন করলেন এবং তার শিয়রের কাছে দণ্ডায়মান হলেন। সে সময় তাঁর পবিত্র হাতে একটি খেজুরের ডাল ছিলো। তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদি আমার কাছে এ খেজুরের ডালটিও চাও, মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র যা ফয়সালা, তাছাড়া আমি তোমাকে এ ডালটিও দিবো না। তিনি স. আরও বললেন, তুমি যদি আমার পরে জীবিত থাকো, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। রসুলেপাক স. এরকম করে বলেছিলেন একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। একবার রসুলেপাক স. স্বপ্নে দেখেন, তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয়ে স্বর্ণের চুড়ি। তিনি স. চিন্তিত হলেন। হুকুম হলো, আপনি ফুঁক দিন। তিনি চুড়ি দু'টিতে ফুঁক দিলেন। চুড়ি দু'টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

রসুলেপাক স. এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন এভাবে— দু'জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। একটি হবে ইয়ামামায়। অপরটি সানআয়। অর্থাৎ একটি এই মুসায়লামা কাযযাব, অপরটি আসওয়াদ আনসী।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই মালউন ইসলামের গণ্ডিতে এসেছিলো। কিন্তু সে তার এলাকায় ফিরে গিয়ে মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। নবুওয়াতের দাবী করে। মদ্যপান ও ব্যাভিচার করাকে হালাল বলে দাবী করে বসে। নামাজ ফরজ হওয়ার বিষয়টিকে সে বাতিল করে দেয়। ফাসাদকারীদের একটি জামাত তার অনুগত হয়। পরে সে রসুলেপাক স. এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে। পত্রের মূল বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— 'আল্লাহ্‌র রসুল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মদের নিকট। অতঃপর আরব ভূখণ্ড অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা সীমা লংঘন করছে। পত্র পাঠ করে রসুলেপাক স. উত্তরে লিখলেন— 'আল্লাহ্‌র রসুলের পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি। অতঃপর জানা উচিত সমস্ত ভূখণ্ড আল্লাহ্‌তায়ালার। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শুভপরিণাম মূলতঃ মুত্তাকীদের জন্য'। এরপর থেকে মুসায়লামা কায্‌যাব কুফুরীর উপরই স্থির থাকে। কোরআনে করীমের মোকাবেলায় সে ছন্দ নির্মাণ করে এবং অপছন্দনীয় কুরুচিপূর্ণ বাক্য প্রস্তুত করতে থাকে, যা জ্ঞানী আলেমদের নিকট হাসি তামাশার বস্তু হয়। এলেমের ক্ষেত্রেও সে নতুন ও অভিনব তৎপরতা দেখাতে থাকে। সে যা কিছুই প্রদর্শন করতে থাকে তা হতে থাকে মোজেযার বিপরীত। সে যা দাবী করতে থাকে বাস্তবে হয় তার বিপরীত। সে কারও জন্য আয়ু বৃদ্ধির দোয়া করলে ওই লোক মৃত্যুবরণ করে সঙ্গে সঙ্গে। কারও জন্য যদি চোখের দৃষ্টিশক্তি লাভের দোয়া করে তাহলে ওই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় অন্ধ। একদিন এরকম ঘটনা ঘটলো— সে শুনতে পেয়েছিলো যে, রসুলেপাক স. কুলি করে সেই কুলির পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলে কূপের পানি বেড়ে যায় এবং সুমিষ্ট হয়ে যায়। একথা শুনে সেও এরকম করলো। কূপের পানি যমীনের উপর উঠে এলো। কিন্তু পানি হয়ে গেলো লবণাক্ত। এক লোক তার শিশুসন্তানকে নিয়ে তার কাছে এলো। সে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। অমনি সে হয়ে গেলো টেকো। এক বাচ্চার মুখে সে তার আঙ্গুল প্রবিষ্ট করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেলো তার জিহ্বা। একদিন সে কোনো এক বাগানে তার কৃষ্ণ মুখটি ধৌত করেছিলো। তার মুখ ধোয়া পানি যতোটুকু স্থানে ছড়িয়ে গেলো, সেখানে আর কোনো তৃণ গজায়নি। আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান এরকমই। কোনো মিথ্যাবাদীর হাতে কোনো সময় মোজেযার অনুকূলে কিছু প্রকাশ পায় না। এক ব্যক্তি একদিন তার কাছে গিয়ে বললো, আমার তো দু'টি ছেলে আছে। তাদের বরকতের জন্য আপনি দোয়া

করুন। সে তখন হাত উঠিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলো। লোকটি ঘরে ফিরে গিয়ে শুনলো তার এক ছেলেকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আর অপর ছেলে কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। ওই অভিশপ্তের এমতো কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার পরও কিছু লোক তার পিছু ছাড়লো না। তার প্রতি রুষ্টও হলো না। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়া অর্জন। দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের কারণেই তারা তার পিছনে এভাবে লেগে থাকতো। রসুলেপাক স. যখন পরপারে যাত্রা করলেন, তখন তার তৎপরতা আরও জোরদার ও চমকদার হলো। এক লাখের চেয়েও বেশী লোক তার আশপাশে জমা হয়ে গেলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালের শেষের দিকে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের হাতে সে নিহত হলো। খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সঙ্গে তখন চব্বিশ হাজার মুসলিম সৈন্য ছিলো। মুসায়লামা কায্যাব তার চল্লিশ হাজার জঙ্গীকে নিয়ে তাঁর মোকাবেলা করলো। দু'পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই হলো। প্রথম দিকে মুসলমানগণ তেমন সুবিধা করতে পারলেন না।। কিন্তু পরে দুশমনরা পরাজিত হলো। পলায়ন করতে লাগলো। মুসলমানদের একটি দল তার পিছে ধাওয়া করলো। হজরত ওয়াহশী যিনি হজরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে শহীদ করেছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং যে বর্শা দিয়ে তিনি হজরত হামযাকে শহীদ করেছিলেন, সেই বর্শাটি মুসায়লামার দিকে নিক্ষেপ করলেন। ওই বর্শার আঘাতেই সে জাহান্নামের অভিযাত্রী হয়ে গেলো। হজরত ওয়াহশী বললেন, 'আনা কাতিলু খইরিন্নাসি ফিল কুফরি ওয়া আনা কাতিলু শার্‌রিন্নাসি ফিল ইসলাম' (কুফুরীর মধ্যে থেকে আমি সর্বোত্তম মানুষকে হত্যা করেছিলাম, আর ইসলামের মধ্যে থেকে সর্বনিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করলাম)।

মিথ্যা নবী আসওয়াদ আনসী

নবুওয়াত দাবীকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো আসওয়াদ আনসী। আনস ইবনে কাদহাজ এর দিকে সে সম্বন্ধিত ছিলো। তার মূল নাম ছিলো আয়লা। তাকে যুলখেমারও বলা হতো। খেমার অর্থ ওড়না। সে মুখের উপর ওড়না ফেলে রাখতো। সেজন্য লোকেরা তাকে যুলখেমার বলে ডাকতো। আবার কেউ কেউ তাকে যুলহেমারও বলতো। তার এমতো নামকরণের কারণ হচ্ছে, সে বলতো, আমার উপর যে ওহী নিয়ে আসে, সে গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসে।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সে একজন গণক ছিলো। সে বিস্ময়কর কথা ও ঘটনা প্রকাশ করতো। সে বাকচাতুরতার মাধ্যমে লোকদেরকে আকৃষ্ট করতো। তার সঙ্গে দুইটি হামযাদ শয়তান ছিলো। গণকদের কাছে সাধারণতঃ এরকম হামযাদ শয়তান থাকে। ওই হামযাদ শয়তানেরা তার কাছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছে দিতো। তার পুরো কাহিনী এরকম— বাজান

পারস্যের সম্রাটের জনৈক অধস্তন পুরুষ। সে পারস্যাধিপতি কেসরার পক্ষ থেকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলো। শেষে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক তার লাভ হয়েছিলো। রসুলেপাক স. বাজানকে সানআর শাসক হিসাবে ইয়ামনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সানআর শাসক বাজানের যখন মৃত্যু হলো, তখন তার রাজত্বকে ভাগ করে তার পুত্র শাহর ইবনে বাজানকে কিছু অংশ দেওয়া হলো। কিছু অংশ দেওয়া হলো হজরত আবু মুসা আশআরীকে। আর কিছু অংশ দেওয়া হলো হজরত মুআয ইবনে জাবালকে। এর পরই আসওয়াদ আনসী বের হলো এবং নবুওয়াতের দাবীদার হলো। সে তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে সানআর অধিবাসীদের উপর বিজয়ী হয়ে গেলো এবং সেখানকার রাজ্যক্ষমতা নিজের দখলে নিয়ে নিলো। শাহর ইবনে বাজানকে হত্যা করা হলো। শাহর ইবনে বাজানের স্ত্রীর নাম ছিলো মুরযেবানা। সে তার দিকে আকৃষ্ট হলো। ফরওয়া ইবনে মিসকীব নামক এক ব্যক্তিকে রসুলেপাক স. সেখানকার আমেল (জাকাত আদায়কারী) নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর নিকট পত্র লিখে সেখানকার ঘটনা ও অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। হজরত মুআয ইবনে জাবাল এবং হজরত আবু মুসা আশআরী, যাঁরা প্রতিবেশী রাজ্যদ্বয়ের শাসক ছিলেন তাঁরা উভয়ে পরস্পরে এক মত হয়ে হাজরা মাওতে চলে গেলেন। এ সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে পৌঁছলো, তখন তিনি স. নির্দেশ দিলেন, যেভাবেই হোক, একত্রিত হয়ে আসওয়াদ আনসীর তৎপরতা রোধ করতে হবে এবং তার মূলোৎপাটন করতে হবে। এ নির্দেশ পেয়ে নবী করীম স. এর অনুগত সকল লোক এক স্থানে সমবেত হলো। শাহর ইবনে বাজানের স্ত্রী মুরযেবানার কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠানো হলো যে, আসওয়াদ আনসী এক জঘন্য লোক। সে তোমার পিতা এবং স্বামীকে হত্যা করেছে। তার সাথে তোমার জীবন কীভাবে যাপিত হবে। মুরযেবানা সংবাদ পাঠালো, আমি জানি, লোকটি আল্লাহ্‌র দুশমন। মুসলিমবাহিনী পুনঃ সংবাদ পাঠালো, তোমার চিন্তা-চেতনা অনুসারে যেভাবেই সম্ভব হয়, ওই অভিশপ্তকে উৎখাত করার ব্যবস্থা করো। এই নির্দেশ পেয়ে মুরযেবানা তার চাচাতো ভাই এবং নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ দায়লামীকে (যিনি দশম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) দায়িত্ব দিলো, ওই ভণ্ড নবীকে হত্যা করো। তাঁর সঙ্গে আরেক ব্যক্তি যোগ দিলেন। তার নাম দাদবিয়া। তাঁরা দেয়াল টপকিয়ে আসওয়াদ আনসীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকবেন— এ রকম সিদ্ধান্ত নিলো। নির্দিষ্ট রজনী সমাগত হলো। মুরযেবানা তাকে অধিক পরিমাণে শরাব পান করালেন। সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলো। সে তার গৃহের চতুষ্পার্শ্বে একহাজার পাহারাদার সব সময় মোতায়েন রাখতো। ফিরোজ দায়লামী তাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাদের অলক্ষ্যে তাদেরই এক দলের সঙ্গে মিশে গেলেন। এভাবে একসময় ঢুকে গেলেন তার শয়নকক্ষে। তলোয়ারের

আঘাতে তার দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে দিলেন। তাকে এভাবে জবেহ করার সময় গরুর ডাকের মতো বিকট শব্দ তার মুখ থেকে বের হতে লাগলো। শব্দ শুনে পাহারাদাররা তার ঘরের দিকে দৌড়ে এলো। কিন্তু মুরযেবানা তাদেরকে একথা বলে থামিয়ে দিলো। বললো চুপ করো। এ মুহূর্তে তোমাদের নবীর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে।

সকাল হলো। মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হলো— 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্। তারপর উচ্চারিত হলো— 'ওয়া আশহাদু আন্না আয়লাহু কায্যাব'। রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমেলগণ এ বিষয়ে তাঁর দরবারে সংবাদ প্রেরণ করলেন। এই সংবাদ মদীনার মাটিতে পৌঁছলো রসুলেপাক স. এর পরলোক যাত্রার পর। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব স. এর নিকট ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ ইনতেকালের একদিন পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন, আজ রাতে আসওয়াদ আনসীর মৃত্যু হলো। এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। তার নাম ফিরোজ। তিনি আরও বলেছিলেন, ফাযা ফিরূজ (ফিরোজ দায়লামী কৃতকার্য হয়েছে)।

কোনো কোনো জীবনচরিতবিশেষজ্ঞ বলেছেন, ওই মালউনকে হত্যা করা হয়েছিলো হজরত সিদ্দীক আকবরের খেলাফত কালে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে আমীর নিযুক্ত করে এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এই বর্ণনা অনুসারেও ফিরোজ দায়লামীকেই আসওয়াদ আনসীর হত্যাকারী হিসেবে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ জীবনচরিতবিশেষজ্ঞ আলেম ও মোহাদ্দেছগণের মতে পূর্বোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

মিথ্যানবী তুলায়হা ইবনে খোয়ায়লেদ আসাদী

তুলায়হা ইবনে খোয়ায়লেদ ছিলো বনু আসাদ গোত্রের লোক। তার আবির্ভাব হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর ইনতেকালের পর। উয়ায়না ইবনে হাসীন ফারাযী, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে, হুনায়ন ও হাওয়াযেনের যুদ্ধ আলোচনায়। সে ফারাযা কবীলার লোক ছিলো। সে মুরতাদ হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তুলায়হার ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তুলায়হা তখন দাবী করতো, তার নিকট জিব্রাইল আগমন করেন এবং ওহী নিয়ে আসেন। প্রথম ভেলকীবাজী যা তার থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো এবং মানুষ যার কারণে গোমরাহ হয়েছিলো, সেটি এরকম— একদিন কতিপয় লোকের সঙ্গে সে সফরে ছিলো। তাদের সঙ্গে কোনো পানির ব্যবস্থা ছিলো না। রাস্তায় তারা তৃষ্ণার্ত হলো। সে লোকদেরকে বললো, তোমরা ঘোড়ায় আরোহণ করে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করলে পানির সন্ধান পাবে। লোকেরা তাই করলো। পানিও পেয়ে গেলো। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বেদুঈন লোকেরা

ফেতনার মধ্যে পতিত হলো। এই ঘটনার পর থেকে সে নবুওয়াতের দাবী করে বসলো। এই সংবাদ শুনে হজরত আবু বকর সিদ্দীক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে ওই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি যাত্রা শুরু করে ত্বয় নামক জনপদে পৌঁছলেন। সেখানকার সালমা এবং আদাহ নামক দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। আশপাশের যে সকল গোত্র ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তারাও এসে তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলো। অবশেষে সকলেই সম্মিলিতভাবে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ফারাযা গোত্র অবশেষে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। উয়ায়না ইবনে হাসীন ভণ্ড নবীর মিথ্যা দাবী সম্পর্কে জানতে পারলো। কিন্তু সেও প্রাণ ভয়ে ফারাযীদের সঙ্গে সেখান থেকে পলায়ন করলো। তুলায়হাও পলায়ন করলো। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে পরে সে সেখান থেকে ফিরে আসে এবং তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তাঁর শাহাদত নসিব হয়।

মিথ্যানবী সাজা বিনতুল হারেছ

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ছিলো আর এক রমণী। তার নাম ছিলো সাজা বিনতুল হারেছ ইবনে মুয়েদ। সে ছিলো বনী ইয়ারবু গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বনু তাগলিব গোত্রে সে নবুওয়াতের দাবী করেছিলো এবং একদল লোক তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সময় ও বাসস্থানের দিক দিয়ে সে মুসায়লামা কায্যাবের নিকটবর্তী ছিলো। একদল লোক তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিলো। মুসায়লামা আশংকা করছিলো, তার আশপাশের লোক যদি কখনও তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে তাহলে হয়তো কোনো এক সময় সাজা পন্থীরা সমস্ত ইয়ামামার কতৃর্ত্ব নিয়ে নিবে। সে কারণে মুসায়লামা কায্যাব সাজার কাছে হাদিয়া তোহাফা দিয়ে লোক পাঠিয়ে বললো, কিছু গোপন কথা আছে, যা সামনাসামনি বলা প্রয়োজন। সাজা তাঁবু প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলো। নির্দেশ মতো তাঁবুও নির্মাণ করা হলো। আতর, সুগন্ধী, ফরাশ ও নানা প্রকারের বাহারী তৈজষপত্রের মাধ্যমে তাঁবু সুসজ্জিত করা হলো। অতঃপর মুসায়লামা সেখানে পৌঁছলো। উভয়েই তাঁবুতে প্রবেশ করলো। কথাবার্তা শুরু হলো। মুসায়লামা তার নবুওয়াতের কর্মসূচীর বিবরণ উপস্থাপন করলো। বললো, আমাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াটা খুবই উপযোগী হবে। সাজা মুসায়লামার সব কথা বিশ্বাস করলো। তার নবুওয়াতের স্বীকৃতিও দিলো। তিনদিন পর্যন্ত তারা উভয়েই একসাথে ছিলো এবং এ তিন দিনের মধ্যে তাদের মধ্যে ব্যাভিচার হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। বিবাহবন্ধন হয়ে যাওয়ার পর সাজা তার নিজ কাওমে ফিরে গেলো। মুসায়লামা চলে গেলো তার লোকালয়ে। সাজার কাওমের লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তোমার

কিস্‌সা কদ্দুর গড়ালো? সে বললো, তার নবুওয়াতের হাকীকত আমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং আমি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, মহর কতো? সে বললো, মহর নির্ধারণের ফুরসতই মিলেনি। লোকেরা বললো, মহর ব্যতীত বিয়ে তো শুদ্ধ হয় না। যাও, মহর নির্ধারণ করে এসো। সাজা মুসায়লামার কাছে গেলো এবং মহর নির্ধারণের দাবী করলো। সে বললো, ঠিক আছে। মহর হিসেবে আমি তোমাকে ইয়ামামার উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক দান করলাম। অধিকন্তু ফজর এবং এশার নামাজ তোমার উম্মতের উপর থেকে আমি মওকুফ করে দিলাম। একথা বলে মুসায়লামা কায্‌যাব শস্যসংগ্রহের জন্য একদল লোককে আমেল নিযুক্ত করলো। আমেলরা শস্যসংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলো, এমতাবস্থায় হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলেন। আমেলদেরকে তাদের কাছ থেকে প্রতিহত করলেন। সাজার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি এরকম— সে হজরত আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে তার সকল উম্মতকে নিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। আর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে— মুসায়লামা যে উপকুলে বসবাস করতো, সেখানেই একস্থানে সে আত্মগোপন করেছিলো এবং সেখানেই সে ধ্বংস হয়েছিলো। পরবর্তীতে কেউ তার নাম নিশানা খুঁজে পায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

উসামা ইবনে যায়েদের অভিযান

রসুলেপাক স. এর প্রেরণকৃত অভিযানসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অভিযান ছিলো উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেছার অভিযান। এই অভিযানটি প্রেরণ করা হয়েছিলো একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৬ তারিখ সোমবার। অভিযানটি প্রেরণ করা হয়েছিলো রোম দেশের সমুদ্র উপকূলে উবনী নামক স্থানের দিকে। হজরত উসামার পিতা হজরত যায়েদ রা. মূতার ময়দানে শাহাদতবরণ করেছিলেন। সে জন্যই তাদেরকে উৎখাতের জন্য হজরত উসামা ইবনে যায়েদকে প্রেরণ করা হয়। ওই অঞ্চলে খবর পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই তিনি যেনো সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই তিনি করলেন। পূর্বাহ্নে গুপ্তচর প্রেরণ করলেন। পথপ্রদর্শক সঙ্গে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করলেন। এ সকল কিছু করতে করতেই ২৮ শে সফর বুধবার এসে পড়লো। সেদিন রসুলেপাক স. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বর ও মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত হলেন। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি স. স্বহস্তে পতাকা প্রস্তুত করিয়ে হজরত উসামার হস্তে অর্পণ করলেন এবং বললেন, 'আগুয বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ফাক্বাতিল মান কাফারা বিল্লাহি' (আল্লাহ্‌র নামে বেরিয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করো। অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে যারা কুফরী করে তাদেরকে হত্যা করো)। হজরত উসামা পতাকা গ্রহণ করলেন। আল্লাহর রাস্তায়

বেরিয়ে পড়লেন। পতাকা তুলে দিলেন হজরত বুরায়দা ইবনে হাসীবের হাতে। কারণ পতাকাবাহী নিযুক্ত করা হয়েছিলো তাকেই। মুসলিম যোদ্ধাগণ সকলেই যাতে এসে শামিল হতে পারেন, তাই জারফ নামক স্থানে তাঁবু খাটানো হলো। জারফ মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। এর অর্থ মাটি খনন করে পানি বের করা। রসুলেপাক স. এর দরবার থেকে ফরমান জারী হলো, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে হজরত আলী ব্যতীত অন্যান্য সকল বড় বড় সাহাবীকেই হজরত উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। যেমন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওছমান যুন্নুরাইন, হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ প্রমুখ সাহাবীগণকেও হজরত উসামা ইবনে যায়েদের সেনাপতিত্ব মেনে নিতে হবে। হজরত আলীকে তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন না। কারও কারও মনে এই মর্মে প্রশ্ন উদিত হলো যে, একজন গোলামকে শ্রেষ্ঠ আনসার ও মুহাজিরদের আমীর নিযুক্ত করা হলো। এ নিয়ে কিছু কানা ঘুষা চললো। এ কথা রসুলেপাক স. এর কানেও পৌঁছে গেলো। তিনি স. রাগান্বিত হলেন। জ্বর ও মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কপালে পট্টি বেঁধে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মিম্বরে আরোহণ করে ভাষণ দিলেন। বললেন, হে লোকসকল! তোমরা উসামাকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করার বিষয়টিকে অপছন্দ করছো কেনো? কেনোই বা তার সমালোচনায় লিপ্ত হচ্ছো? তোমরা মূতার যুদ্ধে তার পিতাকে আমীর হওয়ার বিষয়টিকেও অপছন্দ করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! সে আমীর হওয়ার যোগ্য। তার পিতাও ছিলো আমীর হওয়ার যোগ্য। যায়েদ আমার প্রিয়। তার পুত্রও আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। তাদের উভয়ের সম্পর্কেই আমি উত্তম ধারণা পোষণ করি। এখন তার ব্যাপারে আমার যা ওসিয়ত, তা তোমরা ভালোভাবে গ্রহণ করো। আর তা হচ্ছে, সে তোমাদের মধ্যে আখইয়ারগণের অন্যতম। এতোটুকু বলার পর তিনি মিম্বর শরীফ থেকে নেমে তাঁর পবিত্র প্রকোষ্ঠে চলে গেলেন। হজরত উসামার মর্যাদার কথা ইতোপূর্বে মূতার যুদ্ধের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হজরত ওমর ফারুক তাঁর খেলাফতকালে যখনই হজরত উসামাকে দেখতেন, তখনই তিনি তাঁকে 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর' বলে সম্ভাষণ করতেন। হজরত উসামা প্রতিউত্তরে বলতেন, 'গফারাল্লাহু লাকা আমীরাল মুমিনীন'। আপনি আমাকে আমীর বলছেন? হজরত ওমর ফারুক বলতেন, যতোদিন আমি জীবিত থাকবো, ততোদিনই তোমাকে আমীর বলেই সম্বোধন করবো। তিনি আরও বলতেন, রসুলুল্লাহ স. এই জগত থেকে যখন বিদায় হয়ে চলে গেলেন, তখন তুমি সকলের আমীর ছিলে। অথচ রসুলেপাক স. এর তিরোধানের সময় হজরত উসামার বয়স ছিলো আঠারো অথবা উনিশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ বছর। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই ঘটনা

ঘটেছিলো দশই রবিউল আউয়ালে। ওই দিন যাঁদের প্রতি হজরত উসামার সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ হয়েছিলো তাঁরা দলে দলে এসে রসুল স. এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেনাসমাবেশস্থলে একত্রিত হতে লাগলেন। সেদিন রসুলেপাক স. অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বলছিলেন, উসামা বাহিনী বেরিয়ে পড়ো। এগারো রবিউল আউয়াল তারিখে হজরত উসামা তাঁর বাহিনী নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। দণ্ডায়মান হলেন রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে। অবনত হয়ে রসুলেপাক স. এর পবিত্র মস্তকে ও হাতে চুম্বন করলেন। রসুলেপাক স. তখন রোগযন্ত্রণায় এতোই ভারাক্রান্ত ছিলেন যে, কথা বলারও শক্তি তাঁর ছিলো না। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে হজরত উসামার উপর রাখলেন। হজরত উসামা বলেন, আমার মনে হলো রসুলেপাক স. আমার জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর হজরত উসামা হুজরা শরীফের বাইরে এলেন এবং উপস্থিত হলেন সেনাসমাবেশস্থলে। পরের দিন সকাল বেলা তিনি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. এর রোগযন্ত্রণা তখন কিছুটা কম ছিলো। তিনি হজরত উসামাকে বিদায় দিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র বরকতে জেহাদ করো। হজরত উসামা সেনাসমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়ে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন তাঁর বাহনে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর মাতা উম্মে আয়মান সংবাদ পাঠালেন, রসুলেপাক স. এর বিদায়যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে হজরত উসামা ফিরে এলেন। ফিরে এলেন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর প্রমুখ প্রধান সাহাবী তখন পর্যন্ত মদীনাতেই ছিলেন। হজরত বুরায়দা ইবনে হাসীব পতাকাটি এনে রসুলেপাক স. এর দরজার কাছে প্রোথিত করলেন। রসুলেপাক স. এর দাফনের কাজ শেষ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত সাব্যস্ত হলো। হুকুম দেওয়া হলো, পতাকাটি হজরত উসামার ঘরের দরজায় স্থাপন করতে হবে, যাতে করে রসুলেপাক স. কর্তৃক নিযুক্ত সাহাবীগণের যুদ্ধযাত্রার কাজটি কার্যকর হওয়ার আলামত প্রকাশ পায়। অতঃপর হজরত উসামা বেরিয়ে পড়লেন এবং জারফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, লোকজন সেখানে জমায়েত হতে শুরু করলেন। এমন সময় আরবের বিভিন্ন জনপদের লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছে বলে সংবাদ প্রচার হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললেন, মদীনায় মুরতাদদের তৎপরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখাই হবে উত্তম। আল্লাহ্ না করুন, এমন হতে পারে যে, একটি শক্তিশালী বাহিনী মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে— একথা শোনার পর তারা মদীনা আক্রমণ করে বসতে পারে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক এই অভিমতকে গ্রহণ করলেন না। বললেন, উসামার বাহিনী প্রেরণ করার কারণে আমি মুরতাদদের লোকমায় পরিণত হয়ে যাবো— এব্যাপারে আমি যদি নিশ্চিত হই, তবুও আমি রসুলেপাক স. এর নির্দেশের

বিরুদ্ধাচরণ করাকে বৈধ মনে করবো না। তবে তোমরা উসামার নিকট এই আবেদন করে দেখতে পারো। ওমরকে আমার কাছে রেখে যাওয়ার কথা বলে দেখতে পারো। হজরত উসামা একথা শুনে হজরত ওমরকে হজরত আবু বকরের সঙ্গী হিসেবে থাকার অনুমতি দিলেন।

রবিউসসানী মাস এসে গেলো। হজরত উসামা উবনীর দিকে যাত্রা করলেন। সেখানকার লোকদের উপর বিজয় লাভ করলেন। সেখানকার অনেক লোক নিহত হলো। কিছু গাছপালা, বাড়ি ও বাগিচাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাঁর পিতা হজরত যায়েদের হত্যাকারীকেও হত্যা করলেন। অনেক গনিমত নিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। অভিযান শেষ হতে হতে সময় লাগলো চল্লিশ দিন।

মহাতিরোধান

রসুলেপাক স. যখন হজ্ব সম্পাদন করলেন, তখন লোকদেরকে দ্বীনের আহকাম শিক্ষা দিলেন। তাঁর পরকালযাত্রার সময় সন্নিকটবর্তী— একথাও জানালেন। বললেন, সম্ভবতঃ আগামী বৎসর আমি তোমাদের সাথে থাকবো না। এ কারণেই এই হজ্বকে বিদায় হজ্ব বলা হয়। ওই সময় অবতীর্ণ হলো এই আয়াত 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্‌মাম্‌তুআ'লাইকুম নি'মাতি' (আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম)(৫ঃ৩) সে দিকেই ইশারা করেন। তাছাড়া বিদায় হজ্বের সময় মিনাতে অবতীর্ণ হলো সুরা ইজাজ্বাআ নাসরুল্লাহ্। রসুলেপাক স. হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, আপনি যেনো আমাকে এই মর্মে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমাকে এ জগত থেকে চলে যেতে হবে। হজরত জিব্‌রাইল বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। 'ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল্‌লাকা মিনাল উলা' (তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা উত্তম (৯৩ঃ৪)। এর পর থেকে রসুলেপাক স. আখেরাতের কাজে অধিকতর মনোনিবদ্ধ করলেন। 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাও্‌ওয়াবা' (তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী)(১১১ঃ৩)। রসুলেপাক স. এই নির্দেশানুসারে এই জিকির বেশী বেশী করে করতে লাগলেন— 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী ইন্নাকা আংতাত্ তাও্‌ওয়াবুর রহীম'। সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনার পবিত্র উচ্চারণে এই কালেমার স্থান প্রশস্ততর হচ্ছে যে। তিনি স. বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে যাও। আমাকে আলমে বাকার (চিরস্থায়ী জগতের) দিকে ডাক দেওয়া হয়েছে। তাসবীহ, তাহমীদ ও এস্তেগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কণ্ঠ ছিলো কান্নাজড়িত।

সাহাবা কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি মৃত্যুর কারণে ক্রন্দন করছেন! আল্লাহ্‌ তো আপনার পূর্বাপর সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি স. বললেন, 'ফাআয়না আও্ওয়ালুল মাত্‌লিআ ওয়া আয়না দ্বীকুল কাবরি ওয়া জুলমাতুল লাহদি ওয়া আয়নাল কিয়ামাতি ওয়াল আহওয়ালু' (প্রথমে কবর থেকে উত্থান, কবরের সংকীর্ণতা, কবরের অন্ধকার, কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা)? নিশ্চয়ই তাঁর এরকম বলার উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতকে সাবধান করা। নতুবা তিনি স. তো এ সকল কিছুর উর্ধ্বে।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন, রসুলেপাক স. তাঁর ওফাতের এক মাস পূর্বে আমাকে তাঁর ওফাতের খবর শোনালেন। কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীকে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার গৃহে ডেকে আনলেন। যথাসময়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি কান্না শুরু করলেন। সাহাবীগণের প্রতি সীমাহীন ¯েœহ ও ভালোবাসাই ছিলো তাঁর এমতো কান্নার কারণ। তাঁকে না পেয়ে তাঁর সাহাবীগণ দুঃখ পাবেন— এমতো চিন্তাতেই তিনি তখন রোদন করলেন। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন— 'মারহাবাম বিকুম ওয়া হায়্যাকুমুল্লাহু বিস্‌সালামি হাফাজাকুমুল্লাহু সব্বারা কুমুল্লাহু নাসরা কুমুল্লাহু ওয়া রাফাআ'কুমুল্লাহু হাদাকুম ওয়াফ্‌ফাক্বাকুমুল্লাহু আওয়াকুমুল্লাহু ওয়াক্বাকুমুল্লাহু মাম্মাকুমুল্লাহু' (তোমাদেরকে অভিনন্দন! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জীবন শান্তিময় করুন। তোমাদেরকে হেফাজত করুন, তোমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, তোমাদেরকে সাহায্য করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তোমাদেরকে হেদায়েত ও তৌফিক দিন। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে আশ্রয় দান করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে রক্ষা করুন)। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললেও তাঁর এমতো দোয়ার লক্ষ্য ছিলো সকল উম্মত। শরীয়তের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি ধর্তব্য। তিনি স. আরও বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ভীতির প্রতি ওসিয়ত করছি এবং তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সমর্পণ করছি। আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিনিধি বানাচ্ছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র গজব থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। কেননা আমি 'নাবীয়ে মুবীন' (প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী নবী)। যে তাকাব্বরী আল্লাহ্‌তায়ালার শান, তোমরা আল্লাহ্‌র কোনো বান্দার ক্ষেত্রে তা প্রদর্শন কোরো না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'তিলক্বাদ দারুল আখিরাতু নাজ্বআলুহা লিল্লাজীনা লা ইউরিদ্বুনা উলুও্ওয়ান ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফাসাদাওঁ ওয়াল আ'ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন' (ইহা আখেরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য)(২৮ঃ৮৩)।

দারেমী বর্ণনা করেছেন, 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লাহ্' সুরা নাযিল হলো। রসুলেপাক স. সুরাখানি তাঁর আত্মজা হজরত ফাতেমার সম্মুখে পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমাকে প্রস্থানের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সাইয়্যেদা ফাতেমা রা. কেঁদে ফেললেন। তিনি স. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না। আহলে বাইতের মধ্য থেকে তুমি সকলের আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। হজরত ফাতেমা হেসে ফেললেন। বিশুদ্ধ কথা এই যে, ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর শেষ অসুস্থতার কালে। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, প্রতি বৎসর একবার তিনি হজরত জিব্রাইলের সঙ্গে কুরআনে করীমের দওর করতেন। কিন্তু শেষ বৎসর দওর করলেন দু'বার। এটিও ছিলো তাঁর মহাপ্রস্থানের আরেকটি আলামত। কোনো কোনো বিবরণে হজরত ফাতেমার ক্রন্দন করার বিষয়টি এই ঘটনার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। রসুলেপাক স. প্রতি রমজানের শেষ দিকে ইতেকাফ করতেন। কিন্তু শেষ বৎসর তিনি স. ইতেকাফ শুরু করলেন রমজানের দশ তারিখ থেকে। তাছাড়া তিনি স. উহুদের প্রান্তরে শাহাদতবরণকারীদের জন্য তাঁদের শহীদ হওয়ার আট বৎসর পর জানাযার নামাজ পড়লেন। এরকম করলেন তাঁর চিরবিদায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই। তারপর মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রপথিক, তোমাদের সাক্ষী এবং তোমাদের শাহাদতের আমানতদার। আমি তোমাদেরকে আমার হাওযে কাওছারের কাছে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমি কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবো। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের ভাণ্ডারের চাবি দান করা হয়েছে। একথা ছিলো বিভিন্ন রাজ্য বিজয় এবং তার ভাণ্ডারসমূহ মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার বিষয়ে সুসংবাদ। তিনি স. আরো বললেন, আমি এই আশংকা করি না যে, আমার পর তোমরা শিরিকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আশংকা করি, দুনিয়া তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তোমরা হয়ে যাবে পৃথিবীপ্রসক্ত। ফেতনাগ্রস্ত। অবশেষে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীগণ।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটিকে পছন্দ করার এবং গ্রহণ করার স্বেচ্ছাধিকার দিলেন— দুনিয়ার চাকচিক্য, আরাম আয়েশ অথবা আখেরাতের পুরস্কার ও কল্যাণ। সেই বান্দা শেষটিকেই গ্রহণ করলো। দুনিয়ার প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করলো না। এ কথা শুনেই হজরত আবু বকর সিদ্দীক ক্রন্দন শুরু করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। লোকেরা বলতে লাগলো, দেখো দেখো, এই বৃদ্ধকে দেখো। রসুলুল্লাহ্ কোনো এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করছেন। আর একথা শুনে ইনি কেঁদেই আকুল। বলা বাহুল্য, রসুলেপাক স. তাঁর নিজের অবস্থাই বর্ণনা করেছিলেন। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীকও

সঠিকভাবে বুঝেছিলেন। তারপর রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, সকল মানুষের মধ্যে আমার প্রতি অধিক সহায়তাদানকারী, অধিক পুণ্যবান, নিজের সম্পদ, সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব প্রদানকারী হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আমার খলীল বানাতাম, তাহলে তা বানাতাম আবু বকর সিদ্দীককেই। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোনো খলীল নেই। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান আছে। উল্লেখ্য, অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খলীল বলা হয়। তিনি স. আরও বললেন, মসজিদের কোনো বাতায়ন খোলা থাকবে না, আবু বকরের বাতায়ন ব্যতীত।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, উপর্যুক্ত বাণী দ্বারা রসুলেপাক স. বিশেষ করে হজরত আবু বকরের খেলাফতের দিকে ইশারা করেছেন। আর তিনি স. এই মহান বাণী প্রদান করেছিলেন তাঁর মহাতিরোধানের পাঁচদিন পূর্বে। সাহাবা কেরাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার মহাপ্রস্থান কখন ঘটবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তনের, জান্নাতুল মাওয়া ও সিদ্রাতুল মুনতাহায় উপনীত হওয়ার, রফীকে আলার (পরম বন্ধুর) সঙ্গে মিলিত হওয়ার, পবিত্র পেয়ালা পান করার এবং চিরস্থায়ী জীবন লাভ করার সময় খুবই নিকটবর্তী।

সফর মাসের শেষ সপ্তাহ

সফর মাসের শেষ সপ্তাহে রসুলেপাক স.কে নির্দেশ দেওয়া হলো, জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানের বাসিন্দাদের জন্য তিনি যেনো এস্তেগফার করেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, এক রাত্রে রসুলুল্লাহ্ স. আমার ঘরে এলেন। আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে জেগে তাঁকে শয্যায় পেলাম না। আমি তাঁর অন্বেষণে বের হলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, তিনি বাকীতে প্রবেশ করছেন। আমিও তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম তিনি বলছেন— 'আস্সালামু আ'লাইকুম দারা কাওমিম্ম মু'মিনীনা ওয়া আতাকুম মাতূআ'দূনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন'। এক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলছেন— 'আংতুম লানা ফাতিরুন ওয়া ইন্না বিকুম লাহিকূন আল্লাহুম্মা লা তুহ্রিন্না আজ্রাহুম ওয়ালা তাফ্তিন্না বা'দাহুম আল্লাহুম্মাগফির লি আহলি বাকীই'ল গরক্বাদি'। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার অপর এক বিবরণ এরকম— রসুলুল্লাহ্ স. আমার ঘর থেকে বের হলেন। আমিও পিছু নিলাম। প্রথমে মনে করলাম তিনি স. হয়তো তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন। তিনি আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করলেন। দেখলাম, তিনি বাকীতে পৌঁছলেন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এর মধ্যে দু'তিনবার হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন। তাঁর আগমনের পূর্বেই আমি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম। তিনি ঘরে ফিরে

এলেন। আমার নিঃশ্বাস ভারী, শরীর দুলে দুলে উঠছে। জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এরকম করছো কেনো? তোমার শরীর কাঁপছে কেনো? আমি সব কথা খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, আমি সেখানে ছায়ার মতো কিছু দেখেছিলাম। সম্ভবতঃ তা ছিলো তোমারই ছায়া। আমি বললাম, হাঁ। হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি তাঁর হাতখানা আলতোভাবে আমার বুকে রাখলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কী ভেবেছিলে? আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুল কি তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌র কাছে কোনো কিছুই তো গোপন নয়। আমাকে অক্ষম মনে করুন। মানুষের স্বভাব তো এরকমই। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত আয়েশাকে বললেন, শয়তান তোমাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, আমারও কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মানুষেরই শয়তান আছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, আপনারও কি তাই? তিনি বললেন, কিন্তু আমার শয়তান আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি স. আরো বললেন, আমার নিকট জিব্‌রাইল আ. এসে দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ দিলেন। উল্লেখ্য, রসুলেপাক স. যখন ঘরের ভিতর শিথিল বসনে থাকতেন, তখন হজরত জিব্‌রাইল তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না। রসুলেপাক স. বলেন, জিব্‌রাইল যখন এলেন, তখন ভাবলাম, তোমাকে ঘুম থেকে জাগাবো না। তোমাকে বিব্রত করবো না। জিব্‌রাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন। বললেন, আপনার প্রভুপালক বলছেন, জান্নাতুল বাকীর কবরবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। এই বর্ণনায় দোয়ার বাক্যগুলো ছিলো এরকম— 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম দারা ক্বাওমিম্ মু'মিনীনা ওয়া ইন্না ওয়া ইয়্যাকুম মুতাওয়াই'দূনা গাদাম মুআজ্জ্বালূহু'। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে— 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্‌লাল কুবূরী ওয়া ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আংতুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্‌নু বিল আছারি'। এই বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কবর জিয়ারত করা সুন্নত।

রসুলেপাক স. এর গোলাম আবু মুহেবা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. অর্ধ রাতে আমাকে জাগ্রত করে বললেন, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, বাকীর কবরবাসীদের কাছে যেতে হবে। তাদের জন্য এস্তেগফার করতে হবে। তিনি আমাকে সঙ্গী হিসেবে নিলেন। জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া এস্তেগফার করলেন। রসুলেপাক স. তাঁদের জন্য এমনভাবে দোয়া করতে থাকলেন যে, আমার মনে হলো, আমিও যদি এই কবরস্থানের বাসিন্দা হতাম, তাহলে আমিও এরকম দুর্লভ দোয়া পেয়ে ধন্য হতে পারতাম। রসুলেপাক স. বললেন, হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের জন্য ওই নেয়ামতসমূহ মোবারক হোক, যার

উপর তোমরা সকাল যাপন করছো এবং যার উপর তোমরা তোমাদের কবরের জীবন অতিবাহিত করছো। তোমরা তো ওই সকল ফেতনা থেকে দূরে রয়েছো, দুনিয়ার মানুষ যার মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ওই সকল ফেতনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই জগতবাসীর উপর অন্ধকার রাতের আকারে ফেতনার ঢেউ এগিয়ে আসবে। ফেতনাসমূহের শেষ প্রান্ত মিলিত হবে প্রথম প্রান্তের সাথে। লাগাতার ফেতনা আসতে থাকবে। শেষ প্রান্তের অবস্থা হবে প্রথম প্রান্তের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। অতঃপর তিনি স. বললেন, হে মুহেবা! দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর আমাকে স্বেচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমি ইচ্ছে করলে সকল সময় দুনিয়ায় থাকতে পারি। এমন কি আল্লাহ্তায়ালা এরকম অবস্থা থেকে আমাকে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। অথবা আমি আল্লাহ্তায়ালার সাথে মোলাকাত করবো। তাড়াতাড়িই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবো। আমি আমার প্রভুপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়াকেই গ্রহণ করলাম। হজরত মুহেবা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আরও কিছু কাল আপনি দুনিয়াতে থাকুন। অতঃপর বেহেশতে গমন করুন। তাহলে তো আমরা পরিতৃপ্ত থাকতে পারবো। তিনি বললেন, না, মুহেবা, না। আমি আমার প্রভুপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়াকেই গ্রহণ করেছি। এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর রসুলেপাক স. উপস্থিত সাহাবীগণক সম্বোধন করে বললেন, দুনিয়া থেকে যারা চলে যায়, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যারা চলে গিয়েছেন, তারা তো আমাদেরই ভাই। তারা যেভাবে ইমান এনেছে, আমরাও সেভাবেই ইমান এনেছি। তারা ইমানের উপর একতাবদ্ধ হয়েছিলেন, আমরাও একতাবদ্ধ রয়েছি। তারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। আমরাও চলে যাবো। তাহলে আমাদের উপর তাদের প্রাধান্য কীভাবে হলো? রসুলেপাক স. বললেন, তারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে এবং দুনিয়ায় থেকে তাদের কোনো প্রতিদান তারা ভোগ করেনি। আর তোমাদের অবস্থা হলো এই যে, আমি জানি না, আমার পরে তোমরা দুনিয়াতে কী করবে এবং তোমাদের মধ্যে কী পরিমাণ ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলেপাক স. বাকীতে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে! আমি যদি আমার ভাইদেরকে দেখতে পেতাম। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি স. বললেন, তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা আমার পরে পৃথিবীতে আসবে। তারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি। আমি হাউযে কাউছারে তাদের জন্য আগেই উপস্থিত থাকবো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আপনার পর জন্মগ্রহণ করবে এবং আপনি যাদেরকে দেখেননি তাহলে কিয়ামতের দিন আপনি তাদেরকে

কীভাবে চিনবেন? রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের মধ্যে কারও কারও অনেক ঘোড়া আছে। তন্মধ্যে কিছু ঘোড়া শাদা, আর কিছু ঘোড়া কালো। তাহলে কি তোমরা তোমাদের ঘোড়া অন্যদের ঘোড়াসমূহ থেকে চিনে নিতে পারবে না? কিয়ামতের দিন আমার উম্মতেরা এমন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠবে যে, ওযুর কারণে তাদের ওজুর অঙ্গসমূহ ঝকমক করতে থাকবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক রাতে রসুলেপাক স.কে হুকুম দেওয়া হলো, তিনি যেনো জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের জন্য দোয়া এস্তেগফার করার পর ঘরে ফিরে এলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার একই হুকুম হলো। তিনিও পুনরায় হুকুম তামিল করলেন এবং ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় হুকুম হলো। তিনিও যথারীতি হুকুম পালন করলেন। ফিরে এসে পূর্ববৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার হুকুম হলো, উহুদের প্রান্তরে শাহাদতবরণকারীদের জন্য দোয়া করতে হবে। তিনি স. উহুদে উপস্থিত হলেন। উহুদের শহীদানের জন্য দোয়া খায়ের করলেন। যখন সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং জীবিত-মৃত সকলের জন্য দোয়া করার কাজ শেষ করলেন, তখনই মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত হলেন এবং শয্যাশায়ী হলেন। এখানে আমার মনে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উদয় হয়েছে। বিষয়টি এরকম— রসুলেপাক স.কে তখন বাকীর ও উহুদের কবরবাসীদের যিয়ারতে যাওয়ার এবং তাঁদের জন্য দোয়া এস্তেগফার করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো কেনো। বিধানটি যেনো এরকম— কেউ সফরে বের হলে আপনজনদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে থাকে। আর রসুলেপাক স. তো আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাই তিনিও ওই সকল স্থানে শায়িত আপনজনদের কাছ থেকে তখন এভাবে বিদায় নিয়েছিলেন, যাতে করে ইহজগতের লোকদের সঙ্গে পরজগতের লোকদের একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিদায়কালে রসুলেপাক স. ইহজগতের জীবিত লোকদের জন্য নসীহত ও দোয়া করেছেন। কাজেই পরজগতের লোকদের জন্যও তিনি এভাবে দোয়া ও এস্তেগফার করে গেলেন।

কেউ যদি বলে, যে সকল লোক আলমে বরযখে আছেন, রসুলেপাক স.ও তো সেই আলমের দিকেই তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি স. বলেছেন— 'ওয়া আনা বিকুম লাহিকুন' (আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি) এ কথার তাৎপর্য তা হলে কী? এমতো প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে, এটি ছিলো বাহ্যিক বিদায়। প্রকৃত বিদায় তো নয়। কেননা রসুলেপাক স. এর মাকাম তো তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। এখানে তাঁর কারও সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবসম্মত নয়। বেহেশতে যেরকম তাঁর জন্য বিশেষ মাকাম আছে, আলমে বরযখেও ঠিক তাই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন বাকী থেকে ফিরে এলেন, তখন আমার মাথা ব্যথা শুরু হলো। আমি বলতে লাগলাম, হায় আমার মাথা! আমার মাথা! তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কৌতুক করে বললেন, হে আয়েশা! তোমার ক্ষতি কী? তুমি যদি আমার পূর্বে এ জগত থেকে চলে যাও, তাহলে আমি তোমার শিয়রের কাছে দাঁড়াবো। তোমার কাফনের ব্যবস্থা করবো, তোমার জানাযার নামাজ পড়াবো। তোমাকে দাফন করবো এবং তোমার জন্য দোয়া এস্তেগফার করবো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাও কৌতুক করে বললেন, আমার মনে হয় আমার মৃত্যু আপনি পছন্দ করেন। যেদিন আমার মৃত্যু হবে, সেদিনই তো আপনি অন্য কোনো মেয়েলোককে বধু বানিয়ে আমার ঘরে নিয়ে আসবেন। রসুলেপাক স. মৃদু হেসে বললেন, হে আয়েশা! তোমার মাথা ব্যাথা তো চলে যাবে। কিন্তু আমি যে মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছি তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য, তিনি স. একথা দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই ব্যাথা দ্বারাই আমি এ জগত থেকে বিদায় হয়ে যাবো। অতঃপর তিনি স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে খুশি করার জন্য বললেন, আমি চাই যে, কাউকে পাঠিয়ে আবু বকর এবং তার পুত্র আবদুর রহমানকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসি এবং তার হাতে খেলাফতনামা দেই, যাতে অন্য কেউ এর দাবী করতে না পারে এবং কোনো আশা পোষণকারী এমন আশা না করে। এর দাবী থেকে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে যেনো বিরত রাখেন।

রসুলেপাক স. এই অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন উম্মতজননী হজরত মায়মুনার ঘরে থাকার পালায়। রোগযন্ত্রণা ক্রমশঃ কঠিন হতে শুরু করলো। তিনি স. তাঁর স্ত্রীগণকে ডাকলেন। বার বার জিজ্ঞেস করলেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকবো? একথা দ্বারা এটাই বুঝাতে চাইলেন যে, অসুস্থ অবস্থায় তিনি স. কেবল হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরেই থাকতে চান। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন পরিষ্কারভাবেই বললেন, অসুস্থ অবস্থায় তোমাদের পালার ক্রমধারা রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন। তাই তোমরা আমাকে আয়েশার ঘরে থাকার অনুমতি দিতে পারো। সেখানে গিয়েই তোমরা সকলে আমার শুশ্রূষা করতে পারবে। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (পবিত্র সহধর্মিণীগণ) সকলেই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আয়েশা সিদ্দীকার ঘরেই অবস্থান করুন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত ফাতেমা বললেন, এরকম অসুখ নিয়ে বার বার ঘর বদল করা রসুলুল্লাহ্র জন্য খুবই কঠিন। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত সকলেই তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, আপনি আয়েশার ঘরেই থাকুন। অতঃপর রসুলেপাক স. হজরত মায়মুনার ঘর থেকে বের হয়ে আহলে বাইতের দু'জন ব্যক্তির কাঁধে দু'হাত রাখলেন। এভাবে অন্যের উপর ভর করে করে এমনভাবে হেঁটে চললেন যে, তাঁর পবিত্র পদযুগল মাটি স্পর্শ করে যাচ্ছিলো। তখন তাঁর

মাথায় কাপড় বাঁধা ছিলো। এমন অবস্থায় তিনি স. উপস্থিত হলেন হজরত আয়েশার ঘরে। এক বর্ণনায় আছে, প্রথম দিকে কয়েকদিন পর্যন্ত রসুলেপাক স. তাঁর স্ত্রীগণের ঘরসমূহে পালার ক্রম রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হজরত মায়মুনার ঘরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তখনই প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হলেন। বললেন, তোমাদের ঘরসমূহে পালাক্রমে গমন করা এখন আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তখন সকলেই হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে তাঁর অবস্থান করার বিষয়ে একমত হলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ইচ্ছে— রসুল স. এর শুশ্রূষা ও খেদমত করার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটুক। তিনি স. বললেন, হে আবু বকর! আমি যদি আহলে বাইত ছাড়া অন্য কারও দ্বারা শুশ্রূষা গ্রহণ করি, তবে বিপদ আরও বাড়বে। নিঃসন্দেহে তুমি যে নিয়ত করেছো তাতে আল্লাহ্তায়ালার কাছে তোমার প্রতিদান অবশ্যই আছে।

এরপর থেকে রসুলেপাক স. এর অসুস্থতা প্রকট আকার ধারণ করলো। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তখন তাঁর বিছানার উপর বার বার এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এ রকম অবস্থা আমাদের কারও মধ্যে যদি দেখা যেতো তাহলে তাকে মন্দ মনে করা হতো এবং মানুষ তা দেখে রাগ করতো। রসুলেপাক স. বললেন, হে আয়েশা! আমার রোগ চূড়ান্ত পর্যায়ের কষ্টের। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবী ও সালেহ বান্দাগণকে চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকেন। আর যে কোনো মুমিনকেই আল্লাহ্তায়ালা কোনো না কোনো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাখেন। পায়ের মধ্যে কাঁটা বিদ্ধ হলেও তার বিনিময়ে আল্লাহ্তায়ালা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন এবং তার গোনাহ্ মাফ করে দেন। পৃথিবীতে কেউ রোগ-শোক বা বালা-মুসিবতে কষ্ট পেলে তার গোনাহ্সমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন পাতা ঝরার মওসুমে ঝরে পড়ে বৃক্ষপত্র। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. এর রোগ থেকে অধিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন কাউকে আমি দেখিনি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্র খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তাঁকে চাদর দ্বারা জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমি চাদরের উপর থেকে তাঁর জ্বরের উত্তাপ অনুভব করলাম। প্রকট উত্তাপের কারণে তাঁর শরীরের উপর হাত রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। উত্তাপের প্রখরতা দেখে বিস্মিত হলাম। রসুলেপাক স. বললেন, নবীগণের মুসিবত ও কষ্টের চেয়ে অধিক বিপদ ও কষ্ট অন্য কারও হয় না। তাঁদের বিপদ মুসিবত যেমন দ্বিগুণ, তেমনি তাঁদের প্রতিদানও দ্বিগুণ। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালা কোনো কোনো নবীকে দারিদ্রের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি তাঁদের পরনে একটি আবা ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। রাত দিনের সকল সময় ওই একটি কাপড়ই পরিধান করতে

হতো তাঁদেরকে। প্রকাশ থাকে যে, বালা-মুসিবত দীর্ঘায়িত হওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি আল্লাহ্তায়ালার দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত। আর আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সবচাইতে সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্ত জন হলেন আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের খাস অনুসারী আউলিয়া কেরাম। এতে কোনো দ্বিমত নেই।

বালা-মুসিবতে অস্থির হওয়া এবং রোগ শোকে আহাজারী-বিলাপ করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী— সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ যদি বিপদকালে অধৈর্য হয়, অস্থিরতা প্রকাশ করে, বিপদাপদকে অপছন্দ করে তা থেকে পলায়ন করতে চায়, তাহলে তা হবে হারাম (নিষিদ্ধ)। আর যদি আহাজারী করে কেবল নিজের অপারগতা প্রকাশার্থে, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। রোগের তীব্রতার কারণে যদি স্বাভাবিকভাবে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, তবে তাও ভিন্ন কথা। এ সব অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের প্রতি অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে না। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রসুলেপাক স. এর রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ার বিষয়টি এই পর্যায়ের। রেজা (তুষ্টি) ও তাসলিম (মান্যতা) ছাড়া আহাজারী প্রকাশ করা অভিযোগের মধ্যে গণ্য। এরকম করা মাকরুহ (অনভিপ্রেত)। উলামা ও মাশায়েখ যে মাকরুহ ও শেকায়েতকে বুঝিয়েছেন তা মুতলাক নয়। বরং শেকায়েত যদি বেসবরী ও নারাজীর সাথে হয় তবেই তা মাকরুহ হবে। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন নববী যদিও এই উক্তিটিকে দুর্বল ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন, এমনও হতে পারে যে, মাকরুহ বলতে এখানে অনুত্তম বুঝানো হয়েছে। কেননা উত্তম হচ্ছে আল্লাহ্র জিকিরে সব সময় নিমগ্ন থাকা। কাজেই এক্ষেত্রে নববীর বক্তব্যটি লক্ষণীয়। কেননা নবী করীম স. এর জিকিরে এলাহীতে মগ্ন থাকার বিষয়টি সুসাব্যস্ত। কাজেই এখানে 'অনুত্তম' উচ্চারণ আদবের পরিপন্থী। ক্রন্দন, বিলাপ অন্যমনস্ক স্বভাবের তীব্রতা প্রকাশক। সাধারণ জনদের অবস্থা এরকম যা একীনের দুর্বলতা এবং কাযাকে অপছন্দ করার ইঙ্গিতার্থক। এরূপ স্থলে মাকরুহ ও অনুত্তম বললে, তা জায়েয হতে পারে। কেবল সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত কষ্টের বিজ্ঞপ্তি প্রদানার্থে যদি এরকম করা হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। সুতরাং কেবল কষ্টের উল্লেখ অভিযোগ পদবাচ্য নয়। এমনও অনেক লোক আছে, যারা বাহ্যতঃ চুপচাপ থাকে, কিন্তু মন থেকে সে অভিযোগ উত্থাপনকারী। আবার তার বিপরীত এমন অনেক বুযুর্গ আছেন, যিনি বাহ্যিক অবস্থা প্রকাশ করেন কিন্তু অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ তুষ্ট। কাজেই নির্ভরযোগ্য ও সুবিদিত আমল হচ্ছে কলবের আমল। বাহ্যিক কাজ নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সহীহ্ হাদিস গ্রন্থসমূহে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, কেউ অসুস্থ হলে রসুলেপাক স. এই দোয়া পাঠ করতেন— 'ইজহাবিল বাসা রব্বিন্ নাসি ওয়াশ্ফি আংতাশ্শাফী লা শিফাআ' ইল্লা শিফাউকা শিফাআ'ল লা ইউগাদিরু শাকমান'। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. যখন অসুস্থ হলেন, তখন তিনি নিজের জন্যও এই দোয়া উচ্চারণ করে রোগমুক্তি কামনা করেছিলেন। এ দোয়া পড়ে তিনি স. তাঁর হস্তদ্বয় সমস্ত শরীরের উপর বুলিয়ে নিয়েছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রসুলেপাক স. যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আমি এই দোয়া পাঠ করে তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁর শরীর মুছিয়ে দিতে চাইলাম। তিনি স. তাঁর হাত টেনে নিলেন। বললেন— 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়া আলহিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আলা' (হে আমার প্রভুপালক! আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে রফীকে আলার (সর্বোচ্চ বন্ধুর) সাথে মিলিত করে দাও)। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. একথাও বললেন, দোয়া কালামের তাবীজ প্রথমে আমাকে উপকার দিয়েছে। এখন তা আর কোনো উপকার প্রদান করবে না।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. অন্যান্য সময় রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ্তায়ালার নিকট রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। কিন্তু তাঁর অন্তিম রোগমুক্তির জন্য তিনি স. কোনো দোয়া করলেন না। নিজের উপর কঠোরতা প্রয়োগ করলেন। নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নফস! তোমার কী হলো যে, তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের স্থানে মুক্তি সন্ধান করো। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ এরকমই বর্ণনা করেছেন। অন্য এক হাদিসে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. শয়ন করার সময় কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব এবং কুল আউযু বিরব্বিন্নাস সুরা পাঠ করে দু'হাতের উপর দম করে দু'হাত শরীরের যতটুকু স্থানে সম্ভব হতো মুছেহ করে দিতেন। মুছেহ শুরু করতেন মাথা ও বুক থেকে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. যখনই রোগাক্রান্ত হতেন, তখনই এরকম আমল করতেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, যে রোগে রসুলেপাক স. ওফাত বরণ করেন, সেই রোগের সময় তাঁর অভ্যাস অনুসারে আমি মুআওয়াসাতাইন সুরা পাঠ করে আমার হাতে দম করে তাঁর শরীরের উপর দম করতাম। এক বর্ণনায় আছে, আমি রসুলেপাক স. এর হাতে দম করতাম এই মনে করে যে, তাঁর হাতের বরকত আমার হাতের চেয়ে অনেক বেশী। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এর এরূপ আমল রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে ছিলো না। বরং তা ছিলো রসুলেপাক স. এর দৈনিক ওযিফা আদায় হিসেবে যা তিনি স. শেফা লাভের উদ্দেশ্যেও করতেন। অথবা এরূপ আমল করা হযেছিলো তাঁর অসুস্থতার প্রাথমিক অবস্থায়, যখন তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো এ জগতে অবস্থানের অথবা প্রস্থানের। তিনি আখেরাতের জগতকেই গ্রহণ করে

ছিলেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. এর অসুস্থতার কালে হজরত জিব্‌রাইল আর্বিভূত হলেন। বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার কাছে সালাম পাঠিয়ে বলেছেন, আপনি চাইলে তিনি আপনাকে শেফা দান করবেন। আর যদি তা না চান তবে তিনি আপনার মহাতিরোধান ঘটাবেন। নিমজ্জিত করে দিবেন তাঁর রহমতের দরিয়ায়। তিনি স. বললেন, আমি রফীকে আলার সাথে মিলিত হতে চাই। ওই লোকদের সঙ্গী হতে চাই, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'ওয়া মাইঁ ইউতিই'ল্লাহা ওয়ার রসূলা ফাউলাইকা মাআ'ল্লাজীনা আনআ'মাল্লাহু আ'লাইহিম মিনান্ নাবিয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাই ওয়াস্ সলিহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রফীক্বা' (আর কেহ আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ— যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন— তাহাদের সংগী হইবে এবং তাহারা কত উত্তম সংগী)(৪ঃ৬৯)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন জিব্‌রাইলকে বললেন, ভ্রাতঃ জিব্‌রাইল! আমি আমার সত্তাকে আমার প্রভুপালকের কাছে সোপর্দ করে দিলাম। আমার সম্পর্কে তিনি যা চাইবেন, তাই করবেন।

রসুলেপাক স. এর অসুস্থতা আরম্ভ হয়েছিলো সফর মাসের শেষের দিকে দু'দিন অবশিষ্ট থাকতে। এক বর্ণনায় এসেছে, বুধবার দিন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে। 'কিতাবুল ওয়াফা' তে বলা হয়েছে, সফর মাসের দু'দিন বাকী থাকতে রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি স.। রসুলেপাক স. ওফাতের রোগে আক্রান্ত হয়ে কতো দিন অসুস্থ ছিলেন, তা নিয়ে জীবনচরিতবিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তিনি তেরো দিন অসুস্থ ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, চৌদ্দ দিন। কেউ কেউ বলেছেন, বারো দিন। এক দলের মতে, দশ দিন। এই মতভেদ তৈরী হয়েছে রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রথম দিন নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে।

ঘটনাবলী

রসুলেপাক স. এর অন্তিম অসুস্থতার সময়ের কিছুসংখ্যক ঘটনা এরকম— তিনি স. হজরত ফাতেমাকে ডাকলেন। তিনি কাছে এলেন। রসুলেপাক স. বললেন, 'মারহাবান ইয়া বিনতি' (হে আমার কন্যা সুস্বাগতম)। তারপর তাঁকে কোলের কাছে বসালেন। সুস্থ অবস্থায় তিনি স. হজরত ফাতেমাকে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের জায়গায় বসিয়ে নিতেন। এগুলো ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাব। কিন্তু এ সময় সেরকম কিছু করলেন না। শুধু তাঁকে কানে কানে কিছু বললেন। হজরত ফাতেমা ক্রন্দন শুরু

করে দিলেন। তারপর আবার কানে কানে কিছু বললেন। তখন তিনি খুশি হলেন। হাসতে শুরু করলেন। হজরত আয়েশা বললেন, আমি তখন ফাতেমাকে বললাম, আমি কোনো ক্রন্দনকারীকে কখনো হাসতে দেখিনি। দুশ্চিন্তাকে আনন্দের সাথে মিলিত অবস্থায়ও কখনও দেখিনি, কারণ কী বলতো? হজরত ফাতেমা বললেন, এটি আমার ও রসুলুল্লাহ্‌র মধ্যকার ভেদের কথা। আমি একথা প্রকাশ করতে পারি না। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, ফাতেমা ওই কথা কিছুতেই প্রকাশ করলো না। রসুলুল্লাহ্ স. পরলোকগমন করলেন। আমি সেই প্রশ্নটি আবারও করলাম। সে বললো, প্রথমে রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, জিব্রাইল প্রতি বৎসর একবার এসে আমার সাথে কোরআনের দওর (পাঠ বিনিময়) করেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি এরকম করেছেন দু'বার। ধারণা করছি, আমার যাবার সময় নিকটবর্তী। এতে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। দ্বিতীয় বার বললেন, আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম তুমি আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে। একথা শুনেও আমি কাঁদলাম। সবশেষে বললেন, তুমি কি একথা পছন্দ করবে না যে, তুমি জান্নাতী রমণীদের নেত্রী। বিখ্যাত উক্তি অনুসারে হজরত ফাতেমার ওফাত হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থানের পর মাহে রমজানের তিন তারিখে। কেউ কেউ বলেছেন, তিন মাস পর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এ সময়ের আরেকটি উল্লেযোগ্য ঘটনা হচ্ছে— রসুলেপাক স. অসুস্থ থাকা কালে চল্লিশ জন গোলামকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. অসুস্থ হওয়ার প্রথম দিকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিলো। ঘটনাটি এরকম— তাঁর বুকের ব্যথা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো, তখন তিনি কখনও কখনও বেহুঁশ হয়ে যেতে লাগলেন। কখনও হুঁশ ফিরে পেতেন। অত্যধিক দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করতে পারতেন না। মাটির উপর পা টেনে টেনে হাঁটতেন। লোকেরা মনে করলো রসুলেপাক স. এর এই ব্যথার কারণ হয়তো বা নিউমোনিয়া। একদিন তাঁর শয্যাপাশে হজরত আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হজরত উম্মে সালামা ও আসমা বিনতে উমায়েস। সে সময় নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে অনেকেই জানতো। লোকেরা ওরুদ (এক প্রকারের মিকচার জাতীয় ঔষধ) প্রস্তুত করলো। রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখে ঔষধটি ঢেলে দিতে চাইলো। কিন্তু রসুলেপাক স. বার বার মানা করলেন। ইশারা দ্বারা বুঝাতে চাইলেন, তিনি ঔষধ সেবন করতে চান না। কিন্তু ঔষধ পান করাতে যাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন, এটি হয়তো ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা। তিনি স. তাঁদের এ মনোভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, কে আমার সাথে এরকম আচরণ করলো? মনে হয়, ওই মেয়েরা, যারা হাবশা থেকে এসেছে। অতঃপর তিনি স. হজরত উম্মে সালামা

ও আসমা বিনতে উমায়েসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, বারংবার নিষেধ করার পরও তোমরা আমার সাথে এরূপ আচরণ কেনো করলে? তাঁরা বললেন, নিউমোনিয়া রোগীরা সাধারণতঃ ঔষধের প্রতি বিরক্ত হয়ে থাকে। আপনার বিরক্তি হয়তো সেরকম। তাঁরা আরও বললেন, এখানে তো উনি ও হজরত আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা কী দিয়ে এ ঔষধ তৈয়ার করেছো? তাঁরা বললেন, ভারতীয় চন্দন ও কয়েক ফোটা যয়তুনের তেল দিয়ে। তিনি স. বললেন, নিউমোনিয়া রোগ শয়তান থেকে আসে। আল্লাহ্তায়ালা শয়তানকে ক্ষমতা দেননি যে, সে আমার উপর গালেব হবে। তারপর রসুলেপাক স. বললেন, ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে, তারা কেউ রক্ষা পাবে না তাদের মুখে এই ঔষধ পান করানো থেকে। আমার চাচা আব্বাস অবশ্য ব্যতিক্রম। কেননা তিনি এ কাজে অংশগ্রহণ করেননি। পরবর্তী জীবনে দেখা গেলো, রোগের কারণে তাঁদের সকলের মুখেই ঔষধ ঢালা হয়েছিলো। এমনকি হজরত মায়মুনার মুখেও দেওয়া হয়েছিলো— তিনি রোজাদার হওয়া সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, এরকম ঘটনা ঘটেছিলো কেসাসের ভিত্তিতে। কেসাস শরীয়তের একটি বিধান। রসুলেপাক স. তাঁর জীবনের ক্রান্তিলগ্নেও চেয়েছিলেন, তাঁর উম্মত যেনো শাসনের গণ্ডির বাইরে না যায় এবং তাদের উপর শরীয়তের বিধান যেনো জারী থাকে। আর এ দ্বারা এ বিষয়টিই বুঝানো হয়েছে যে, কেউ যদি কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভুল ধারণার ফলে কোনো কাজ করে ফেলে, বিশেষ করে অজ্ঞতাবশতঃ কোনো চিকিৎসা করে, তাহলে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্য স্বেচ্ছাধিকারভিত্তিক। অর্থাৎ এমতো এখতিয়ার (স্বেচ্ছাধিকার) তাকে দেওয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে তার কেসাস গ্রহণ করতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে তাকে মাফও করে দিতে পারে। শরীয়তের বিধান হচ্ছে, কেউ যদি চিকিৎসাবিদ্যা না জানে এবং তাতে তার অভিজ্ঞতা না থাকে, সে যদি মূর্খ হয় এবং মূর্খতা সত্ত্বেও কারও চিকিৎসা করে এবং সে চিকিৎসায় রোগীর কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে তার কেসাস (বদলা) নেওয়া ওয়াজিব। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন— 'মান তাত্বয়্যাবা ওয়ালাম ইয়া'লাম মিনহুত্ ত্বিব্বু কুবিলা জালিকা ফাহুয়া দ্বামিনু' (কেউ যদি চিকিৎসা করে আর পূর্ব থেকেই সে চিকিৎসা বিদ্যা না নিয়ে থাকে তাহলে চিকিৎসাকারীর উপর রোগীর দায়-দায়িত্ব পড়বে)।

রসুলেপাক স.কে ঔষধ সেবন করানোর কাজে যদিও সকল মহিলা শরীক ছিলেন না, তবু সকলেই শাস্তির উপযোগী হয়েছিলেন এজন্য যে, তাঁরা সকলেই একাজে রাজী ছিলেন। এমনকি নিষেধ করার পরও তাঁরা নিবৃত্ত হননি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই অন্যায়ের কারণে কাল কিয়ামতের দিন তাঁদেরকে অপরাধী হয়ে উঠতে হতো। রসুলেপাক স. তা চাননি। সে কারণেই তিনি

তাঁদেরকে কেসাসের মাধ্যমে পাক-সাফ করে দিলেন। যদিও এক্ষেত্রে তাঁদেরকে মাফ করে দেওয়ারও অবকাশ ছিলো। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাবও ছিলো এরকম। তিনি নিজের জন্য কারও কেসাস গ্রহণ করতেন না। কিন্তু এখানে আদব শিক্ষাদানই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। অসুখ হলে চিকিৎসা করা শরীয়তসম্মত একটি বিষয়। কিন্তু রসুলেপাক স. তখন চিকিৎসা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এ জন্য যে, ওই সকল মহিলারা যে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করতে চেয়েছিলেন, তা ছিলো নিউমোনিয়ার চিকিৎসা। কিন্তু তিনি তো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হননি। তিনি স. এরকম সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন যে, নিউমোনিয়ার চিকিৎসা তিনি গ্রহণ করবেন না। মূলতঃ এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, সে কথাও তাঁর জানা ছিলো ভালোভাবে। তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপনের কারণও ছিলো এটাই।

চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে, যাতুল জামবে বা নিউমোনিয়া রোগ বক্ষাভ্যন্তরে হয়ে থাকে। বুকের আশ পাশে অভ্যন্তরীণ জোড়াসমূহে অভ্যন্তরীণ পর্দা পড়ে, যা খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর মধ্যে হয়ে থাকে। এ রোগটির অপর নাম হাবেয। এটি একটি সাংঘাতিক ভয়াবহ রোগ। এ রোগের কারণে সাংঘাতিক জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যাথা, পিপাসা ও মস্তিষ্কের সমস্যা হয়। মোট কথা রোগটি একটি ভয়ানক রোগ। কেননা রোগটি দিল ও কলিজার মাঝখানে হয়। এর চিকিৎসা কঠিন। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, যাতুল জামবে বা নিউমোনিয়া রোগ দু'প্রকার— প্রকৃত ও অপ্রকৃত। প্রকৃত নিউমোনিয়া বুকের পাঁজরের হাড়ে হয়ে থাকে। আর অপ্রকৃত নিউমোনিয়া পার্শ্বদেশে দূষিত বায়ুদোষ থেকে সৃষ্টি হয়। এ প্রকারের নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা হচ্ছে ভারতীয় চন্দন— যা খুব চিকন করে পিষে যয়তুনের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ওই স্থানে মালিশ করতে হয় এবং উক্ত ঔষধ আঙ্গুলে লাগিয়ে আঙ্গুল চাটতে হয়। তাতে রোগের উৎসমূলে ক্রিয়া করে এবং অঙ্গসমূহকে শাক্তিশালী করে। প্রকৃত নিউমোনিয়া হলে তাতে যদি কফ থাকে, তাহলে রোগের আক্রমণের প্রথম দিকে বিশেষ চিকিৎসা করে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি তাতে রক্ত বা হলুদ কফ থাকে, তবে তার চিকিৎসা করা দুরূহ ব্যাপার। চিকিৎসা শাস্ত্রে এরকম বলা হয়েছে।

যা হোক, রসুলেপাক স. এ রোগের চিকিৎসা করার বিষয়টি পছন্দ করেননি। তখন রসুলেপাক স. প্রায়শঃ বলতেন, খয়বরে যে বিষ মাখানো বকরীর গোশ্ত আমাকে খাওয়ানো হয়েছিলো, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া বার বার আমাকে আক্রমণ করছে। মনে হচ্ছে, আমার আবহার ধমনীটি ছিঁড়ে গেছে। প্রকাশ থাকে যে, আবহার একটি ধমনীর নাম, যা হৃৎপিণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছে। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ্তায়ালা নবী করীম স. এর জন্য নবুওয়াতের সঙ্গে শাহাদতের মর্যাদাও যুক্ত করে দিয়েছেন।

কাগজ সংক্রান্ত হাদিস

রসুলেপাক স. এর অসুস্থতাকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে কাগজ সংক্রান্ত ঘটনা। বৃহস্পতিবার দিন তাঁর অসুস্থতা খুব বৃদ্ধি পেলো। তখন তিনি চুক্তিমূলক একটি পত্র সম্পাদন করতে চাইলেন। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, তুমি আমার জন্য কাগজ কলম ও দোয়াত আনয়ন করো। আমি আবু বকরের জন্য ওসিয়তনামা লিখে দিবো, যাতে কোনো মতভেদ না থাকে। হজরত আব্দুর রহমান যখন কাগজ আনতে চাইলেন, তখন তিনি স. বললেন, আবু বকরের ব্যাপারে মতভেদ করতে আল্লাহ্তায়ালা মুমিনগণকে নিষেধ করেছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সুস্পষ্ট দলিল এটাই। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, গাদীরে খুমের দিন যদি আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী মুর্তযাকে খলিফা নিযুক্ত করে দিতেন, তাহলে শেষ সময়ে তাঁকে এরূপ কথা বলতে হতো না।

কাগজ সংক্রান্ত আরও একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে, যা বিভিন্ন সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলেপাক স. তখন খুব বেশী অসুস্থ ছিলেন। সাহাবীগণ তাঁর হুজরা শরীফে সমবেত হলেন। তিনি স. বললেন, দোয়াত, কলম ও কাগজ নিয়ে এসো। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বললেন, খামা নিয়ে এসো। একটি ওসিয়তনামা লিখে দিবো। যাতে আমার পর তোমরা গোমরাহ্ না হয়ে যাও। বিষয়টি নিয়ে সাহাবা কেরাম মতানৈক্য করলেন। কেউ কেউ বললেন, যা হুকুম দেওয়া হয়েছে, তার উপর আমল করা হোক। দোয়াত কলম এনে দেওয়া হোক— রসুলেপাক স. এর যা ইচ্ছা হয়, তাতে লিখিয়ে দিবেন। কেউ কেউ বললেন, এমন অবস্থায় তাঁকে লিখানোর কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না। কেননা তিনি রয়েছেন এখন সঙ্গীন অবস্থায়। হজরত ওমর ফারুক এই মতের সপক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, এখন রসুলেপাক স. এর উপর কষ্ট প্রবল। কোরআনে করীম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. রোগযন্ত্রণার কারণে এরকম কথা বলছেন। মুনাফিকরা এসব বিষয় নিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তারা মনে মনে ধারণা করবে এবং বলবে যে, মোহাম্মদ আবল-তাবল বকছেন। মানুষ রোগগ্রস্ত হলে যেরকম করে। একদল সাহাবী হজরত ওমরের মতের অনুকূলে ছিলেন। আর একদল সাহাবী ছিলেন এই মতের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেলো। উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুরু হলো। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্র রসুলের উপস্থিতিতে বাদানুবাদ করা এবং উচ্চকণ্ঠে কথা বলা রসুলের মর্যাদার অনুকূল নয়। তার পরেও তিনি স.

তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করলেন। প্রথম ওসিয়ত— মুশরিকদেরকে আরব উপকূল থেকে বের করে দিতে হবে। দ্বিতীয় ওসিয়ত— যে সকল প্রতিনিধিদল তোমাদের কাছে আসবে, তাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করবে, যেমন আমি করে এসেছি। তৃতীয় ওসিয়ত সম্বন্ধে আলেমগণ বলেন, বর্ণনাকারী ওই ওসিয়তটির কথা ভুলে গিয়েছেন অথবা তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেননি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কী মসীবত! লোকেরা যদি ছেড়ে না দিতো। রসুলেপাক পাক স. যদি ওসিয়তনামা লিখিয়ে দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারী ছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের। তিনি বলেছেন, সেদিন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার! আর সেই বৃহস্পতিবার দিনটি যে কেমন ছিলো? যেদিন ওই ঘটনাটি ঘটেছিলো। একথা বলে হজরত ইবনে আব্বাস ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাতে তাঁর দু'গাল বেয়ে মোতির দানার মতো অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের উপর্যুক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, সেদিন হজরত ইবনে আব্বাসের মনে কী জানি কী খেয়ালের উদয় হয়েছিলো। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, রসুলেপাক স. জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এমন কোনো ওসিয়তনামা দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যদ্দ্বারা মতভেদ দূরীভূত হয়ে যেতো।

মানুষের মনে এই ধারণাটিই অধিক উদিত হয়েছে যে, রসুলেপাক স. কৃত ওই ওসিয়তের তৃতীয় বিষয়টি ছিলো খেলাফতের বিষয়। তাঁর পরে খলিফা কে হবেন, এই কথাটিই তিনি স. হয়তো নির্দিষ্ট করে লিপিবদ্ধ করে যেতে চেয়েছিলেন। তবে হাদিসের বক্তব্য থেকে এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা মিলে না। তাঁর অভিপ্রায় তখন কী ছিলো, তা আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় বিষয়টি ছিলো শরীয়তের আহকাম, ফরজসমূহ এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়ের নতুন কোনো ব্যাখ্যা ও নসীহত। তবে জানা যায় যে, এ বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি এবং ওহীর মাধ্যমে কোনো বিধানও দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তাহলে এ বিষয়ে নীরব থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলো না। হজরত ওমর ফারুক রসুলেপাক স. এর ওযীরতুল্যই ছিলেন। তিনি সময়ের চাহিদা ও তার কল্যাণ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি স. হজরত ওমরকে মানা করেননি, যেমন হজরত আবু হুরায়রার হাদিসে এসেছে। একদিন রসুলেপাক স. হজরত আবু হুরায়রাকে বললেন, ঘোষণা করে দাও, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম হয়ে যাবে। তখন হজরত ওমর, হজরত আবু হুরায়রাকে বাধা দিলেন এবং রসুলেপাক স. এর কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! লোকদেরকে আমল করার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। রসুলেপাক স. তাঁর নিবেদন কবুল করলেন। এক্ষেত্রেও সেরকমই

হলো। রসুলেপাক স. যখন শুনলেন, হজরত ওমর বলেছেন 'হাসবুনা কিতাবুল্লাহ্' (আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট) তখন রসুলেপাক স. চুপ হয়ে গেলেন। মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং জেনে নিলেন যে, সাহাবীগণ দ্বীনের উপর সুদৃঢ় আছেন। অধিক কোনো কিছুর প্রয়োজন আর নেই। তবে উচ্চস্বরে আওয়াজ করাটি পছন্দ করেননি বিধায় তিনি বলেছিলেন, তোমরা এখান থেকে উঠে চলে যাও।

হতে পারে শীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মস্তিষ্কে এ ধারণাটি সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে, রসুলেপাক স. হজরত আলীকে খলিফা মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রসুলেপাক স.কে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্ণনার বাচনভঙ্গিতে এ ধরনের কোনো কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং হাদিসের অনুষঙ্গ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কিত ওসিয়ত ছিলো অধিকতর স্পষ্ট। রসুলেপাক স. হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে বলেছিলেন, কাগজ ও দোয়াত নিয়ে এসো, আমি অঙ্গীকারনামা লিখে দিবো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত আবু বকর সিদ্দীককে ইমামতির জন্য হুকুম প্রদান

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে, অসুস্থ হওয়ার পর রসুলেপাক স. এক সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীককে নামাজে ইমামতি করার হুকুম দিলেন। জীবনালেখ্যবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. অসুস্থকালীন সময়ে তিন দিন নামাজ পড়ালেন। অতঃপর হজরত আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর জন্য বললেন। কেউ কেউ বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় তিনি স. সতেরো ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়েছিলেন। এশার নামাজের আজান হলো। তিনি স. বললেন, তোমরা আবু বকরকে বলো, সে যেনো লোকদের সাথে নামাজ পড়ে এবং তাদের ইমামতি করে। যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রবীয়াকে বললেন, যাও এবং লোকদের নামাজ পড়ানোর জন্য বলো। হজরত আব্দুল্লহ্ ইবনে রবীয়া বাইরে এলেন। সাক্ষাত হলো হজরত ওমরের সঙ্গে। তিনি বললেন, যান। লোকদের নামাজ পড়িয়ে দিন। তিনি নামাজ পড়িয়ে দিলেন। হজরত ওমর উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। রসুলেপাক স. যখন হজরত ওমরের কণ্ঠস্বর শুনলেন, তখন বললেন, একি ওমরের আওয়াজ? বলা হলো, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসুল! রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের উচিত আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর জন্য বলা। 'আল মুনতাছা' কিতাবে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে।

এক বর্ণনায় আছে, হজরত বেলাল রসুলেপাক স. এর অসুস্থতার কালে নামাজের জন্য আজান দিলেন। তখন রসুলেপাক স. হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে

রবীয়াকে বললেন, বাইরে যাও এবং আবু বকরকে বলো, সে যেনো লোকদের নামাজ পড়িয়ে দেয়। হজরত আব্দুল্লাহ্ বাইরে এসে হজরত ওমরের মুখোমুখি হলেন। সেখানে আরও কয়েকজন ছিলো। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর ছিলেন না। তখন তিনি হজরত ওমরকে লোকদের নামাজ পড়ানোর জন্য বললেন। হজরত ওমর তকবীর বললেন। তিনি উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে রসুলেপাক স. তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে ইমামতি করতে নিষেধ করছেন। মুসলমানদের মনোভাবও তাই। একথা তিনি স. বললেন তিনবার। হজরত ওমর আব্দুল্লাহ্ ইবনে রবীয়াকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছো। আমি তো মনে করেছিলাম, রসুলেপাক স. তোমাকে হুকুম দিয়েছেন আমাকে বলার জন্য। হজরত আব্দুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কাকে বলবো, রসুলেপাক স. তা উল্লেখ করেননি। এক বর্ণনায় আছে, হজরত বেলাল আজান দিয়ে রসুলেপাক স. এর দরজায় দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর রহমত নাযিল করুন। রসুলেপাক স. বললেন, আবু বকরকে বলো, সে যেনো লোকদের নামাজ পড়ায়। হজরত বেলাল আক্ষেপ করতে করতে বাইরে এলেন। আশাভঙ্গের কারণে বলতে লাগলেন, আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন। অথবা আজকের এই দৃশ্য দেখার আগেই যদি আমার মৃত্যু হতো। আমি যদি রসুলেপাক স.কে এ অবস্থায় না দেখতাম। তারপর তিনি মসজিদে এসে বললেন, হে আবু বকর! রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আপনি সামনে আসুন এবং নামাজ পড়ান। হজরত আবু বকর সিদ্দীক মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, রসুলুল্লাহ্ স. মসজিদে নেই। কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সাহাবীগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তার পবিত্র প্রকোষ্ঠের ভিতর থেকে কান্নার রোল শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা! কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কেনো? হজরত ফাতেমা বললেন, আপনাকে মসজিদে দেখতে না পেয়ে মুসলমানগণ কাঁদছে। তিনি স. হজরত আলী এবং হজরত আব্বাসকে ডাকলেন। তাঁদের কাঁধে ভর করে বাইরে এলেন এবং মসজিদে এসে নামাজ পড়ালেন। তারপর বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া বিজয়, আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং সাহায্যের মধ্যে আছো। আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের আনুগত্য ও তাকওয়ার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আমি চলে যাচ্ছি। পৃথিবী থেকে প্রস্থান করছি।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. পীড়িত হয়ে পড়লেন। মসজিদে গমনের শক্তিরহিত হলেন। এশার নামাজের সময় হলো। লোকজন তাঁর

অপেক্ষায় রইলেন। তিনি স. এক সময় বললেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে নিয়েছে? বলা হলো, না, হে আল্লাহর রসুল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি স. বললেন, পানির ব্যবস্থা করো। পানি আনা হলো। তিনি নিজেই সেই পানি তাঁর শরীরে ঢেলে দিলেন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পেলেন কিছুক্ষণ পর। জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি তখন বললাম, লোকেরা আপনার অপেক্ষা করছে। আবার বললেন, পানির ব্যবস্থা করো। তিনি আবার গোসল করলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তিনবার এরকম হলো। তৃতীয় বারের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেনো নামাজ পড়িয়ে দেন। এক বর্ণনায় এসেছে, সাত মশক পানি প্রবাহিত করা হলো। মশকের মুখও খোলা রাখা হলো। তারপর হজরত বেলাল এলেন। রসুলেপাক স.কে নামাজের কথা জানালেন। তাঁর অভ্যাস এরকমই ছিলো। রসুলেপাক স. বললেন, আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা নরম দিলের মানুষ। তিনি তো আপনার জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ক্বেরাত পড়তে পারবেন না। হজরত ওমরকে যদি আদেশ দিতেন। রসুলেপাক স. বললেন, আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হজরত হাফসাকে বললেন, তুমি রসুলুল্লাহ্কে বলো, আমার পিতা কোমল অন্তরবিশিষ্ট। তিনি তাঁর জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ক্বেরাত পড়তে পারবেন না। রসুলেপাক স. বললেন, হে নারী সকল! তোমরা নবী ইউসুফের ভাইদের মতো (তোমাদের মুখে এক কথা আর অন্তরে অন্য কথা)। আবু বকর সিদ্দীককে নামাজ পড়াতে বলো। অবশেষে হজরত আবু বকর সিদ্দীক নামাজ শুরু করলেন। রসুলেপাক স. কিঞ্চিত সুস্থতা অনুভব করলেন। তিনি উঠে মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদের দিকে চললেন। তখন তাঁর পবিত্র পদযুগল মাটি ঘেঁষে যাচ্ছিলো। এভাবে মসজিদে উপস্থিত হতে সক্ষম হলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর আগমনের বিষয়টি টের পেলেন। তিনি পিছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রসুলেপাক স. ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, তুমি স্বস্থানে অবস্থান করো। তারপর তিনি স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাম পার্শ্বে বসে পড়লেন। হজরত আবু বকর রইলেন দাঁড়ানো অবস্থায়। তিনি রসুল স. এর অনুসরণ করলেন। আর লোকেরা অনুসরণ করতে লাগলেন হজরত আবু বকরের। মূলতঃ হজরত আবু বকর সিদ্দীক পালন করলেন মুকাব্বিরের ভূমিকা। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইমাম ছিলেন। আর রসুলেপাক স. ছিলেন মুক্তাদী। আলেমগণ বলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ইমামতীর ব্যাপারে বিভিন্ন বিবৃতি রয়েছে। নামাজ শেষ করার পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক

নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সকাল বেলা আপনার দরবারে হাজির হবো। অতঃপর তিনি অনুমতি নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেলেন। তাঁর বাড়ি ছিলো মদীনার উঁচু এলাকায় সানাহ্ নামক স্থানে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের অনুসরণে রসুলেপাক স. এর নামাজ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ছাড়া অন্য কোনো উম্মতের পিছনে নামাজ আদায় করেননি। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পিছনে একবার নামাজ আদায় করেছেন। আর এক সফরে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের পিছনে এক রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান তাঁর পিতা আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি কোনো এক যুদ্ধের সফরে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন। রসুলেপাক স. প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিলো। তখন সাহাবা কেরাম একামত বলে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে সামনে এগিয়ে দিলেন। রসুলেপাক স. ফিরে এলেন। ততোক্ষণে হজরত আব্দুর রহমানের এক রাকাত শেষ হয়েছে। তিনি স. এর আগমন টের পেয়ে পিছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রসুলেপাক স. ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, তুমি স্বস্থানেই থাকো। অতঃপর তিনি স. এক রাকাত নামাজ হজরত আব্দুর রহমানের পিছনে আদায় করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বাদ পড়ে যাওয়া এক রাকাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর বললেন, দুনিয়া থেকে এমন কোনো নবী অতিবাহিত হননি, যিনি তাঁর উম্মতের কোনো পুণ্যবান বান্দার পিছনে নামাজ সমাপন না করেছেন। রসুলেপাক স. যে রুমী জুব্বা পরিধান করেছিলেন, এই হাদিসে তার বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া এই হাদিসে এ সকল বিষয়ের বর্ণনাও ছিলো— কপাল ও পাগড়ীর উপর মাছেহ করা, মুজার উপর মাছেহ করা, দুই পা ধৌত করা, নামাজে পরে মিলিত হওয়া এবং পা ধৌত করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন না করার উপর ধমক, ওয়ায়লুল্লিল আ'কাবি মিনান্নার প্রভৃতি।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ইমামতী নির্ধারণ করা এবং এ বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন তাঁর খেলাফতের বিধানটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মনে করেন। সেখানে অন্যান্য সাহাবা কেরাম ও হজরত আলী উপস্থিত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীককেই নির্বাচন করেছেন এবং তাঁকেই অগ্রগামী করে দিয়েছেন। তখন হজরত আলী হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বলেছিলেন, রসুলুল্লাহ্ স. আপনাকে

অগ্রণী করে দিয়েছেন, সুতরাং কে আছে এমন, যে আপনাকে পিছনে ফেলে দিবে? ‘উসদুল গাবা’ কিতাবে হাসান বসরীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুল আবু বকর সিদ্দীককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লোকদের নামাজ পড়িয়েছেন। আমি সেখানে বিদ্যমান ছিলাম— অনুপস্থিত ছিলাম না। সুস্থ ছিলাম— রোগগ্রস্ত ছিলাম না। রসুলেপাক স. চাইলে আমাকে এগিয়ে দিতে পারতেন। সুতরাং আমি আমার দুনিয়ার জন্য ওই ব্যক্তিকেই পছন্দ করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল স. যাঁকে দ্বীনের জন্য পছন্দ করেছেন। এখানে হজরত আলী খেলাফতকে দুনিয়া আখ্যায়িত করেছেন বাহ্যিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, যাতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় বিষয়ই অন্তর্ভূত আছে। আর নামাজ হচ্ছে কেবলই দ্বীন।

একদিন রসুলেপাক স. বনী ওমরের মধ্যে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে কোবায় গিয়েছিলেন। নামাজের সময় হজরত বেলাল হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, আপনার কী অভিমত? নামাজের সময় তো হয়েছে। আমি কি আজান দিবো ? আজান দিলে সম্ভবতঃ রসুলেপাক স. এসে হাজির হয়ে যাবেন। রসুলেপাক স. এর আসতে যখন বিলম্ব হলো, তখন সকল সাহাবী একমত হয়ে হজরত আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে দিলেন। তখনই রসুলেপাক স. আগমন করলেন। হজরত আবু বকর পিছনে সরে আসতে চাইলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে স্বস্থানে অবস্থান করার জন্য ইশারা করলেন। তারপর তিনি হজরত আবু বকরের পিছনে নামাজ আদায় করলেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন সকল সাহাবীর মধ্যে অগ্রগণ্য।

কবরের সামনে সেজদা করা নিষেধ

মহাপ্রস্থানের পাঁচদিন পূর্বে রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা সাবধান হও এবং ভালোভাবে শুনে রাখো। তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছিলো। তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য এরকম কাজ না করা। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, ‘লাআ’নাল্লাহুল ইয়াহূদা ওয়ান্‌নাসারা ইত্তাখাজূ কাবূরা আম্‌বিয়াইহিম মাসাজিদা’ (ইহুদী ও নাসরাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত হোক, এরা তাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, হে আল্লাহ! আমার পরে আমার কবরকে মূর্তি বানিও না। আল্লাহ্‌র গজব সবচেয়ে বেশী ওই লোকদের উপর পতিত হয়, যারা তাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানায়। হে মুসলমানগণ! নিশ্চয়ই আমি

তোমাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করছি। তিনি আরও বললেন— 'আলা হাল বাল্লাগতু আল্লাহুম্মাশ হাদ আল্লাহুম্মাশ হাদ' (ওহে! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো)।

কবরকে সেজদার জায়গা বানানো কথাটির অর্থ হচ্ছে কবরের দিকে সেজদা করা। এটি দুই অবস্থায় হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কবরবাসীকে পূজা করার উদ্দেশ্যে কবরকে সেজদা করা। যেমন মূর্তিপূজা করা হয়। অপরটি এরকম— সেজদা করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালার এবাদত করা। কিন্তু এরকম বিশ্বাস রাখা, কবরের দিকে মুখ করলে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং আল্লাহ্তায়ালার কাছে এটি হবে একটি বিরাট পুণ্যের কাজ, যেহেতু মুখ করার (কেবলা করার) বিষয়টি ইবাদতের অন্তর্ভূত, তাই এরকম করলে নবীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এ দু'টি অবস্থাই অগ্রাহ্য এবং শরীয়তবিরোধী। প্রথম অবস্থাটি শিরকে জলী (প্রকাশ্য শিরক)। দ্বিতীয় অবস্থাটিও হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা এতে জড়িত রয়েছে শিরকে খফী (অপ্রকাশ্য শিরক)। এই দুই অবস্থাই আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত। নবী অথবা পুণ্যবান ব্যক্তির কবরের দিকে বরকতের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়া হারাম। এ বিষয়ে রয়েছে সকল আলেমের ঐকমত্য।

এখন কথা হতে পারে, কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা এবং কবরের দিকে মুখ না করে সেই মসজিদে নামাজ পড়া সম্পর্কে। কবরের পাশে যদি মসজিদ বানানো হয়, সেই কবরে যদি কোনো পবিত্র মানুষ সমাহিত থাকেন, আর সেই পবিত্র মানুষের রুহানিয়াত ও নুরানিয়াত দ্বারা ইবাদত অধিক পরিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে কেউ যদি আকীদা পোষণ করে, তবে উপর্যুক্ত হুকুম এখানে প্রযোজ্য হবে না। এতে দোষেরও কোনো কারণ নেই। এরকম আলোচনা করেছেন শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে, কেউ কেউ কবরস্থানে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে একটি হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত, পূঁজ এবং অন্যান্য নাপাক জিনিস থেকে যদি যমীন পাক সাফ থাকে, তাহলে সেখানে নামাজ পড়া জায়েয এবং এটি একটি পছন্দনীয় মযহাব। কবরকে চুম্বন করা, সেজদা করা এবং কবরে কপাল লাগানো হারাম ও নিষিদ্ধ। পিতা-মাতার কবরে চুম্বন করার বিষয়ে অবশ্য ফেকাহ্শাস্ত্রের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে— এরূপ করা নাজায়েয।

বিদায় রজনী

রসুলেপাক স. অসুস্থ থাকার কালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। দেখা গেলো তাঁর হুজরা শরীফে রয়েছে সাতটি দীনার। এই সাতটি দীনার কোথা থেকে এসেছিলো, তা-ই এখন আমাদের আলোচনার বিষয়। তিনি তো সব সময় ঘরে যা থাকতো তা দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। অবশ্য ছয় সাত দেরহাম ঘরে খরচের জন্য রেখে দিতেন। এর বেশী নয়। তিনি স. সেগুলোও খরচ না করা পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে হজরত সাহল ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. এর ঘরে সাতটি দীনার ছিলো। ওই দীনারগুলো রক্ষিত ছিলো হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে। তিনি স. যখন অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলো পাঠিয়ে খরচ করে ফেলো। একথা বলার পরপরই তিনি স. বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে তৎক্ষণাৎ আদেশটি পালন করতে পারলেন না। রসুলেপাক স. হজরত আয়েশাকে তিনবার এই আদেশ করলেন এবং তিনবারই বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তাই হজরত আয়েশা হুকুমটি সাথে সাথে পালন করতে পারলেন না। পরে তিনি ওগুলোকে হজরত আলীর কাছে দান করে দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় বললেন, হে আয়েশা! সেই দীনারগুলো কোথায়? তিনি বললেন, আমার কাছে। রসুলেপাক স. বললেন, ওগুলো খরচ করে ফেলো। একথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওগুলো খরচ করেছো? হজরত আয়েশা বললেন, এখনও খরচ করা হয়নি। তারপর রসুলেপাক স. সে দীনারগুলোকে নিজের হাতে নিয়ে বললেন, হে স্বর্ণসম্ভার! তোমরা কি মনে করো, তোমরা আমার হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি আমার রবের সঙ্গে মিলিত হবো? হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

সোমবার। সন্ধ্যা হলো। তেলের অভাবে ঘরে প্রদীপ জ্বালানো গেলো না। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা কোনো এক আনসারী মহিলার কাছে কয়েক ফোঁটা তেল চেয়ে পাঠালেন। রসুলেপাক স. মৃত্যুযন্ত্রণা কবলিত। সুবহানাল্লাহ্! শেষ সম্বল মাত্র সাত দীনার। তা-ও দান করে দেওয়া হলো। সন্ধ্যা হলো। দেখা গেলো, চেরাগ জ্বালানোর মতো এক ফোঁটা তেলও ঘরে নেই। তরীকার দাবীদারদের জন্য এতে রয়েছে এক মহান দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। রসুলেপাক স. ঘরে কিছুই রাখতেন না। সামান্য কিছু মাল থাকলেও তা খরচ করে ফেলতেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. এর মহব্বতের দাবীদার যারা, তাদের উচিত রসুলেপাক স. এর অনুসরণ করা। নতুবা মহব্বতের দাবী হবে মূল্যহীন।

আনসারদের বিষয়ে ওসিয়ত

এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আনসারদের প্রতি রসুলেপাক স. এর ওসিয়ত। জীবনালেখ্যবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, অসুস্থতার কালে একদিন রসুলেপাক স. একটু হুঁশ অবস্থায় ছিলেন। তিনি বাইরে তশরীফ আনলেন এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর ভাষণ দিলেন। বললেন, আনসারগণ হলো আমার সিন্দুকতুল্য, যার মধ্যে বস্ত্র ও মূল্যবান মালপত্র রাখা হয়। এক বর্ণনায় আছে, তিনি স. বলেছেন, আনসারগণ হচ্ছে আমার উদর তুল্য। তাঁদেরকে তিনি সিন্দুক বা পেট বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথার অর্থ— তাঁরা রসুলেপাক স. এর বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গোপন কথা রাখার স্থল। তিনি তাঁদের সম্পর্কে আরও বলেছেন, আমি তাদের কাছে হিজরত করে এসেছি। তারা আমাকে জায়গা দিয়েছে। দিয়েছে ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব ও মানবতা। মুহাজিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আর তারা তোমাদের প্রতিও এরূপ আচরণ করেছে। শপথ ওই মহান সত্তার যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।

জীবনালেখ্যবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, আনসারগণ যখন দেখলেন, রসুলেপাক স. এর অসুস্থতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তখন তাঁরা ঘরে-বাইরে কোথাও শান্তিতে বসে থাকতে পারলেন না। হয়রান পেরেশান হয়ে মসজিদের আশে পাশে ঘুরাঘুরি করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, আমাদের আশংকা হচ্ছে, কখন আল্লাহ্র রসুল না জানি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আমরা জানি না তাঁর অবর্তমানে আমাদের অবস্থা কী হবে। তাঁদের এরকম অবস্থার কথা রসুলেপাক স. এর কর্ণগোচর হলো। তিনি স. উঠে দাঁড়ালেন। এক হাত হজরত আলীর কাঁধে এবং অপর হাত হজরত ফযল ইবনে আব্বাসের কাঁধে রেখে মাটিতে পা ঘেঁষে ঘেঁষে বাইরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। হজরত আব্বাস আগে আগে চলতে লাগলেন। এভাবে মসজিদে উপস্থিত হলেন। মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করলেন। তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো। সাহাবা কেরাম জমায়েত হতে লাগলেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি স. আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা, পবিত্রতা ও স্তবস্তুতি বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে লোক সকল! আমি জানতে পারলাম, তোমরা আমার প্রস্থানের কথা মনে করে ভয় পাচ্ছো। তোমরা যেনো আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করতে চাইছো। তোমরা কেমন করে একজন সত্য নবীর পরলোকগমনকে অস্বীকার করতে পারো? অথচ আমার ও তোমাদের পরযাত্রা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তো বলেছেন— 'ইন্নাকা মায়্যিতুন ওয়া ইন্নাহুম মায়্যিতূন (তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল)(৩৯ঃ৩০)। তিনি আরও বললেন, কোনো নবীই তাঁর কওমের মধ্যে

চিরদিন বেঁচে থাকেননি। তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে কেমন করে চিরদিন থাকবো? জেনে রেখো এবং হুঁশিয়ার হয়ে যাও যে, আমাকে এবং তোমাদের সকলকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, তোমরা আনসারদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। আর মুহাজিরদেরকেও আমি ওসিয়ত করছি, তোমরা পরস্পর কল্যাণকামনার সাথে বসবাস করবে। তারপর তিনি স. সুরা ওয়াল আসর পাঠ করলেন। অতঃপর পাঠ করলেন এই পবিত্র আয়াতখানিও— 'ফা হাল আ'সাইতুম ইন তাওয়াল্ লাইতুম আন তুফসিদূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া তুক্বাত্ত্বিঊ' আরহামাকুম' (তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে)(৪৭ঃ২২)। উল্লেখ্য, এই পবিত্র আয়াতে মারওয়ানিয়া ও আব্বাসিয়া বাদশাহ ও আমীর ওমরাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা আহলে বাইতের সাথে জুলুম নির্যাতন করেছিলো। রসুলেপাক স. আরও বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের অধিকারের বিষয়ে ওসিয়ত করছি। আরও বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমার পরে একটি দল তোমাদের উপর অগ্রাধিকার খাটাবে। তারা তোমাদের উপর নিজেদেরকে অগ্রগণ্য ভাববে। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি বলুন তখন আমরা তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবো? রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। আমার কাছে হাউযে কাউছারের পাশে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

জীবনালেখ্যবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আমীর মুআবিয়ার জামানায় একজন আনসারী ব্যক্তির উপর জুলুম করা হলো। তিনি হজরত আমীর মুআবিয়ার কাছে জুলুমের বিচার চাইলেন। কিন্তু হজরত মুআবিয়া তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। আনসারী বললেন, রসুল স. আমাদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের উপর জুলুম করা হবে। হজরত মুআবিয়া বললেন, তিনি আর কী বলেছিলেন? আনসারী বললেন, বলেছেন, তোমরা তখন ধৈর্য ধারণ করবে। হজরত মুআবিয়া বললেন, তাহলে যাও এবং ধৈর্য ধারণ করো।

হজরত আব্বাস নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কুরাইশদের সম্পর্কেও ওসিয়ত করুন। তিনি স. বললেন, আমি ওসিয়ত করছি, খেলাফত কুরাইশদের জন্য। এই মর্মে ঘোষণা দিলেন— 'আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ (ইমাম বা খলীফাগণ কুরাইশ বংশ থেকেই হবে)। তারপর তিনি হজরত বেলালকে ডেকে বললেন, ঘোষণা করে দাও, সকলেই যেনো এখানে সমবেত হয়। আমি তাদেরকেও ওসিয়ত করতে চাই। বলতে চাই— এই ওসিয়ত আল্লাহ্র রসুলের শেষ ওসিয়ত। হজরত বেলাল নির্দেশ মতো মদীনার অলি-গলিতে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। মদীনার ছোটো বড়ো সকলে ঘর-বাড়ি ও দোকান-পাট খোলা রেখে যে

যেখানে ছিলো সেখান থেকে দৌড়ে এসে হাজির হতে লাগলো। এতো লোকসমাগম হলো যে, মসজিদে তাদের সংকুলান হলো না। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা তোমাদের পিছনের লোকদেরকে জায়গা করে দাও। তারপর তিনি একটি সুদীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। ভাষণে শরীয়তের আহকাম, সময়োপযোগী উপদেশ ও আদব সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। বললেন, তোমাদের কাছ থেকে আমার পৃথক হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী। আমার কাছে তোমাদের কারও কোনো পাওনা থাকলে তা আমার কাছ থেকে এখনই নিয়ে নাও। জান মাল ও সামান যা কিছুই হোক না কেনো, আমার কাছ থেকে তার কেসাস (বদলা) নিয়ে নাও। এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার কাছে আমার দুই তিন দেরহাম পাওনা আছে। রসুলেপাক স. বললেন, আমি কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি না এবং কোনো কসমও দিচ্ছি না। শুধু জানতে চাচ্ছি, তুমি আমার কাছে যে তিন দেরহাম পাবে, তা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে? লোকটি বললো, একদিন এক ভিক্ষুক আপনার কাছে এসেছিলো। তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন, একে তিন দেরহাম দিয়ে দাও। রসুলেপাক স. বললেন, হে ফযল! তাকে তিন দেরহাম দিয়ে দাও। তারপর তিনি স. আরও বললেন, হে লোক সকল! অন্যের পাওনা আজই পরিশোধ করে দেওয়া উচিত। এরকম মনে করা উচিত নয় যে, এতে করে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। জেনে নাও এবং হুঁশিয়ার হয়ে যাও যে, দুনিয়ার লজ্জা আখেরাতের লজ্জা থেকে সহজতর। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি তিন দেরহাম মূল্যের মাল কোনো একদিন গনিমতের মাল থেকে খেয়ানত করেছিলাম, যা আমার উপর পাওনা আছে। রসুলেপাক স. বললেন, কেনো খেয়ানত করেছিলে? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার প্রয়োজন ছিলো। তিনি স. বললেন, হে ফযল! আমার পক্ষ থেকে তুমি তার পাওনা পরিশোধ করে দাও। তারপর বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের কারও মধ্যে যদি এমন কোনো দোষ থেকে থাকে যা বর্জন করা উচিত, তাহলে সে যেনো দাঁড়িয়ে যায়। আমি তার জন্য দোয়া করবো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এক মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী এবং আমি খুব বেশী ঘুমাই। রসুলেপাক স. তার জন্য দোয়া করলেন— হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সত্যবাদী বানিয়ে দাও এবং তার নিদ্রা দূর করে দাও, সে স্বল্প নিদ্রা কামনা করছে। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি একজন মিথ্যাবাদী এবং মুনাফিক। এমন কোনো খারাবী নেই, যা আমার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। একথা শুনে হজরত ওমর ফারুক বললেন, লোকটিতো নিজেই নিজেকে অপদস্থ করছে। রসুলেপাক স. বললেন, দুনিয়ার অপদস্থতা আখেরাতের অপদস্থতা থেকে সহজ। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সত্যবাদিতা এবং ইমান নসীব করো। তার অন্তর থেকে খারাবীসমূহ দূর করে

দাও এবং নেকীর দিকে তাকে আকৃষ্ট করে দাও। হজরত ওমর তখন কিছু কথা এমন বললেন, যা শুনে রসুলেপাক স. হেসে ফেললেন। বললেন, ওমর আমার সাথে, আমিও ওমরের সাথে। আর হকও সর্বদাই ওমরের সাথে থাকবে, সে যে দিকেই থাকুক। রসুলেপাক স. এ ধরনের আরও কিছু উপদেশ বাণী দিলেন। তারপর তাঁর হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেন। সাহাবা কেরাম সম্পর্কে বললেন, তোমারা কুফুরী ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে— এরকম শংকা আমার নেই। তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে না। তোমরা একে অপরের সাথে গাফলতের ভূমিকা রাখবে। আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রতি (পবিত্র সহধর্মিণীগণের) প্রতি নসীহত করে বললেন, তোমাদের উপর অবশ্যকর্তব্য হবে, নিজেদেরকে আপন আপন গৃহকোণে সুরক্ষিত রাখা। গায়রে মুহাররম ব্যক্তিদের কাছ থেকে পর্দা করা। তারপর তিনি স. এই পবিত্র আয়াত পাঠ করলেন— 'ওয়া ক্বারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রজ্‌না তাবার্‌রুজ্বাল জ্বাহিলিয়্যাতিল উলা' (আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না)(৩৩ঃ৩৩)।

মেসওয়াক করা প্রসঙ্গে

রসুলেপাক স. এর ওফাতের পূর্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে আরেকটি অন্যতম ঘটনা হচ্ছে ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে মেসওয়াক করা। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. আমার কোলে এবং বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ করে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর হাতে ছিলো সবুজ রঙের একটি মেসওয়াক। রসুলেপাক স. সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি স. আব্দুর রহমানের মেসওয়াকটি পছন্দ করছেন এবং তার প্রয়োজন অনুভব করছেন। আমি নিবেদন করলাম, মেসওয়াকটি কি আপনাকে দিবো? রসুলেপাক স. মাথা দ্বারা ইশারা করে বুঝালেন, হাঁ। আমি আব্দুর রহমানের কাছ থেকে মেসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি স. খুব ভালোভাবে মেসওয়াক করলেন। তাঁর স্বাভাবিক মেসওয়াক করার চেয়ে বেশী করলেন। তারপর তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা শেষ দিন আমার মুখের লালা রসুলেপাক স. এর পবিত্র লালার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা অন্যান্য সকল আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের উপর ফখর করে বলতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার উপর যে নেয়ামতসমূহ প্রদান করেছেন তা হচ্ছে— রসুলুল্লাহ্ স. আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার কোলে, আমার হুজরায় এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে ইনতেকাল করেছেন। বিদায়ের কালে আমার মুখের লালা তাঁর মুখের লালা মোবারকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে উকাইলি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, আমার জন্য একটি তাজা মেসওয়াক নিয়ে এসো এবং সেটিকে নরম করে দাও। আমি ওই মেসওয়াকটি মুখে নিয়ে চিবাবো, যাতে করে আমার লালার সাথে তোমার মুখের লালা মিলিত হয়ে যায়। এতে আমার মৃত্যু সহজ হবে। শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী বলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা কর্তৃক চিবানো মেসওয়াক দিয়ে রসুলেপাক স. এর মেসওয়াক করানো এরকম— একদিন রসুলেপাক স. সুস্থ অবস্থায় মেসওয়াক করলেন। অতঃপর সেই মেসওয়াক হজরত আয়েশাকে দিলেন পানি দিয়ে ধৌত করার জন্য। হজরত আয়েশা মেসওয়াকটি নিয়ে প্রথমে মুখ দ্বারা চুষলেন। তারপর পানি দ্বারা ধৌত করে রসুলেপাক স. এর কাছে ফেরত দিলেন। রসুলেপাক স. হজরত আয়েশার সেদিনের আমলের বদলা দিয়ে দিলেন জীবনের শেষ মুহূর্তে। তবে এই বর্ণনাটি গরীব (অখ্যাত) হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কেননা রসুলেপাক স. বলেছেন, মেসওয়াকটি চিবিয়ে আমাকে দাও, আমিও তাতে চিবাবো, যাতে আমার মৃত্যু সহজ হয়। এতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি রসুলেপাক স. এর বিশেষ মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে হজরত হাসান বসরী থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। তিনি বলেছেন, মানুষ স্বভাবগতভাবেই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আম্বিয়া কেরাম ও প্রিয় ব্যক্তিগণকে আপন দীদার এবং এ ছাড়াও বিভিন্ন কারামত ও এআ'নত ইত্যাদি তাঁরা যা পছন্দ করেন, এ সব উপস্থিত করে দিয়ে তাঁদের মৃত্যুকে আসান করে দেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের জান কবয করে নেন। মুসলমানদের রুহ আল্লাহ্তায়ালা এমতাবস্থায় কবয করেন, যখন তারা আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানায় মশগুল থাকেন। সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা যদি এরূপ হয় তাহলে আম্বিয়া কেরাম খাস করে সাইয়্যেদে আলম স. এর মাকাম কী রকম হতে পারে তা ভেবে দেখা উচিত? আম্বিয়া কেরামকে মৃত্যুবরণ অথবা দুনিয়ায় বেঁচে থাকা এ দু'য়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়। আল্লাহপাকের বিধানের মাহাত্ম্য এরকমই। নিঃসন্দেহে রসুলেপাক স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তা ছিলো হজরত আয়েশার প্রতি রসুলেপাক স. এর গভীরতর ভালোবাসার ফল। কেননা ভালোবাসা অনেক সময় দৈহিক কষ্টকে লাঘব করে দেয়।

'মসনদ' গ্রন্থে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমার মৃত্যুকে আসান করে দেওয়া হয়েছে। কেননা আয়েশার হাতের শুভ্রতা আমি জান্নাতে দেখেছি। ইবনে সাআদ প্রমুখ সাহাবী থেকে একটি মুরসাল

হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুলেপাক স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তাকে বেহেশতে দেখেছি এবং সে কারণে মৃত্যু আমার উপর আসান করে দেওয়া হয়েছে। আমি যেনো আয়েশার দু'টি হাত বেহেশতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এ থেকে বুঝা যায় হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি রসুলেপাক স. এর পরিপূর্ণ মহব্বত ছিলো। বেহেশতের মধ্যে হজরত আয়েশার দৃষ্টান্তরূপ তাঁকে দেখানো হয়েছে, যাতে করে মৃত্যু তাঁর কাছে আসান হয়ে যায়। আনন্দময় জীবন প্রেমিক-প্রেমিকার দু'জনের মিলনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ফুল বাগিচার স্বাদ প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের দ্বারাই পাওয়া যায়। একবার এক ব্যক্তি রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? জবাবে তিনি স. বললেন, আয়েশা। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, পুরুষের মধ্যে কে? উত্তরে বললেন, তার পিতা।

রসুলেপাক স. এর অন্তিম অসুস্থতাকালে প্রথম দিকে একদিন হজরত আয়েশা বললেন, হায় আমার মাথা গেলো। রসুলেপাক স. বললেন, না, বরং আমার মাথা গেলো। তিনি হজরত আয়েশাকে আরও বললেন, আমার পূর্বে যদি তুমি দুনিয়া থেকে চলে যাও, আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে আমি তোমার জানাযা পড়াবো, তোমাকে দাফন করবো। একথা হজরত আয়েশার কাছে কঠিন মনে হলো। তিনি বললেন, আমি মরে যাই এটাই তো আপনি চান। কিন্তু এখানে রসুলেপাক স. এর উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— যেহেতু রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থানের বিষয়টি তখন নিশ্চিত, তাই তিনি চেয়েছিলেন হজরত আয়েশা রসুলেপাক স. এর পূর্বেই বেহেশতে পৌঁছে যান এবং সেখানে উভয়েই একস্থানে একত্রিত হয়ে যাবেন। অবশ্য 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকারের কথার তাৎপর্য গভীর সূক্ষ্মতাপূর্ণ এবং অনুভূতির উপর দণ্ডায়মান।

ফজরের নামাজের দৃশ্য অবলোকন

অন্তিম অসুস্থতার সময়ের আরেকটি অন্যতম ঘটনা হচ্ছে ফজরের নামাজের দৃশ্য অবলোকন করা। ঘটনাটি হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুলেপাক স. হুজরা শরীফের দরজার পর্দা সরিয়ে মসজিদে ফজরের নামাজরত লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তিনি স. দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালেন। সেদিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। হজরত আনাস তাঁর এমতো দৃষ্টিপাতকে মাসহাফের পাতার নুরানিয়াতের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে মৃদু হাসলেন। দরজায় যখন দাঁড়ালেন, তখন সাহাবীগণ ধারণা করলেন, তিনি স. এখন সম্ভবতঃ বাইরে বেরিয়ে আসবেন। তাঁরা খুশি হলেন খুব। আশা করলেন, তিনিও যেনো নামাজে

অংশগ্রহণ করেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক পিছনে সরে আসতে চাইলেন, কিন্তু রসুলেপাক স. সাহাবীগণের দিকে ইশারা করে বুঝালেন, আবু বকর যেনো স্বস্থানে অবস্থান করেন এবং নামাজ সম্পূর্ণ করেন। তারপর দরজার পর্দা ছেড়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। মহাপ্রস্থানের ঘটনাটি ঘটলো ওই দিনেই।

মালাকুল মউতের অনুমতি প্রার্থনা

এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে— রসুলেপাক স. এর অন্তিম যাত্রার তিন দিন পূর্বে হজরত জিব্‌রাইল রসুলেপাক স. এর দরবারে আল্লাহ্‌পাকের পয়গাম নিয়ে এলেন। বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি কেমন বোধ করছেন?' এটি ছিলো শনিবারের ঘটনা। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যে রোগে আক্রান্ত হয়ে পরকাল গমন করলেন সেই রোগে আক্রান্ত কালে হজরত জিব্‌রাইল এসে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার কাছে সালাম পেশ করেছেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি এখন নিজকে কী অবস্থায় পাচ্ছেন এবং কেমন আছেন? রসুলেপাক স. বললেন, হে জিব্‌রাইল আমীন! আমি ব্যথা অনুভব করছি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, হে জিব্‌রাইল ! আমি চিন্তাগ্রস্ত। দ্বিতীয় দিন, জিব্‌রাইল আ. আবার এলেন এবং তাঁকে তাঁর হাল অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও জবাব দিলেন পূর্বের মতো। জিব্‌রাইল তৃতীয় দিনও এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো মালাকুল মউত (আজরাইল ফেরেশতা)। আরেকজন ফেরেশতাও ছিলো। তাঁর নাম ইসমাইল। তিনি সত্তুর হাজার অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী এক লাখ ফেরেশতার প্রধান। তাদের প্রত্যেকের অধীনে সত্তুর হাজার বা এক লাখ ফেরেশতা ছিলো। তারা সকলেই জিব্‌রাইলের সঙ্গে ছিলো। জিব্‌রাইল বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কেমন আছেন। রসুলেপাক স. বললেন, ব্যথা অনুভব করছি। জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতঃ জিব্‌রাইল! আপনার সাথে ইনি কে? জিব্‌রাইল বললেন, ইনি মালাকুল মউত। তিনি আরও বললেন, আপনার কাছে এই আমার শেষ আগমন। আপনার পর আমি আর কোনো বনী আদমের কাছে আসবো না। যমীনেও অবতরণ করবো না। এরপর রসুলেপাক স. সাকরাতুল মউতের প্রকোপ অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর কাছে পানির পেয়ালা ভরে রাখা হয়েছিলো। বার বার তিনি তাঁর হাতখানা পেয়ালায় ভিজিয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে মুছে নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন 'আল্লাহুম্মা আই'ন্নী আ'লা সাকরাতিল মাওতু' (হে আল্লাহ! মৃত্যুর কষ্টে তুমি আমাকে সাহায্য করো)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন বলছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্না লিল মাওতি সাকারাতুন' (আল্লাহ্ ছাড়া

কোনো ইলাহ্ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর কষ্ট আছে)। জীবনালেখ্যবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর উপর সাকরাতুল মউত এতো কঠিন ছিলো যে, তাতে তাঁর পবিত্র শরীর কখনও লাল, কখনও হলুদ হয়ে যাচ্ছিলো। কখনও ডান হাত দ্বারা আবার কখনও বাম হাত দ্বারা কপাল থেকে ঘাম মুছছিলেন তিনি। বার বার পড়ছিলেন— 'আল্লাহুম্মা রব্বিগ ফিরলী ওয়া আল হিক্বনী বির্‌রফীক্বিল আ'লা' (হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত করে দাও)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র রসনা থেকে সর্বশেষে এই দোয়াটিই পাঠ করতে শোনা গিয়েছিলো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সুহায়লী বলেছেন, আমি আল্লামা ওয়াকেদীর কোনো কোনো কিতাবে পেয়েছি, রসুলেপাক স. এর জীবনের সর্বপ্রথম কলেমা ছিলো 'আল্লাহু আকবার'। হজরত হালীমা সাদীয়ার কাছে দুগ্ধ পান কালে তিনি এই কালেমা উচ্চারণ করেছিলেন। আর তাঁর জীবনের সর্বশেষ কলেমা ছিলো 'আর্‌রফীক্বিল আ'লা'।

হজরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. তাঁর অসুস্থতার সময় বেশীর ভাগ ওসিয়ত করেছিলেন নামাজ এবং গোলামের সাথে সদাচরণ করার বিষয়ে। এমন কি ওই সময়ও, যখন তাঁর পবিত্র বক্ষদেশ ওঠা নামা করছিলো এবং পবিত্র জবান হয়ে গিয়েছিলো স্থবির। হজরত আনাস বলেছেন, রসুলেপাক স. সাকরাতুল মাওতের কালে ওসিয়ত করেছিলেন। বলেছিলেন— 'আস্‌সলাতু ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম'। (নামাজ এবং তোমাদের গোলাম)। তখন তাঁর বক্ষদেশ থেকে গর গর আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো এবং তাঁর পবিত্র রসনা তাঁকে সাহায্য করছিলো না। বর্ণিত আছে, মালাকুল মউত উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। ঘরে প্রবেশ করে রসুলেপাক স. এর সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হে আহ্‌মদ! আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে হুকুম দিয়েছেন আপনার আনুগত্য করার জন্য। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আপনার রুহ কবয করবো। আর আপনি যদি অনুমতি না দেন তাহলে করবো না। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে পূর্ণ এখতিয়ার দান করেছেন। অতঃপর জিব্‌রাইল এসে বললেন, হে মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার প্রতি আগ্রহান্বিত। তিনি আপনাকে ডাকছেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে মালাকুল মউত! আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তা-ই কার্যকর করুন। জিব্‌রাইল বললেন, পৃথিবীতে আমার এটাই শেষ আগমন। এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ছিলেন আপনি। আপনার জন্যই আমি এখানে আসতাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুলেপাক স. এর পবিত্র মস্তক উত্তর দিকে করালেন। তাঁর দৃষ্টি স্থবির হয়ে গেলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর ওফাতের দিন আল্লাহ্তায়ালা মালাকুল মউতকে হুকুম দিলেন, পৃথিবীতে যাও। আমার হাবীব মোহাম্মদ মুস্তফার কাছে হাজির হও। সাবধান! অনুমতি ছাড়া তার গৃহে প্রবেশ কোরো না। অনুমতি ছাড়া তাঁর রুহও কবয কোরো না। মালাকুল মউত ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে এক বেদুঈন লোকের আকৃতি ধরে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো— 'আস্সালামু আ'লাইকুম আহলা বাইতিন নাবুও্ওয়াতি ওয়া মা'দানার রিসালাতি ওয়া মুক্তালিফিল্ মালাইকাতি' (হে নবীগৃহের সদস্যবর্গ, রেসালতের খনি এবং বিভিন্ন ফেরেশতাবৃন্দ! আপনাদের উপর সালাম)। প্রবেশ করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তখন হজরত ফাতেমা রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, নবীয়ে করীম এখন তাঁর হালে মশগুল। এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করা হলো। জবাবও দেওয়া হলো আগের মতো। তৃতীয় বার আবার অনুমতি চাওয়া হলো। মালাকুল মউত অনুমতি চাইলেন অধিকতর উচ্চকণ্ঠে। ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা সকলেই ওই আওয়াজে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। রসুলেপাক স. এর হুঁশ ফিরে এলো। তিনি স. চোখ মেলে বললেন, কী হয়েছে? তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলা হলো। তিনি স. বললেন, হে ফাতেমা! তুমি কি জানো ইনি কে? ইনি হচ্ছেন সকল লজ্জত ভঙ্গকারী, কামনা বাসনা খতমকারী, সামাজিক বন্ধন ছিন্নকারী, ইনি স্ত্রীগণকে বিধবা বানিয়ে দেন এবং ছেলে-মেয়েদেরকে করে দেন এতীম। সাইয়্যেদা ফাতেমা একথা শুনে কাঁদতে শুরু করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে আমার কন্যা! ক্রন্দন কোরো না। কেননা তোমার ক্রন্দনে আরশ বহনকারী ফেরেশতারাও ক্রন্দন করে। তিনি স. তাঁর হাত দ্বারা সাইয়্যেদা ফাতেমার চোখের জল মুছে দিয়ে তাঁকে সুসংবাদ শোনালেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। বললেন, তুমি সকলের পূর্বে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন, তুমি হবে বেহেশতী রমণীদের নেত্রী। তাঁর জন্য দোয়া করলেন এভাবে— হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমার বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করার তওফীক দাও। সাইয়্যেদা ফাতেমা 'হায় মুসিবত' বলে চিৎকার করে উঠলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার পিতার জীবনের উপর আজকের দিনের পর আর কোনো মুসিবত নেই। একথার তাৎপর্য হচ্ছে— বিপদ-মুসিবত রোগযন্ত্রণা ও ব্যথার প্রকটতার কারণে হয়, যা দৈহিক সম্পর্ক ও মানবীয় উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত। তারপর রসুলেপাক স. হজরত ফাতেমাকে বললেন, তোমাদের সন্তানদ্বয়কে নিয়ে এসো। তিনি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে রসুলেপাক স. এর সামনে আনলেন। তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে সজোরে ক্রন্দন

করতে লাগলেন। তাঁদের কান্নায় ঘরে উপস্থিত সকলেরই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে চুম্বন করলেন। তাঁদেরকে সম্মান ও মহব্বত করার জন্য সাহাবা কেরাম ও সকল উম্মতকে ওসিয়ত করলেন। এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা উভয়েই রসুলেপাক স. এর কোলের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের কান্নার আওয়াজ শুনে রসুলেপাক স.ও কেঁদে ফেললেন। উম্মতজননী উম্মে সালামা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো অতীত ভবিষ্যত সর্বাবস্থায়ই ক্ষমায়িত। তবু কেনো কাঁদছেন? রসুলেপাক স. বললেন, উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালোবাসার কারণে। আমার পর তাদের অবস্থা যে কী হবে? উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এগিয়ে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! চোখ খুলুন এবং আমার প্রতি নেক দৃষ্টি প্রদান করুন। আমাকে ওসিয়ত করুন। রসুলেপাক স. চোখ খুলে বললেন, আয়েশা! কাছে এসো। আমি কাল তোমাকে যে ওসিয়ত করেছি। তোমার জন্য তাই আমার ওসিয়ত। তার উপর আমল কোরো। উম্মতজননী হজরত সাফিয়াও এগিয়ে এলেন এবং হজরত আয়েশার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। রসুলুল্লাহ্ স. ওইভাবে তাঁর সকল সহধর্মিণীগণকে ওসিয়ত করলেন। তারপর বললেন, আমার ভাই আলীকে ডাকো। হজরত আলী এসে শিয়রের পাশে বসে গেলেন। রসুলেপাক স. পবিত্র মস্তক উঠিয়ে নিলেন তাঁর কোলের উপর। বললেন, হে আলী! ওমুক ইহুদীর কয়েক দেরহাম আমার জিম্মায় ছিলো। উসামা সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য তার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছিলো। তুমি তার পাওনা আমার পক্ষ থেকে আদায় করে দাও। তিনি স. আরও বললেন, হে আলী! হাউসে কাউছারের কাছে যারা আমার সাথে মিলিত হবে, তুমি হবে তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। আমার পর তোমাকে অনেক অপছন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। সে সময় মনে কোনোরূপ সংকীর্ণতাকে স্থান দিয়ো না এবং ধৈর্য ধারণ কোরো। তুমি যখন দেখবে মানুষ দুনিয়া পছন্দ করছে, তখন তুমি আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়ো। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন তাঁকে বললেন, কাগজ ও দোয়াত নিয়ে এসো। তোমার জন্য একটি ওসিয়তনামা লিখে দেই। হজরত আলী বলেন, তখন আমি আশংকা করলাম লেখার সরঞ্জাম আনতে গেলে যদি আল্লাহ্‌র রসুল দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তখন তো ওসিয়তের দৌলত থেকেও মাহরুম হয়ে যাবো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার যা মর্জি হয় আমাকে ওসিয়ত করুন। আমি তা স্মরণে রাখবো। রসুলেপাক স. বললেন— 'আস্‌সলাতু ওয়ামা মালাকাত আয়মানুকুম' (নামাজ এবং তোমাদের দাসদাসী)। এক বর্ণনায় আছে রসুলেপাক স. বললেন— 'আল্লাহা আল্লাহা ফীমা মালাকাত আয়মানুকুম আলবাসূ যুহূরাহুম ওয়াশ্‌বিউ' বতূনাহুম ওয়ালায়নূহুম বিল ক্বওলি' (দাসদাসীদের ব্যাপারে

তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, তাদেরকে বস্ত্র দিয়ো, পেট ভরে খেতে দিয়ো এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ কোরো)। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. আমার সাথে কথা বলছেন আর তাঁর পবিত্র মুখের লালা আমার কাছে এসে পড়ছে। তার পরই তাঁর হাল পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাঁর পাশে উপবিষ্ট রমণীগণ অবস্থা দেখে অপারগ হয়ে গেলেন। আমিও অবস্থা যা দেখলাম, তা বরদাশত করতে পারলাম না। বললাম, হে আব্বাস! আমাকে সাহায্য করুন। তিনি এলেন। আমরা দু'জনে মিলে রসুলেপাক স.কে শুইয়ে দিলাম। এখানে যা বলা হলো, তা উল্লেখ করা হয়েছে 'রওযাতুল আহবাব' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের লেখক (শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা গৌরব করে বলতেন, আমার কোলে রসুলেপাক স. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বিখ্যাত বর্ণনা এটাই। মোহাদ্দেছগণও এই বর্ণনাটিকে সহীহ্ বলেছেন। আবার এখানে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. তাঁর অন্তিমকালে হজরত আলীর কোলে মাথা রেখেছিলেন। হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকিম ও ইবনে সাআদ। এই বর্ণনার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, হজরত আলী এসে রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে বসেন এবং তিনি স. তাঁর পবিত্র মস্তক তাঁর কোলের উপর রাখেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এটাই রসুলেপাক স. এর জীবনের সর্বশেষ অবস্থা। বাহ্যতঃ বর্ণনাদু'টির মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, কোলের উপর পবিত্র মস্তক রাখা হয়েছিলো। আবার কেউ বলেছেন, বাহুর উপর বুকের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছিলো। এর সমাধান অবশ্য কোনো জটিল বিষয় নয়। এ পার্থক্যটি বর্ণনাকারীর বর্ণনার পার্থক্য। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা পরকাল যাত্রার নিকটবর্তী সময় হওয়ার কারণে তাকে শেষ সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, মালাকুল মউত যখন বেদুঈন ব্যক্তির সুরত ধরে এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন রসুলেপাক স. বললেন, তাকে প্রবেশের অনুমতি দাও। তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আসসালামু আলাইকুম আইয়্যুহান্নাবী। আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর সালাম পাঠিয়েছেন। আর আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আপনার রুহ কবয করার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে মালাকুল মউত! ওই সময় পর্যন্ত আমার রুহ কবয কোরো না, যতক্ষণ আমার ভাই জিব্রাইল না আসেন। তারপর জিব্রাইল কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, হে আমার বন্ধু! এহেন অবস্থায় আপনি আমাকে ছেড়ে আছেন? জিব্রাইল বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে আপনার জন্য একটি খবর নিয়ে এসেছি। খবরটি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা দোযখের দারোগাকে এই

মর্মে হুকুম দিয়েছেন যে, আমার বন্ধুর পবিত্র আত্মা আসমানে আগমন করছে। তাই তুমি এই মুহূর্তে দোযখের আগুনকে ঠাণ্ডা করে দাও। ডাগর নয়না হুরগণকে ওহী করেছেন, তোমরা নিজেরা সাজগোজ করে থাকো। ফেরেশতাগণকে হুকুম দিয়েছেন, তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে রুহে মোহাম্মদীকে স্বাগতম জানাও। আমাকে হুকুম দিয়েছেন, তুমি পৃথিবীতে যাও এবং আমার হাবীবকে একথা জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, সকল নবী ও তাদের উম্মতের জন্য ওই সময় পর্যন্ত বেহেশত হারাম, যতক্ষণ না আপনি এবং আপনার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে এবং আপনার উম্মতগণকে এতো বেশী দান করবেন যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে মালাকুল মউত! আসুন এবং আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা তামিল করুন। অতঃপর মালাকুল মউত আজরাইল রসুলেপাক স. এর রুহ কবয করে ইল্লীয়্যিনের সর্বোপরি মাকামে নিয়ে গেলেন। আসমান থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হলো 'ইয়া মোহাম্মদ! ইয়া রসুলা রব্বিল আলামীন!' হজরত আলী ইবনে আবু তালিব বলেছেন, আমি সে সময় আসমানের দিকে ফেরেশতাদের 'ওয়া মোহাম্মাদাহ্' ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. এর পবিত্র রুহ যখন পৃথক হলো, তখন আমি এমন সুঘ্রাণ পেলাম, যা আমি জীবনে কখনও পাইনি। তারপর আমি তাঁর পবিত্র দেহ চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, ফেরেশতারা সেই চাদর উড়িয়েছিলো।

উম্মতজননী হজরত উম্মে সালামা বলেছেন, সে দিন রসুলেপাক স. এর ওফাতের সময় আমার হাত ছিলো তাঁর পবিত্র বক্ষদেশের উপর। তারপর কয়েক জুমা অতিবাহিত হয়ে গেলো। আমি খানা খেয়েছি, ওজু করেছি। কিন্তু আমার হাত থেকে সেদিনের খুশবু দূর হয়নি। এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। রসুলেপাক স. যখন দুনিয়া থেকে প্রস্থান করলেন, তখন হজরত ফাতেমা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, হে আমার পিতা! আপনি তো আল্লাহ্‌তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। হে পিতা! আপনি তো জান্নাতুল ফেরদাউসে অবস্থান গ্রহণ করলেন। হে পিতা! আপনার প্রস্থানের খবর জিব্‌রাইলকে কে পৌঁছে দিবে? হে পিতা! আপনার পর জিব্‌রাইল আর কার কাছে ওহী পৌঁছাবেন। হে আল্লাহ্! ফাতেমার আত্মাকে রসুলেপাক স. এর আত্মার সঙ্গে মিলিত করে দাও। হে আল্লাহ্! আমাকে আমার রসুলের দীদার নসীব করো। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার হাবীবের সওয়াব থেকে আমাকে দূরে রেখো না। আর কিয়ামতের দিনে তাঁর শাফাআত থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর তিরোধানের পর হজরত ফাতেমাকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকাও আহাজারী করেছিলেন। বলছিলেন, হায়, আফসোস! হায় আক্ষেপ! ওই সম্মানিত নবীর জন্য যিনি দারিদ্রকে ধনাঢ্যতার উপর, দরবেশী জীবনকে বিত্ত-সম্পদের উপর প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। আক্ষেপ ওই দীন-হীনদের প্রতিপালনকারীর উপর, যিনি উম্মতের চিন্তায় একটি রাতও আরামের শয্যা গ্রহণ করতে পারেননি। যিনি সর্বদাই সুদৃঢ় পদক্ষেপের সাথে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাকামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কাফেরদের দুঃখ-কষ্ট প্রদানের কারণে তাঁর আলোকিত অন্তঃকরণে কখনও ক্ষুণ্নতার মলিনতা স্পর্শ করতে পারেনি। অভাব ও দারিদ্রের কারণে এহসান ও অনুগ্রহের দরজা কখনও বন্ধ করেননি। দুশমনদের প্রস্তরাঘাতে তাঁর পবিত্র দন্ত ও গণ্ডদেশ জখম হয়েছে। সময়ের মুসিবতের কারণে পবিত্র ললাটে পট্টি বেঁধেছেন। জীবনযাপনের অবস্থা এই ছিলো যে, কয়েকদিন পর্যন্ত যবের রুটি দিয়েও আহার করা সম্ভব হয়নি।

সে সময় গৃহের কোনো এক কোণ থেকে আওয়াজ শোনা গেলো— 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম আহলাল বাইতি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কুল্লু নাফসিন জাইক্বাতুল মাওতি ওয়া ইন্নামা তুওফ্‌ফাওনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি' (হে নবীজীর পরিবারবর্গ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে) (৩ঃ১৮৫)। কিন্তু সেই আওয়াজকারীকে কেউ দেখতে পায়নি। আওয়াজকারী আরও বললো, জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসিবতের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মর্যাদা ও আনন্দ রয়েছে। প্রত্যেক বিদায়ী ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত থাকে। সুতরাং আল্লা্‌তায়ালার উপর ভরসা রাখো। তিনি তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিবেন। আহাজারী কোরো না। আর বাস্তব কথা হচ্ছে, সেই ব্যক্তিই বিপদগ্রস্ত, যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। প্রকৃতপক্ষে উক্ত শোকবাণী ছিলো ফেরেশতাদের।

খিযিরের আগমন

রসুলেপাক স. এর মহাপ্রয়ানের পর ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশাল দেহের অধিকারী একজন সুদর্শন পুরুষের আগমন ঘটলো। তিনি পুরুষদের কাছে গিয়ে ক্রন্দন করলেন। তারপর সাহাবা কেরামের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুসিবতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মর্যাদা আছে। প্রত্যেক বিদায়ী ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত থাকে। মৃত্যুবরণকারী আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যায়। তোমরাও আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। প্রত্যেক বালা-মুসিবতে আল্লাহর দিকেই ধাবিত হও।

ওই ব্যক্তিই বিপদগ্রস্ত, যে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। একথাগুলো বলে লোকটি চলে গেলো। হজরত আবু বকর ও হজরত আলী রা. বলেছেন, লোকটি ছিলেন হজরত খিযির, যিনি শোক প্রকাশের জন্য এসেছিলেন।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর মহাপ্রয়ানের পর সাহাবা কেরাম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁদের জ্ঞান বিলুপ্ত হলো। অনুভূতি লোপ পেলো। কেউ কেউ হয়ে গেলেন নির্বাক। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত ওছমান। তাঁর কাছ দিয়ে হজরত ওমর অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তাঁর সালাম শুনতেও পেলেন। কিন্তু উত্তর দিতে পারলেন না। কোনো কোনো সাহাবী আপন আপন জায়গায় স্থবির হয়ে বসে রইলেন। নড়াচড়া করার শক্তিও তাঁদের রইলো না। হজরত আলীর অবস্থা হলো এরকম। সাহাবা কেরামের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বীর ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তাঁরও চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন। এহেন অবস্থায় তিনি স্থিরচিত্ত ছিলেন বলে তাঁকে বীর পুরুষ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। কোনো কোনো সাহাবী অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে ধুঁকে ধুঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। কেউ কেউ এরকম দোয়া করলেন— আমাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দাও, কাউকে দেখার মতো শক্তি আমাদের আর নেই। তাঁরা কেউ কেউ আহাজারী করেছেন এবং এরকমও বলেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ স. এর মৃত্যু হয়নি। নবী মুসার মতো তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, রসুলেপাক স. দীদারের ওয়াদায় গিয়েছেন, যেমন গিয়েছিলেন নবী মুসা। আমি আশা করি রসুলেপাক স. অবশ্যই পৃথিবীতে ওই সময় পর্যন্ত থাকবেন, যতক্ষণ না মুনাফিকদের জবান ও হাত কর্তন করা হবে। কোনো কোনো মুনাফিক বললো, মোহাম্মদ নবী হলে তার মৃত্যু হতো না। হজরত ওমর যখন একথা শুনলেন, তখন তিনি খোলা তরবারী নিয়ে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্র নবীর মৃত্যু হয়েছে, আমি এই তরবারী দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো। হজরত ওমরের মুখে এরকম কথা শুনে অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলো। হজরত আসমা বিনতে উমায়েস রসুলেপাক স. এর দু'কাঁধের মধ্যখানে ঘাড়ের দিকে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন, মহরে নবুওয়াত নেই। তিনি উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন মহরে নবুওয়াত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং রসুলেপাক স. এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বর্ণিত আছে, ওই সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীক মদীনার পার্শ্ববর্তী সাখ নামক জায়গায় ছিলেন। তিনি যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন দ্রুতগতিতে অশ্ব চালিয়ে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রকোষ্ঠের দিকে রওয়ানা হলেন। সারা পথে তিনি 'ওয়া মুহাম্মাদাহ, ওয়া মুহাম্মাদাহ' বলে কাঁদলেন। মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখতে পেলেন মানুষ হয়রান, পেরেশান, দিশেহারা। কেউ কারও দিকে

তাকাচ্ছে না। তিনি কারও প্রতি লক্ষ্য না করে সোজা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং রসুলেপাক স. এর চেহারা আনওয়ারের উপর থেকে চাদর মোবারক উঠিয়ে নূরানী কপালে চুম্বন করলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর তাঁর নিজের মুখখানা রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখের উপর রাখলেন এবং চুম্বন করলেন। তারপর শবদেহের ঘ্রাণ নিলেন। তারপর 'ওয়া নাবিয়্যাহ' বলে চিৎকার করলেন এবং মাথা উঠালেন। তারপর ক্রন্দন করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার চুম্বন করলেন এবং বলে উঠলেন 'ওয়া সাফিয়্যাহ', তারপর মাথা উঠিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তৃতীয়বার আবার চুম্বন করলেন এবং বললেন 'ওয়া খলিলাহ'। তারপর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার নামে কোরবান হোক। আপনি সর্বাবস্থায় পবিত্র— জীবদ্দশায় এবং অন্তিমযাত্রার সময়েও। আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না, একবার ছাড়া। আর সেটাতো আপনি পেয়েই গিয়েছেন। আপনার যতো গুণাবলীই বর্ণনা করা হোক না কেনো, আপনি তার চেয়ে মহান, তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। এখতিয়ারের লাগাম যদি আমাদের হাতে থাকতো, তাহলে আমরা আমাদের জীবনসমূহ আপনার জন্য কোরবান করে দিতাম। মৃতের উপর বিলাপ করতে আপনি যদি মানা না করতেন, তাহলে আমরা আপনার উপর এতো ক্রন্দন করতাম, যাতে আমাদের চোখ থেকে ঝর্ণা জারী হয়ে যেতো। আল্লাহ্ আল্লাহ্! আমাদের তরফ থেকে সালাম পৌঁছে দাও। হে মোহাম্মদ! আপনার প্রভুপালকের সন্নিধানে আমাদেরকে স্মরণে রাখবেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছিলেন, 'আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর দুই মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না'। একথার তাৎপর্য নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেছেন। প্রশ্ন করেছেন— একথার অর্থ কী? কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা ওই কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, রসুলেপাক স. অচিরেই ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের হাত কর্তন করবেন। দ্বিতীয়বার আসা যদি সঠিক হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার মৃত্যু অবশ্যই হবে। কাজেই এ বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে যে, এ থেকে তিনি পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। দ্বিতীয় বার মৃত্যুবরণ করার ঘটনা অবশ্য এ পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। তিনি তাদের মতো নন। দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়েছে এদের সংখ্যা ছিলো হাজার হাজার। মৃত্যুর ভয়ে তারা আপন আপন ঘর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে মৃত্যু দিয়েছিলেন। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। অথবা ওই ব্যক্তির ঘটনা, যিনি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয়টি আল্লাহ্তায়ালা কীভাবে পুনর্জীবিত করবেন? তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে মৃত্যুদান করলেন এবং পুনরায় জীবিত করে দিলেন। এটি ছিলো হজরত উযায়ের আ. এর

ঘটনা। কেউ কেউ বলেছেন, একথার অর্থ হচ্ছে— রসুলেপাক স. তাঁর কবরে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করবেন না। যেমন অন্যান্যদেরকে কবরে মুনকির নকীরের প্রশ্নোত্তরের জন্য জীবিত করা হয়। তারপর আবার মৃত্যু দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় মৃত্যুর অর্থ— রসুলেপাক স. এর শরীয়ত চিরকাল বেঁচে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তা ধ্বংস হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় বার মৃত্যু কথাটির অর্থ হচ্ছে— মৃত্যুযন্ত্রণা। অর্থাৎ আজকের মৃত্যুযন্ত্রণা বরদাশত করার পর এর চেয়ে বেশী আর কোনো যন্ত্রণা নেই। যেমন রসুলেপাক স. হজরত ফাতেমা রা. এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। বলেছিলেন— 'লা কারাবা আ'লা আবীকা বা'দিল ইয়াওমা' (আজকের পর তোমার পিতার উপর আর কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই)। বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুলবারীতে এরকম সমাধান দেওয়া হয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা বলেছেন, প্রথম সমাধানটিই অধিকতর সুস্পষ্ট এবং নিরাপদ। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম সমাধানটি বর্ণনার বাহ্যিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। আর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে এই— রসুলেপাক স. এর উপর আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় প্রয়োগ হওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো মৃত্যু নেই এবং তারপর জীবিত হওয়াও নেই। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালকের কাছে পবিত্র এ ব্যাপারে যে, আমাকে আমার কবরে চল্লিশ দিন রেখে দেওয়া হবে। তারপর শুরু হবে আমার (বরযখী) জীবন। অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর আমাকে আবার জীবিত করা হবে, তারপর বরযখী জীবন শুরু হবে এমনটি নয়। রসুলেপাক স. এর এ বাণী তাঁর স্থায়ী জীবন লাভের দিকে ইশারা করছে। এ মাসআলাটি 'তারিখে মদীনা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষাংশেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলেপাক স. এর পবিত্র প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, হজরত ওমর লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন, রসুলুল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করেননি এবং করবেনও না, মুনাফিকদেরকে শেষ না করা পর্যন্ত। মুনাফিকেরা তাঁর ওফাত হয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে ফেতনা সৃষ্টি করে চলেছে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ওমরকে বললেন, এক মুহূর্তের জন্য স্থির হও। কিন্তু তিনি স্থির হলেন না। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, হে লোকসকল! তোমরা জেনে রেখো, রসুলেপাক স. ওফাতবরণ করেছেন। তোমরা কি শোনো নি? আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে কোরআনে করীমে সম্বোধন করে কী বলেছেন? বলেছেন— 'ইন্নাকা মায়্যিতুন ওয়া ইন্নাহুম মায়্যিতূন (তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল)(৩৯:৩০)। আল্লাহ্তায়ালা আরও

বলেছেন— 'ওয়ামা জ্বাআ'লনা লিবাশারিন মিন ক্বাবলিকাল খুলদা আফাইম্ মিত্তা ফাহুমুল খলিদূন' (আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে?) (২১ঃ৩৪) একথা বলার পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলে স. এর মিম্বরের কাছে গেলেন। সকল লোক হজরত ওমরকে ছেড়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দিকে ধাবিত হলো। আবু বকর সিদ্দীক খোতবা দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠের পর রসুল স. এর উপর দরুদ পাঠ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর পূজা করছিলো, তার জানা উচিত যে, তিনি ওফাতবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ্তায়ালার পূজা করে, সে জেনে নিক আল্লাহ্ তো এখনও জীবিত— তাঁর উপর কখনও মৃত্যু আসবে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন— 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বদ খলাত মিন কাবলিকার রুসুলু আফাইম্মাতা আও কুতিলান ক্বলাবতুম আ'লা আ'ক্বাবিকুম (মোহাম্মদ একজন রসূল মাত্র; তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে)(৩ঃ১৪৪)? তিনি আরও পাঠ করলেন— 'ইন্নকা মায়্যিতুন ওয়া ইন্নাহুম মায়্যিতূন' (তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল (৩৯ঃ৩০)। আয়াত দু'টি সাহাবা কেরামের স্মরণে এসে গেলো। তাঁরা তখন মনে করতে লাগলেন, আয়াত দু'টি যেনো এই মাত্র অবতীর্ণ হলো। সেদিন সাহাবা কেরাম আয়াত দু'টি মদীনার অলিগলি সব জায়গায় পাঠ করে চললেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পর ভাষণ দিলেন হজরত ওমর ফারুক। বললেন, লোকসকল! আমি প্রথমে যা বলেছিলাম, তা ঠিক নয়। আল্লাহ্র শপথ! আমি যা বলেছিলাম, তা কিতাবুল্লাহ্য়ও দেখিনি এবং রসুলের হাদিসেও পাইনি। কিন্তু আমাদের আকাঙ্খা ছিলো এরকম— রসুলুল্লাহ্ আমাদের মধ্যে জীবিত থাকবেন, আমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর তদারকী করবেন, তারপর আমাদের পরে দুনিয়া থেকে তশরীফ নিয়ে যাবেন। কিন্তু তা তো হলো না। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলের জন্য তা-ই মঞ্জুর করলেন, যা তাঁর অভিপ্রায়। যা তোমাদের আমাদের সকলের ইচ্ছা-আকাঙ্খার বিপরীত। আল্লাহ্তায়ালার কিতাব যার দ্বারা তিনি তাঁর রসুলকে হেদায়েত করেছেন, সেই কিতাবকে তোমরা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো। সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, যেভাবে রসুলুল্লাহ্কে হেদায়েত দান করা হয়েছে।

আবু নসর বলেছেন, হজরত ওমর ফারুকের প্রথমে ওই রকম কথা বলার এবং তার ওই রকম হাল হওয়ার কারণ ছিলো— মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার। পরে যখন তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের একীনের দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ

করলেন, তখন শান্তি লাভ করলেন। হজরত ওমর ফারুক নিজে বলেছেন, আমি যেনো একথা শুনতেই পাইনি। আবু বকরের কথা শুনে আমার ভিতরে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমাদের চেহারার উপর যেনো পর্দা পড়েছিলো। আবু বকর সিদ্দীকের ভাষণ শুনে সে পর্দা উঠে গেলো। রসুলেপাক স. এর ওফাতে মদীনায় বসবাসকারী সাহাবীগণের অন্তর বিষণ্ন হয়ে গেলো। তাঁরা পড়তে লাগলেন— 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'।

তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক আহলে বাইতগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, তোমরা আহলে বাইত। রসুলুল্লাহ্‌র গোছল ও কাফন দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা এর আয়োজন করো। একথা বলে তিনি নেতৃস্থানীয় আনসারদের সঙ্গে খেলাফতের বিষয় নিয়ে ছকীফায়ে বনী সায়েদায় পরামর্শে বসে গেলেন। খেলাফতের বিষয়টি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয় ছিলো। ঝগড়া-মতভেদ দূর করে ইসলামী রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বিধান করার জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছিলো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। উভয় পক্ষই বলতে লাগলেন, কে হবেন আমাদের আমীর? আমাদের মধ্য থেকে না, তোমাদের মধ্য থেকে? তারপর 'আলআইম্মাতু মিন কুরাইশ' এই হাদিসের মাধ্যমে 'ইমামত কুরাইশদের জন্য'— বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গেলো। যেহেতু সাহাবা কেরামের ধারণায় হজরত আবু বকর সিদ্দীকেরই প্রাধান্য ছিলো। বিশেষ করে রসুলেপাক স. এর অসুস্থতার কালে তিনি স. তাঁকে নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ওই ঘটনা থেকে তাঁদের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, দ্বীনি ও ইসলামী কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর বিষয়ে সকলেই একমত হলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো এজমা (ঐকমত্য)।

জ্ঞাতব্যঃ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ওফাতকালীন অসুস্থতার সময় রসুলেপাক স. এর 'সাকরাতুল মওত' হয়েছিলো। তিনি স. বলেছিলেন— 'আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা সাকারাতিল মাওত' (হে আল্লাহ! সাকরাতুল মওতের উপর সাহায্য করো)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর কষ্ট দেখেছি। তাই সহজে যাদের মৃত্যু হয়, তার বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। যদিও আমি জানতাম, কষ্টের সাথে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম। কেননা আসানীর সাথে মৃত্যুবরণ যদি উত্তম হতো, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর জন্য তাই করতেন। শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকার এহেন উক্তি আমার কাছে জটিল বলে মনে হয়েছে। কেননা রসুলেপাক স. এর কোন্ মৃত্যুকষ্টটি হয়েছিলো? কষ্ট বলতে তো এই দেখা গিয়েছিলো যে, পেয়ালা ভর্তি পানি ছিলো। তিনি স. সেই পেয়ালা থেকে হাত

দ্বারা পানি নিয়ে মুখের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। আর তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হচ্ছিলো। সে সময় মুখমণ্ডল হয়ে গিয়েছিলো ঘর্মাক্ত। এটা কী ধরনের কষ্ট? মৃত্যুকষ্ট তো ওটাকে বলে, যা মৃত্যুকালে মানুষের হয়ে থাকে। ওই কষ্ট অন্য ধরনের। রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিলো, তা ছিলো বিশেষ ধরনের এক পরিবর্তন। আরেফগণ এ বিষয়ে সমুচ্চ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাল প্রকাশ ও তাৎপর্য উদঘাটনে যথেষ্ট উপযোগী। 'যাযাহুমুল্লাহু খইরান' (আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন)। প্রথম মন্তব্য— রসুলেপাক স. ওফাতকালীন সময়ে যে কষ্ট পেয়েছিলেন, তাকে যদি সাকরাতুল মওত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে তা হয়েছিলো এ জন্য যে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব, ক্ষুৎপিপাসা, সহ্যশক্তি এবং অনুভূতি প্রভৃতি অবস্থা ছিলো ভারসাম্যময়। অর্থাৎ তিনি যে মানের ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন ছিলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলোও সেই অনুপাতে হয়েছিলো। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমাদের দু'জন ব্যক্তির গায়ের সমতুল্য জ্বর আমার গায়ে আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি দাঁড়িপাল্লার দু'টি পাল্লাই যদি ভারসাম্যময় সমান ওজনের হয়, অতঃপর যে কোনো একটি পাল্লায় যদি সামান্য ওজনের কোনো জিনিস দেওয়া হয়, তাহলে সে পাল্লাটি একদিকে অবশ্যই ঝুঁকে পড়বে। দ্বিতীয় মন্তব্য— মৃত্যুকষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে শরীরের সঙ্গে রুহের সুদৃঢ় সম্পর্ক। সে কারণে শরীরের সঙ্গে রুহের সীমাহীন মহব্বতের বন্ধন হয়ে থাকে। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব, জীবনীশক্তি এবং জ্যোতির্ময় অবয়বের মধ্যে দৈহিক মৌলিকতা বিদ্যমান ছিলো। পবিত্র দেহ থেকে যখন পবিত্র আত্মা পৃথক হতে লাগলো, তখন দেহের সাথে আত্মার ইশক-মহব্বত ছিন্ন হওয়ার কারণে সেই কষ্ট অনুভূত হয়েছিলো। তৃতীয় মন্তব্য— রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর এহেন অবস্থা জারী হওয়ার মধ্যে উম্মতের জন্য সান্ত্বনার ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি আল্লাহ্তায়ালার হাবীব ও সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং উম্মতের তো মৃত্যুকালে স্বাভাবিক কষ্ট হতেই পারে। মৃত্যুকষ্টকে উম্মতে যেনো সহজ মনে করতে পারে এবং তা বরদাশত করতে পারে। চতুর্থ মন্তব্য— রসুলেপাক স. এর হাকীকতে জামেআ (সমষ্টিভূত তত্ত্ব) হচ্ছে সমস্ত উম্মতের তত্ত্ব। বরং সমস্ত মাখলুকের তত্ত্ব। মৌলিক ও শাখা প্রশাখামূলক যাবতীয় অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য তিনিই, যা সমস্ত হাকীকত, জাওহার, আরয, রুহ ও শরীরসমূহে প্রবাহিত। সুতরাং তাঁর পবিত্র আত্মা পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মূলতঃ প্রত্যেক আত্মা প্রত্যেক দেহ থেকে পৃথক হওয়ারই নামান্তর। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে কষ্ট অনুভূত হয়েছিলো, তা 'অনেক' এর তুলনায় কম এবং তা সাগরের তুলনায় বিন্দুতুল্য। পঞ্চম মন্তব্য—

রসুলেপাক স. সমস্ত উম্মতের যাবতীয় আমলের ভার বহনকারী। সমস্ত উম্মতের লক্ষ্য তাঁর দিকেই এবং সকলের পানাও তার পবিত্র অঞ্চলে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'আযিযুন আ'লাইহি মা আনিত্‌তুম হারীসুন আ'লাইকুম বিল মু'মিনীনা রঊফুর রহীম' (তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়াদ্র ও পরম দয়ালু)(৯ঃ১২৮)। কাজেই উম্মতের আমল ও তাদের পাপের বোঝার ভার সে সবের বিষয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট— এ সকলকিছুর লক্ষ্যস্থল তো তিনিই এবং তিনিই কেবল তা বরদাশত করতে পারেন। তাই জিব্‌রাইল যখন তাঁর উম্মতকে ক্ষমা করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব অন্য রকম রূপ ধারণ করলো। ষষ্ঠ মন্তব্য— মানুষের চিরন্তন স্বভাব এই যে, তাকে যখন কোনো রাজত্ব, খেলাফত বা বাদশাহীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, অতঃপর তাকে আসল মালিকের দরবারে ডাকা হয় এবং অন্য একটি রাজত্ব তাকে অর্পণ করা হয়, তখন আসল মালিকের কাছে হাজির হয়ে সওয়াল জবাবের সম্মুখীন হতে হবে বলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আশংকা তাকে পেয়ে বসে। সমস্ত প্রান্তের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব সাধারণতঃ তাঁকে ন্যস্ত করা হয়েছিলো, যদিও সে সবের হিসাব-কিতাবের বিষয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিলো। তৎসত্ত্বেও সুলতানী হায়বত বিদ্যমান ছিলো— শেষ পরিণাম না জানি কী হয়? শায়েখ আজাল আব্দুল ওয়াহ্‌হাব তাঁর শায়েখ আলী মুত্তাকী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর বিদায়কালে বলেছিলেন, তোমরা যদি আমার মধ্যে সাকরাতুল মওতের প্রকটতা দেখতে পাও, তবে মনে কোনো কষ্ট নিয়ো না এবং অন্য কোনো ধারণাকে মনে স্থান দিয়ো না। কেননা এই কষ্ট হচ্ছে কুতুবিয়াতের দায়িত্বের উপকরণ। ওয়াল্লাহু আ'লাম। সপ্তম মন্তব্য— যা পূর্বোল্লিখিত সকল মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ। রসুলেপাক স. এর ওফাতের সময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর 'সামাদিয়াতের তাজাল্লী' (অমুখাপেক্ষিতার আবির্ভাব) 'আহাদিয়াতের তানাযযুলাত' (এককত্বের স্তরে অবতরণ) দান করলেন, যা আসমা ও সিফাতের (আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর) দর্শনের মাধ্যমে লাভ হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তানায্‌যুলাতের ভারে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া ওই রকমই, যেমন ওহী নাযিলকালে রসুলেপাক স. ক্লান্ত হয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, প্রচণ্ড শীতের সময়ে রসুলেপাক স. এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর পবিত্র ললাট থেকে স্বেদ ঝরে পড়তো। এ মর্মে আল্লাহ্‌তায়ালাও এরশাদ করেছেন— 'ইন্না সানুলক্বী আ'লাইকা ক্বাওলান ছাক্বীলা' (আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী)(৭৩ঃ৫)। সুতরাং মৃত্যু মূলতঃ তা-ই যার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়েযপ্রাপ্তির মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়, তার মধ্যে সাকরাত হওয়া দেহের স্থবিরতার ভিত্তিতে প্রকাশ পেয়ে

থাকে। এই বহিঃপ্রকাশটি মূলতঃ বাহ্যিকতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। রসুলেপাক স. এর বেলায়ও তাই হয়েছিলো। সে সময় তাঁর কাছে বেশুমার খাস ওহী নাযিল হচ্ছিলো। বরং তা ছিলো ওহী পরিসমাপ্তির সময়। তাই এর ভারও ছিলো বেশী। অষ্টম মন্তব্য— এ সময়টি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার সাথে একান্ত সাক্ষাতের সময়। সে সময়ের ভয়ভীতি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার মারেফত, উবুদিয়ত ও নৈকট্য লাভের ভয়-ভীতি। এমতাবস্থায় এহেন ভয়-ভীতি থাকাই স্বাভাবিক। এই বিশেষত্ব অন্য কোনো সময় ও অবস্থাতে ছিলো না। নবম মন্তব্য— এই বেকারারী ও অস্থিরতা রুহানী মিলনের বাসনা থেকে হয়েছিলো, যা আত্মিক সন্ত রণের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে মিলিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। তিনি যেনো চাচ্ছিলেন, তাঁর পবিত্র আত্মা জড়জগত থেকে বের হয়ে তাড়াতাড়ি লাহুত (বিলীন হওয়ার) জগতে প্রবেশ করুক। অবশ্য এটি অনুভূতির জগতের প্রভাব, যা মানবীয় স্বভাবে প্রকম্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তখন হালের গালবা (প্রভাব) প্রকাশ পায়। এই হাদিসখানি সেদিকেই ইশারা করে— 'মান আহাব্বা লিকাআল্লাহি আহাব্বাল্লাহি লিক্বাআহু'(যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় আল্লাহ্তায়ালাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান)। দশম মন্তব্য— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে উবুদিয়াতের (দাসত্বের) গুণাবলী— যা সম্মানিত, মহান ও প্রশংসনীয় গুণাবলী, তা প্রকম্পিত ও প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স.কে বাদশাহী ও উবুদিয়াত (দাসত্ব) দু'টির মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. উবুদিয়াতকেই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমি চাই যে, একদিন আমি অনাহারে থাকবো। আরেকদিন আহার করবো। আর খানাও আমি এভাবে আহার করবো, যেভাবে গোলাম আহার করে। বসবো এভাবে, যেভাবে গোলাম বসে থাকে। উবুদিয়াতের চাহিদা হচ্ছে, শরীয়তের আহকামের আলোকে আরাম আয়েশ না পাওয়া এবং বিপদ আপদ নাযিল হওয়া। নিঃসন্দেহে রসুলেপাক স. এর মধ্যে বাশারিয়াতের (মানবিকতার) বিধান প্রকাশিত হতো এবং তিনি স. সাধারণ মানুষের ন্যায় সন্তান হারানোর ব্যথায় ক্রন্দন করতেন। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর হয় চিন্তাগ্রস্ত। সুতরাং বাশারিয়াতের অংশ অবশিষ্ট রাখার অর্থ বিপদাপদ অনুভব করা। বাশারিয়াতের গুণাবলীর মর্যাদা বাস্তবায়নের জন্যই দুঃখ-কষ্ট প্রদান করার ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার শান-শওকত (প্রতাপ-পরাক্রম) ও তাঁর রবুবিয়াত (প্রভুপালকত্ব) প্রকাশ পায়।

মাদারেজুন নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0019-4